আলোচনা-প্রসঙ্গে

প্রথম খণ্ড

সঙ্কলয়িতা
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম. এ.

প্রকাশক
শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

প্রকাশকাল ঃ
১লা বৈশাখ, ১৩৫২

মুদ্রক
কৌশিক পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

আলোচনা-প্রসঙ্গে

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১৫।৬।১৯৩৯)

ইদানীং প্রচণ্ড গরম প'ড়েছে—দুপুরের দিকে আশ্রম-সংলগ্ন চরের বালু তেতে আশ্রমের সামনের দিকের আবহাওয়াটা অগ্নিময় ক'রে তোলে। বেলা প'ড়ে আসলে অবস্থাটা ধীরে-ধীরে সহনীয় হ'য়ে ওঠে।

আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কিশোরীদার ঘরের পাশে বাবলাতলায় কাঠের ঘরে (Philanthropy Office-এ) আসর বিছিয়েছেন—দেখতে-দেখতে ভিড় জ'মে উঠলো—আলাপ-আলোচনা জমাট বাঁধতে লাগলো—হেমদা (দে) হিটলারের আত্মজীবনীর কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর একটা জায়গা দাগিয়ে রাখতে বললেন—হিটলার সেখানে বলেছেন—Upstart (হঠাৎ বড়লোক) যারা তারা হীন অবস্থার লোকের সঙ্গে মিশতে পারে না, ভয় হয়, তাদের পূর্ব্বেকার দুরবস্থা বুঝি লোকে টের পাবে—তাদের সম্মান ক'মে যাবে। শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শুনে বললেন—"কিন্তু সত্যিকার বড়লোকের এমনটি হয় না।" হেমদা হিটলারের জীবনী থেকে দেখালেন যে হিটলার ঠিক সেই কথাই লিখেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই inferiority complex (হীনম্মন্যতাবোধ) চ'লে গেলে তারা কিন্তু খুব বড় হ'য়ে ওঠে। (কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন)—বাইরে থেকে আমরা গরীব লোকের যে problem (সমস্যা) মনে করি, সেটা কিন্তু আদত problem (সমস্যা) নয়। ওদের সঙ্গে এক হ'য়ে মিশলে তবে বোঝা যায়, তাদের অসুবিধা কী ও কোথায় এবং তার প্রতিকার কী। মানুষের দুর্ভোগের পিছনে থাকে সাধারণতঃ কতকগুলি চরিত্রগত ত্রুটি, তার নিরাকরণ না হ'লে দুর্ভোগ যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে কুলী সেজে, কুলীর দলে মিশে, কুলীর কাজ ক'রে তাদের দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কিভাবে, সেই গল্প করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে কথায়-কথায় বললেন—রামকৃষ্ণঠাকুর যে কী দিয়ে গেলেন, কেউ বুঝলো না। অনেকে তাঁকে নকল করবার চেষ্টা করে কিন্তু নকল ক'রে কি আর তা' হওয়া যায়?

কালীদা (সেন) একজনের কথা তুললেন—হাবভাব-ভঙ্গীতে তিনি নাকি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অনুকরণ করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Admiration (শ্রদ্ধা) থাকলেই বাঁচোয়া, নচেৎ ও-রকম করা অনেক সময় বিপজ্জনক। বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে হীনত্ববোধের তাড়নায়, কৃত্রিম চালচলন নিয়ে চলা ভাল নয়। ওতে মানুষ আত্মপ্রতারণার পথে এগিয়ে চলে।

শিশুপালের কথাও এই প্রসঙ্গে হ'লো।

প্রফুল্ল—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" কি এইজন্যই বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

তারপর আর্য্যসভ্যতার কথা উঠলো, বললেন—আর্য্যদের যে কী জিনিস ছিলো তা' কল্পনায়ই আনা যায় না। Cabinet formed (মন্ত্রীপরিষদ্ গঠন) হ'ত বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের প্রধানদের নিয়ে। প্রধানের প্রধান, তাদের প্রধান, এইরকমভাবে একটা সুন্দর gradation (পর্য্যায়) ছিলো। যারা যত বেশীকে পূরণ করতো তারা তত বড় প্রধান। প্রধান মন্ত্রী সর্ব্বদা ঠিক হ'য়েই থাকতো, উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন নিয়ে কোন গণ্ডগোল উপস্থিত হ'তো না। অন্যদেশ ভারতবর্ষকে আক্রমণ করার সাহসই পেতো না। সব জাতটা দারুণ compact (সংহত) থাকতো। অনুলোম বিয়ে থাকার দরুন সারা জাতটা যেন দানা বেঁধে থাকতো, আর এতে evolution-এর (ক্রমোন্নতির) সুবিধা হ'তো—যথাক্রমে পাঁচ, সাত ও চৌদ্দপুরুষ ধ'রে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভিতর যদি Brahmanic instinct (ব্রহ্মণ্য-সংস্কার) দেখা যেতো—তাদের বিপ্র ক'রে দেওয়া হ'তো। উন্নতির পথ সব দিক থেকে খোলা ছিল। আগের কালে টাকা দিয়ে একজনের সামাজিক position ঠিক করা হ'তো না। কা'রও হয়তো ৫০ লাখ টাকা আছে, কিন্তু কেউ হয়তো পাঁচ টাকায় সংসার চালাচ্ছে—অথচ instinct (সহজাত সংস্কার) বড়—সে-ই বড় ব'লে গণ্য হ'তো। Instinct, habit, behaviour, activity (সংস্কার, অভ্যাস, ব্যবহার ও কর্ম্ম)—এইগুলিই ছিল মাপকাঠি। Learning (লেখাপড়া)-কে কখনও শিক্ষা বলা হ'তো না। চরিত্রগত না হ'লে তথাকথিত পাণ্ডিত্যের কোন মূল্য দেওয়া হ'তো না। সব সময় লক্ষ্য ছিল—জ্ঞান, গুণ যাতে জন্মগত সংস্কার ও সম্পদে পরিণত হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এত সূক্ষ্ম, উন্নত ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপার যে অনেকে এর অন্তর্নিহিত তথ্য বুঝতে না পেরে একে বৈষম্যমূলক বলে মনে করে—এর চেয়ে বড় ভুল আর নেই। যারা বিজ্ঞানসম্মত বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে বিপর্য্যস্ত করবার উদ্দেশ্যে generous pose (উদারতার ভঙ্গী) নিয়ে inferior (অসমর্থ)-দের ক্ষেপিয়ে তোলে, তারা সমাজের মহাশত্রু। শ্রীরামচন্দ্র শম্বুকের প্রতি অতো কঠোর হয়েছিলেন—কারণ, শম্বুকের movement (আন্দোলন)-টা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটা passionate raid (প্রবৃত্তি-প্ররোচিত অভিযান) বই আর-কিছু নয়।

অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা উঠতে বললেন—যজ্ঞে বহু লোক একত্রে সমবেত হ'তো, তাই ঘি পোড়ান হ'তো, atmosphere (আবহাওয়া)-টা ionised (পরিশোধিত) হ'য়ে যেত, তা' স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। ঐ জিনিস inhale (আঘ্রাণ) করলে আয়ু বেড়ে যেত। যজ্ঞে হোতা, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা ইত্যাদি থাকতো—ওটা কতকটা demonstration (প্রদর্শন)-এর মত। উদ্‌গাতারা শ্লোগান গেয়ে বেড়াত, তা' লোকের মনে গেঁথে যেত। Principles (নীতি-গুলি) শ্লোগানের আকারে জনসাধারণের কানে বারবার না ঢুকালে তারা তা' গ্রহণ করতে পারে না।

এক দাদা বিদায় নিতে এসেছিলেন, তিনি চ'লে যাবেন। তাঁকে স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি বিধি নিখুঁতভাবে পালন করতে ব'লে দিলেন, সেই সঙ্গে আরো বললেন—স্বস্ত্যয়নী পালা মানে যুগপৎ পাঁচটি নীতি সক্রিয়ভাবে মেনে চলা, তাতে উন্নতি অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। উক্ত দাদা চ'লে যাবার পর পূর্ব্ব-প্রসঙ্গ ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বকে বলি দেওয়া হ'তো না—বরং ঐক্য ও মিলনের প্রতীকরূপে অশ্বকে nurture ও nourish (পালন ও পোষণ) করা হ'তো, মেধ্-ধাতুর অর্থ মিলিত হওয়া। অশ্বকে সমাদর ক'রে অশ্বপ্রেরক রাজার supremacy with due regards accept (রাজার প্রভুত্ব যথোচিত সম্মানের সহিত স্বীকার) করতো, সকলে যে রাজার অনুগামী এবং তাঁর সঙ্গে ঐক্য ও মিলনকামী—এই বোঝা যেত।

১লা আষাঢ়, ১৩৪৬, শুক্রবার (ইং ১৬। ৬। ১৯৩৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের ধারে কলতলার পাশে খড়ের ঘরে চৌকিতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে আছেন। চতুর্ভুজদা (উপাধ্যায়) এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বললেন—চতুর্ভুজ, এবার লেগে যাও জোরে। (পরে আবার বললেন)—তোমার কোন ভাই নাকি শিলং থাকে? শুনেছি বাংলা জানে। তাকে যদি আনতে পার। কিছু গয়লা নিয়ে এসো, smithy (কর্ম্মকারের কাজ) জানে, এমন কয়েকজন লোক যদি আনতে পার, তাহ'লে workshop (কারখানা)-টা জোরে চালান যায়। লেদের কাজ, ঢালাইয়ের কাজ, ঝালাইয়ের কাজ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ইত্যাদি জানা লোক হ'লে workshop (কারখানা) থেকেই তাদের খরচ বেশ চলবে। Military man (সামরিক বিভাগের লোক) যদি আনতে পার, খুব ভাল হয়—তারা military training (সামরিক শিক্ষা) দেবে, তোমাদের একটা religious fort (ধর্ম্মীয় দুর্গ)-এর মত হবে, তোমরা অসময়ে কত লোককে আশ্রয় দিতে পারবে।

দুপুরে palmistry, astrology, spiritualism (হস্তরেখা, জ্যোতিষ, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব) সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বললেন—Urge-এর (আগ্রহের) দরুন আমাদের brain-এ (মস্তিষ্কে) tension (চাপ) আসে, আর তার থেকে আমাদের হাতের রেখা ফুটে ওঠে, কপালেও রেখা পড়ে। আমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করি। আমরা হয়তো বুঝতে পারি না কী গড়ছি, কিন্তু হাত দেখলে তার পরিচয় পাওয়া যায়। জন্মলগ্ন দেখে যে একজনের সারাজীবনের কথা predict (ভবিষ্যদ্বাণী) করা যায় তার কারণ, কোন্-কোন্ বৃত্তি যে তাকে rule (নিয়ন্ত্রণ) করছে, জন্ম-লগ্নের গ্রহসমাবেশ দেখে এইটে জানলে সেই সব বৃত্তির দ্বারা চালিত হ'য়ে তার জীবনটা কেমন দাঁড়াতে পারে বোঝা যায়। একটা গাড়ীর চাকার পরিধি যদি জানা থাকে তাহ'লে কতবার ঘুরে কত দূর যাবে বলতে পারি। যাঁরা বৃত্তির অধীশ, তাঁদের সম্বন্ধে কিন্তু ঠিক করে বলা যায় না। তাঁরা একটা অবস্থায় প'ড়ে কিভাবে react (প্রতিক্রিয়া) করবেন, সে তাঁদের নিজেদের উপর নির্ভর করে। আমার সম্বন্ধে ভৃগু লিখেছেন যে, কত কী হ'তে পারে তা' বলা যায় না। মানুষ ইষ্টদ্বারা চালিত হ'লে তার সম্বন্ধে ও-কথা খাটে। ইষ্টের উপর একান্ত অনুরক্তি থাকলে মানুষ কর্ম্মফল এড়াতেও পারে। যতীনদা (যতীন্দ্রনাথ আচার্য্য-চৌধুরী) যদি আমার কথা শুনত—সেদিন না যেত, তাহ'লে অমনভাবে মৃত্যু হ'ত না।

* * * *

তপোবন বোর্ডিং-এ একটি ছেলে খুব অসুস্থ, সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর খুব উদ্বিগ্ন। বারবার তার খবর নিচ্ছেন।

বিকালে বলছিলেন—প্রতিলোমজ সন্তান কখনও ভাল হ'তে পারে না। তাদের মধ্যে treachery (বিশ্বাসঘাতকতা) থাকবেই। উচ্চবর্ণের মেয়ে নিম্নবর্ণের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'লে সেখানে husband-এর (স্বামীর) উপর regard (শ্রদ্ধা) থাকতেই পারে না—বহু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। অমনতর ক্ষেত্রে শোনা যায় যে, স্বামীর প্রতি বিরক্তিবশতঃ সন্তানকে মা 'কুত্তাকা বাচ্চা' পর্য্যন্ত ব'লে থাকে। Acquisition (অর্জ্জন) আর instinct-এর (সংস্কারের) ঢের তফাৎ। নিউটন ছিলেন Mathematician by instinct (সংস্কারসিদ্ধ গণিতজ্ঞ)। Mathematics (গণিত) তাঁর চাইতে কেউ হয়তো ভাল জানতেও পারে—কিন্তু তাদের মধ্যে Mathematics (গণিত) হয়তো instinct (সহজাত সংস্কার)-এর স্থান নেয়নি। Instinct (সহজাত সংস্কার) কেমন—যেমন heart beat করে (হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়), কান শোনে, নাক নিঃশ্বাস নেয়, পা চলে। একটা বড় বংশের ছেলে হয়তো অনুশীলনের অভাবে একটা বনবৃষ হ'তে পারে, কিন্তু তার মধ্যে instinct (সহজাত সংস্কার) সবই ঠিক থাকে। Instinct

(সহজাত সংস্কার)-এর যেখানে গণ্ডগোল হয়েছে, বুঝতে হবে সেখানে বংশে প্রতিলোমের সংস্রব ঢুকেছে বা বিবাহ-বিধির ব্যত্যয় হয়েছে। Corruption (কলুষ)-এর দরুন অনেক সময় ভদ্রঘরেও প্রতিলোমজ সন্তানের জন্ম হয়, এমনও অসম্ভব নয় যে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ-সন্তান ব'লে সমাজে পরিচিত হচ্ছে।

তারপর বললেন—মানুষ এক শুনতে আর-একটা শোনে, অনেক সময়, তার কারণ হ'ল complex (বৃত্তি)। এ-সব থেকে তার চরিত্র বোঝা যায়। মানুষ যে কী এবং কেমন, সে নিজেই ব'লে দেয়—তার থেকে অন্য কেউ যদি কোন সিদ্ধান্তে এসে কিছু বলে—তাকে অন্তর্য্যামী মনে করে। কিন্তু ব্যাপারটা তা' নয়, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ দিয়েই সব বের করা যায়—সে ভুল শুনেও অন্য রকমটা না শুনে ঠিক এই রকমটা শুনল কেন?

১৬ই আশ্বিন, ১৩৪৬, মঙ্গলবার (ইং ৩। ১০। ১৯৩৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ খুব ভোরে উঠলেন। উঠেই 'নিভৃত নিবাসে' পায়খানায় গেলেন। আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিদিন সকালে 'নিভৃত নিবাসে' বহুক্ষণ থাকেন, আজও তেমনি ছিলেন। বাইরে এসে কেষ্টদাকে একটা motto (বাণী) দিলেন। স্নানের সময় প্রফুল্ল কাছে গেল, স্নান-সমাপনান্তে তাকে দিয়েও একটা motto (বাণী) লিখালেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন সর্ব্বদা কারণমুখী। কোন ব্যাপার লক্ষ্য করামাত্র তার অন্তর্নিহিত যে নিত্য সত্যটি রয়েছে তা' তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে এবং তা' তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে দেন,—অনেক বাণী ও ছড়ারই উৎপত্তি এমনভাবে।

স্নানের পর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে মনুসংহিতা পড়ছিলেন—ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৭তম শ্লোকটি বিশেষ ক'রে প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৮তম শ্লোকটি মুখস্থ করতে বললেন। এই দুটি শ্লোকেই আদর্শ-সম্মত বিবাহ-সংস্কারে পবিত্রতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ আছে।

Offer দেওয়া (বরণ করা) সম্বন্ধে রাত্রে বললেন—Offer (বরণ) ছেলেখেলা ব্যাপার নয়। অপরিণত বয়সে যদি কোন মেয়ে offer দেয় (বরণ করে), তা' consider (বিবেচনা) করবার যোগ্য নয়, মেলামেশার ফলে যে আকর্ষণ আসে তা' কিন্তু ঠিক নয়, offer-এ (বরণ-ব্যাপারে) বাপ-মা'র মত থাকা উচিত। যে-পুরুষ offer দেবার (বরণ করবার) প্ররোচনা যোগায়, সে কিন্তু আদৌ যোগ্য পুরুষ নয়।

১৭ই আশ্বিন, ১৩৪৬, বুধবার (ইং ৪। ১০। ১৯৩৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বাঁধের ধারে খড়ের ঘরে নিরালায় বসেছিলেন। একটি দাদা এসে তাঁর দুর্ব্বলতার কথা ব্যক্ত করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পৌরুষ-দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললেন—পুরুষত্বের অবমাননা আমি সহ্য করতে পারি না, বড় কষ্ট হয়। সে কি পুরুষ মানুষ, যে একটা মেয়ের প্রতি কামলোলুপতার জন্য জীবন বলি দিতে চায়? মানুষ একবার ঘা খেয়েও যদি সাবধান না হয়, তার আর কী করা যায়?

ভদ্রলোকটি বললেন—পারি না যে!

শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—ভণ্ডামি করিস্ কেন? পারি না মানে? না-পারার কথা বসে-বসে ভাবিস্—তাই পারিস্ না। চাস্ না, তাই পারিস্ না। ও-সব ভণ্ডামি-ন্যাকামি ছেড়ে দে, বাঁচতে চাস্ তো ঠিক পথে চল্। তোর লজ্জা করে না—তুই মেয়েদের কাছে লাঞ্ছিত হোস্? মেয়েরা যদি পুরুষকে ভালবেসে কৃতকৃতার্থ বোধ না করে—তাহ'লে কী হ'ল? মেয়ে-মুখো পুরুষকে মেয়েরা ঘৃণাই করে—সে-মেয়ে যতই হীন হোক না কেন? একটা মেয়ের অভাব আর একজনকে দিয়ে পূরণ করতে চাইলে distortion (বিকৃতি) হয়, জড়া পাকিয়ে যায়; অর্থাৎ, perverted sexuality grow করে (বিকৃত যৌন-আকৃতি জন্মায়)—সাবধান!

পরে একটি মাকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মা হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার! রামপ্রসাদের গানে আছে—"মা হওয়া কি সহজ কথা, প্রসব করলেই হয় না মাতা।" 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' হ'তে হবে—তা না হও তো ছেলেপেলে মা থাকতে মা পাবে না।

১৮ই আশ্বিন, ১৩৪৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৫। ১০। ১৯৩৯)

সকালে ক'টা বাণী দিলেন। দুপুরে ওল্ড টেষ্টামেণ্টে বর্ণিত নারী-জাতির সৃষ্টি-সম্বন্ধে গল্প করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের গল্পগুলি এত জীবন্ত ও সরস, কথাগুলি এমন প্রাণবন্ত যে, তাঁর মুখ থেকে কিছু শুনলে মনে হয়, তা' যেন প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যায় বাঁধের পাশে গোপালদার (মুখোপাধ্যায়) সাথে কথা হ'চ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মনুসংহিতায় গোড়ায় সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে আরম্ভ করেছে, এর একটা মানে আছে। এতে পারম্পর্য্যানুযায়ী সব-কিছু যথাযথ বোঝা যায়। 'চলার সাথী'-তেও সৃজনপ্রগতি দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে, অবশ্য এটা খুব ভেবে-চিন্তে কিংবা দেখে-শুনে করিনি—আপনি থেকেই অমনটা হ'য়ে গেছে। মরকোচ-শুদ্ধ না জানলে

খামচা-খামচা উপরসা-উপরসা জেনে আমাদের বোধই পাকা হয় না। আমাদের ঋষিরা যে কত বড় বৈজ্ঞানিক তা' কেউ ভাবে না। মহাদেবের মত মহাসাধক কত ওষুধের formula (সূত্র) দিয়েছিলেন। সাধু-পুরুষদের সম্বন্ধে আজকাল ধারণাই বদলে গেছে, কিন্তু প্রকৃত সাধুরা ছিলেন দারুণ active ও practical (সক্রিয় ও বাস্তববাদী), তাঁর কতভাবেই না সমাজকে serve (সেবা) করতেন।

কথায়-কথায় বললেন—অবতার-মহাপুরুষদের কথা বলে, কিন্তু রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মত এমন একজন normal man (সহজ মানুষ) আর দেখি না।

রাত্রে সাধন-ভজনের কথা উঠতে বললেন—Normal life (স্বাভাবিক জীবন) না হ'লে সুবিধা হয় না। একরকম আছে—got-up life (কৃত্রিম জীবন), তা' টেকে না। কসরত ক'রে আমি কখনও কিছু করিনি, যখন ভাল লাগত করতাম। আমি তো সরকার-সাহেবকে দেখিনি, তাই মা-ই আমার কাছে সব। যা' করতাম, মা'র কাছে বাহাদুরি নেবার জন্য করতাম। হাউস হ'লো, রাত-দুপুরে নাম করতে লাগলাম। আর, খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করার একটা ঝোঁক ছিল। বাইশ মিনিটে খোক্‌সা থেকে তিন মাইল পায়ে হেঁটে গিয়েছি। Activity (কর্ম্মপরায়ণতা) আমার খুব বেড়ে গিয়েছিল। কাজ বেশ ভাল লাগত। কীর্ত্তন-টীর্ত্তন করতাম। Trance-এর (সমাধির) সময় consciousness (বাহ্যচেতনা) থাকত না। তাই ও-গুলিকে বড় মূল্য দিই না, অন্য সব সময়ই conscious (সচেতন) থাকতাম। একদিন একটা thermometer হাতে নিতেই ১১০ ডিগ্রী তাপ উঠে গেল—গায়ে জল দিলে উবে যেত, এই সব হ'ত। অনুভূতি-সম্বন্ধে যা' dictate করেছি (মুখে বলেছি)—ঐ রকম বোধ সব হ'ত।

লোকে ভগবান মানেই বোঝে না, কিম্ভূত-কিমাকার ধারণা নিয়ে চলে—কী যে করে, তাই কিছু হয় না। যারা মহাপুরুষের সংসর্গ লাভ করে—তারা সত্য-সত্যই ধন্য হ'য়ে যায়—শত সাধনা ক'রে যা' বোঝা যায় না, normally (সহজভাবে) তারা তা' বুঝতে পারে, দেখতে পারে—আর normal (সহজ) না হ'লে ঠিক হয় না। তবে শুধু কাছে থাকলে হবে না, অনুরাগের সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করা চাই।

১৯শে আশ্বিন, ১৩৪৬, শুক্রবার (ইং ৬। ১০। ১৯৩৯)

আশ্বিনের রৌদ্র-ঝলমল সুন্দর সুপ্রভাত। শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একটি বেঞ্চিতে বসেছেন। মুখে তাঁর মধুর হাসি, চোখে যেন কোন সুদূরের স্বপ্ন—পরম স্নেহভরে সমবেত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন—তাদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনে' যার যেমন প্রয়োজন, ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন। সাধন-ভজন সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Inferiority complex (হীনম্মন্যতা বোধ) থেকে সাধনা সুরু করলে সব পণ্ড হয়—'আমি সাধক' এই consciousness (বোধ) আসলেই সর্ব্বনাশ! অনেক সময় এই সব সাধক নিজের শক্তিমত্তার বাহাদুরি করে, কিন্তু ইষ্টানুরাগ না থাকলে কিছুই হ'লো না—ইষ্টের টানে যে যা' করে তাই-ই হয় normal (সহজ স্বাভাবিক); নচেৎ লাখ সাধনাও চরিত্রে গাঁথে না, সত্তাকে স্পর্শ করে না।

সন্ধ্যায় একটি দাদা তাঁর অভাব-অভিযোগ ও ঋণের কথা বললেন।

তার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার একটা রকম আছে, সবাইকে মনে হয় যেন আমি। কারও অসুবিধা দেখলে প্রথমেই আমার মনে হয়—আমি ও-অবস্থায় পড়লে আমার কেমন লাগতো। অন্যের অভাব নিজের অভাব ব'লেই মনে হয়—নিজের স্বার্থ আছে ব'লে তাই তা' দূর করতে চেষ্টা করি। এইভাবে ভালবেসে, সেবা দিয়ে মানুষকে আপন ক'রে নিতে হয়।

পরে বললেন—আমি সাধারণতঃ ঋণ করি না, দরকার হ'লে চেয়ে নিই, তবে তাকে দেবার রোখ থাকে প্রবল, আর দেওয়াটাই আমার interest (স্বার্থ) ব'লে মনে করি। ঋণ না করাই ভাল—ঋণ ক'রে সময়মতো যদি না দেওয়া যায় তা' বড় খারাপ। আর, আমি নিজে যাকে যা' দিই, তা' ফিরে পাবার আশায় দিই না। তাই বলি, মানুষ আপন ক'রে নিতে পারলে ভাবনা কী?

এই কথা-ক'টির মধ্যে দাদাটি তাঁর সমস্যার সমাধান পেয়ে পরম পুলকিত অন্তরে গাত্রোত্থান করলেন।

২০শে আশ্বিন, ১৩৪৬, শনিবার (ইং ৭। ১০। ১৯৩৯)

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ পায়খানায় গিয়ে অনেকগুলি কথা মনে আসছিল—এখন ভুলে গেছি। কে যেন টক্-টক্ ক'রে ব'লে দিচ্ছিল, পায়খানায় গেলে অনেক সময় এইরকম হয়।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ উঠল। পূর্ব্ববর্ত্তীকে পরিপূরণের কথায় শ্রদ্ধেয় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মধ্যেই এইটে খুব distinct and prominent (পরিষ্কার ও প্রবল) দেখা যায়। আমার মনে হয়, বুদ্ধদেবের মধ্যে এই দিকটা স্পষ্ট নয়, তাই বুদ্ধদেব আস্তে-আস্তে বাদ পড়লেন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক'মে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাদ পড়া তো কথা নয়। বুদ্ধদেব ও হজরত মহম্মদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে যে blasphemy (অপবাদ) চলছে তার নিরাকরণ করতে হবে। বুদ্ধদেবের নিজের লেখা কোন বই নেই? তার থেকে draw (খোঁজ) করতে হয়। বুদ্ধদেব তো শুনেছি, বর্ণধর্ম্ম মানতেন, যিনি 'আর্য্যসত্য', 'আর্য্যসত্য' ক'রে অতো বলেছেন—Aryan culture-এর (আর্য্যকৃষ্টির) উপর তার সবকিছু based (প্রতিষ্ঠিত)।

কেষ্টদা—ধম্মপদ তো বুদ্ধদেবের লেখা, তার থেকে নজির দেখান তো মুশকিল! বর্ণভেদ তিনি মানতেন এমন তো পাওয়া যায় না, তবে তার বিরুদ্ধেও কোন কথা সেখানে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরও একটা মুশকিল আছে, হয়তো বিশিষ্ট কতকগুলি ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলা তাঁর কতকগুলি কথা লিপিবদ্ধ আছে, তার থেকে প্রত্যেকটা বিষয়-সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত বোঝা যায় না।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের ধারে একখানি চৌকিতে বসেছেন—বিনতি-প্রার্থনার পর আশ্রমের বহু দাদা ও মায়েরা সমবেত হয়েছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী), প্রফুল্ল, কালিদাসীমা প্রমুখ আগে থাকতেই উপস্থিত ছিলেন। একজন মৌলভী সাহেব আসলেন, তাঁর সঙ্গে ইস্‌লাম-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোরাণ এমন জিনিস, রসুল কত পরিষ্কারভাবে সব কথা ব'লে গেছেন। কারু সঙ্গে কোন বিরোধ নেই, অথচ আমি একটা মুসলমানের মতো মুসলমান কমই দেখতে পাই। রসুল কি কখনো এ-কথা বলেছেন যে, মুসলমান বা ইস্‌লামপন্থী হ'তে গেলে কারু hereditary culture-কে (বংশানুক্রমিক কৃষ্টিকে) অস্বীকার করতে হবে? পূর্ব্ববর্ত্তীকে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) ক'রে যাকে accept (গ্রহণ) করতে যাই, প্রকৃতপক্ষে তাকেই কি betray (ঠকান) করা হয় না? আমি ইচ্ছা করলেই তো ইস্‌লামের সেবক এই অবস্থায় হ'তে পারি—প্রত্যেকেই প্রত্যেক অবস্থায় পারে—আর তা' উচিতও, কিন্তু conversion (ধর্ম্মান্তর)-এর কথা রসুলের মধ্যে নেই, বরং তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীকে কত মান্য দিয়েছেন। রসুলের কথা যারা অমান্য করে, তারাই কি কাফের নয়? পরবর্ত্তীদের কথাও হাদীসে আছে, এমন-কি এও আছে—তিনি যদি হাবসীদের ক্রীতদাস হন—তবু তাঁকে গ্রহণ করবে। আর, ঐ যে খতম—না খাতেমের কি মানের গণ্ডগোল আছে? পরবর্ত্তীর কথা যখন আছে তখন রসুলেই সব খতম, অর্থাৎ শেষ—এ-কথা তো বলা চলে না, বরং continuity (ক্রমাগতি) ব্যাহত না হয়, এইরকম মানে করাই সমীচীন। অবশ্য, পরবর্ত্তী যখন আসেন তখন পূর্ব্ববর্ত্তী খতমই হন। তার কারণ, তিনি তো পূর্ব্ববর্ত্তীর রূপ নিয়ে আসেন না। তবে এটা ঠিক যে, সেই একই প্রেরণা বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেন—একই মূর্ত্তিতে আসেন না। কিন্তু যিনি আসেন তিনি তাঁরই continuation (পরবর্ত্তী), তাঁকেই base (ভিত্তি) ক'রে সেই প্রেরণারই further fulfilment (অধিক পরিপূরক)।

মৌলভী-সাহেব প্রত্যেক কথাই অনুমোদন করলেন এবং কোরাণের নানা শ্লোক উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা সমর্থন করতে লাগলেন। পরবর্ত্তী সাধু মহাপুরুষের কথা যে ইস্‌লামে আছে তা' মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন।

২১শে আশ্বিন, ১৩৪৬, রবিবার (ইং ৮। ১০। ১৯৩৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব হাসিখুশি হ'য়ে গল্প করছিলেন—যখন স্বামী মারা যায় তখন স্ত্রী সুর ক'রে এই ব'লে কাঁদে—তুমি আমার কী ক'রে গেলে গো, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াব, ইত্যাদি। এখানে স্বামীর প্রতি ভালবাসার চাইতে স্বামীর টাকা-পয়সার প্রতি ভালবাসাই যেন বেশী। কিন্তু সাধারণতঃ স্ত্রী মারা গেলে পুরুষ বলে—আমার আর কেউ নেই, আমাকে একেবারে একলা ফেলে গেছে! তাই মনে হয়, পুরুষের দিক দিয়ে sincerity (আন্তরিকতা) বেশী। মেয়েরা আবার অল্পদিনেই ছেলেপুলে, ঘর-সংসার নিয়ে বেশ থাকে—সব ভুলে যায়। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এমন, একথা বলি না।

সত্যিকার স্বামিভক্তি-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এমন মেয়ে খুব কম দেখা যায় যে, স্বামীর জন্য স্বামীর মুখ চেয়ে তাঁর সঙ্গে গিয়ে গাছতলায় বাস করতে প্রস্তুত—যে কিনা নিজের বুক দিয়ে স্বামীর দুঃখ-কষ্ট ঢেকে রাখতে চায়। তেমন মেয়ে যদি কেউ থাকে—সে এদেশের নয়—স্বর্গ না কি বলে, সেই রাজ্যের মানুষ সে।

কারখানার সুধীরদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ একটা কাজের ভার দিয়েছেন। সুধীরদাও নিরন্তর সেই কাজে লেগে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সারাদিন ৪/৫ বার লোক পাঠিয়েছেন, বিকালে নিজে এসে কাজের কাছে বসলেন। মাঝা-মাঝে উৎসাহ-সূচক কথা বলছেন।

২২শে আশ্বিন, ১৩৪৬, সোমবার (ইং ৯। ১০। ১৯৩৯)

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের চৌকিতে বসেছিলেন—অনেকেই কাছে ছিলেন। কলকাতার একজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে কৃতকার্য্য হওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি মানুষমাত্রেরই প্রধান করণীয়—নিজে সাধনা করতে হবে, সঙ্গে-সঙ্গে পারিপার্শ্বিককে বোঝাতে হবে, আর ইষ্টভরণের মধ্য-দিয়ে নিজের সর্ব্বশক্তি ইষ্টে কেন্দ্রায়িত ক'রে সত্তাকে অটুট ক'রে তুলতে হবে। পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়ে মানুষ চলতে পারে না, তাই পারিপার্শ্বিকের সেবায় মানুষের স্বার্থ নিহিত। প্রত্যেক ব্যাপারেই যাজন ও সেবা প্রয়োজনীয়। মনে করুন, আপনার সাইকেলের দোকান আছে। আপনি চিন্তা করতে লাগলেন, কেমন ক'রে আপনি প্রত্যেককে একখানি ক'রে সাইকেল দিতে পারেন। হয়তো অনেক সুবিধা ক'রে—by instalment (কিস্তিবন্দীতে) টাকা নিয়ে একটা গরীব মানুষকেও আপনি সাইকেল যুগিয়ে দেবার

ব্যবস্থা করলেন, সঙ্গে-সঙ্গে তার কাছে যাজন করলেন—সাইকেল দিয়ে তার কতখানি সুবিধা হ'তে পারে। তখন সে সাইকেল কিনল—সাইকেল-এর advantage (সুবিধা) পেল। তখন সে প্রাণখুলে আপনাকে ধন্যবাদ দেবে—অমুক অবস্থা বিবেচনা ক'রে কত সুবিধা ক'রে আমাকে একখানা সাইকেল জুটিয়ে দিয়েছে। ঐরকমভাবে ব্যবস্থা ক'রে না দিলে আমার হয়তো সাইকেল কেনাই হ'তো না। আমার কতই সুবিধে ক'রে দিয়েছে। তার কথা শুনে অনেকেই আপনার দোকানে আসতে লাগল। এমনি ক'রে আপনার ব্যবসা বাড়তে লাগল। তা' না ক'রে আপনি যদি তাকে ঠকিয়ে বেশী লাভের দিক নজর দিতেন—তাহ'লে পরে সে টের পেয়ে লোকের কাছে ব'লে বেড়াতো—লোকটা জোচ্চোর, ওর দোকানে কেউ যেও না কিন্তু। আপনার যদি এক হাজার খরিদ্দার থাকে আর প্রত্যেকের কাছ থেকে যদি সামান্য লাভও পান, তা'ও আপনি ব'লে-ক'য়ে যদি নেন, তা একশত খরিদ্দারের কাছ থেকে বেশী লাভ করার চাইতেও কি বেশী লাভজনক নয়? আর, ব্যবসা কথাটা এসেছে—বি—অব + সো-ধাতু হ'তে, অর্থাৎ যা'-কিনা বিনাশ থেকে বিশেষ ক'রে রক্ষা করে। কিন্তু যা'ই করতে যাও মূলে থাকা চাই গুরুভক্তি—তাতে প্রবৃত্তি কাবেজে থাকে, সেবাবৃত্তি তরতরে হ'য়ে ওঠে—কাজ হয় নিখুঁত। এই গুরুভক্তি থেকেই মানুষ মঙ্গলের অধিকারী হয়। তাই, গুরুকে ইষ্ট বলে। ইষ্ট মানে মঙ্গল, অর্থাৎ গুরুকে অনুসরণ করলেই মানুষের মঙ্গল আসে। আর, এই অনুসরণের পন্থাই হ'চ্ছে—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি।

২৪শে আশ্বিন, ১৩৪৬, বুধবার (ইং ১১।১০।১৯৩৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের পাশে খড়ের ঘরে ব'সে। এক নেপালী মা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমাদের ঘর (অর্থাৎ অতিথিশালা) ছেড়ে দিতে বলছে, আমি এখন কোথায় যাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে উত্তর করলেন—এখন বহুলোক আসবে যে, ওখানে তোব থাকতে কষ্ট হবে, তুই একটা ব্যবস্থা ক'রে নে।

মা-টি নাছোড়বান্দা হ'য়ে বললেন—আমি কোথায় কী করব, আপনি একটা ঠিক ক'রে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই-ই পারবি, তুই খুব ভাল পারিস্, তুই যা' পারবি, আর কেউ তা' পারবে নানে, খুঁজে বের ক'রে ফেল্।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ভঙ্গীটাই এমনতর যে সেই মা-টি এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে চ'লে গেলেন যে তাঁর দ্বারা সবই সম্ভব।

সুরেনদা (ভৌমিক) ব'লে এক ভদ্রলোক Jaundice-এ (পাণ্ডুরোগে) ভুগে-ভুগে অস্থিচর্ম্মসার হয়েছেন। কয়েকদিন ধ'রে আশ্রমে থেকে চিকিৎসিত হচ্ছেন। তিনি কাছে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লাসভরে ব'লে উঠলেন—আরে! তুই তো ভাল হ'য়ে গিয়েছিস, আগের চেয়ে চোখের হলদে-ভাব কত ক'মে গেছে!

উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলিস, অনেকটা ভাল না?

সকলে বললেন—হ্যাঁ।

দেখতে-দেখতে সকলের চোখের সামনে তিনি যেন অনেকখানি চাঙ্গা হ'য়ে উঠলেন। উক্ত দাদার পেট থেকে নানারকম পোকা পড়ে, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানায় রীতিমতো কেরোসিন তেল দিতে বললেন, যাতে উড়ো-পোকাগুলি অন্যকে আক্রমণ না করে।

আভিজাত্যবোধ-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের ভরদ্বাজ বড় Physicist বা Chemist (পদার্থবিদ্ বা রাসায়নিক) হ'তে পারেন, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ ঋত্বিক্, সেই ground-এ (ভিত্তিতে) দাঁড়িয়ে তাঁর সব-কিছু। তিনি যা'ই হোন না কেন, তাঁর উষ্ণীষ ও মেখলা তিনি ত্যাগ করেননি। ঋত্বিকের পোষাকটা বড় পবিত্র, সাদা ধবধবে চাদর ও ফতুয়া গায়ে দিয়ে যখন একটা লোক দাঁড়ায়—যেন দেবতার মতো মনে হয়।

২৫শে আশ্বিন, ১৩৪৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১২। ১০। ১৯৩৯)

জাতিস্মরদের খবর নিয়ে শ্রদ্ধেয় সুশীলদা (বসু) আজ আশ্রমে ফিরে এসেছেন। সুশীলদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সব ঘটনা বিস্তারিত বলছেন। সব ঘটনা শুনে ঠাকুর যেন আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পড়ছেন।

কথায়-কথায় সুশীলদা বললেন—দুই জন জাতিস্মরের কোষ্ঠী দেখলাম—তারা যে-দশায় মারা গেছে, ঠিক সেই দশাতেই জন্মগ্রহণ করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও গোপালদা (মুখোপাধ্যায়) উল্লাস-সহকারে বললেন—তাই নাকি, আমরা আগে যা' আঁচ করেছিলাম তাই তো হয়েছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোপাল! দেখ্ তো দেখি ভাল ক'রে, অনেক আগেই তো তোকে এ-কথা বলেছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—সবই তো হ'লো, কিন্তু আদত কথা তো বোঝা গেল না। কেমন ক'রে এটা সম্ভব হয় সেইটেই তো কথা। জগতে এই-ই তো problem (সমস্যা), এত বড় problem (সমস্যা) আর কিছু নেই—আর খুব যে অসাধারণ

একটা-কিছু তা'ও তো মনে হয় না। তুকটা যদি কোনভাবে বের করা যায়—তাহ'লে তো কাম ফর্সা। এইটে হ'লে মানুষের সব হ'য়ে যায়—যা' পাওয়া যায়নি তার জন্য আর চিন্তার কারণ নেই, conscious entity (চেতনসত্তা) তো রইলই, beyond-কে invade করা (অপ্রাপ্তকে পাওয়া) কঠিন কিছুই নয়।

সুশীলদাকে বললেন—আপনি কাল থেকে সব জায়গায় চিঠি লিখতে সুরু করেন। Buddhist meditation (বৌদ্ধমতে ধ্যানের পদ্ধতি) বইটা (এই বইতে নাকি পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি উদ্রিক্ত করবার পন্থার নির্দ্দেশ আছে) খোঁজ করুন।

সুশীলদা একজন সাধুর কথা বললেন, তিনি গাছের পাতা খেয়ে জীবন-ধারণ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা তো খাওয়া নিয়ে কত বাড়াবাড়ি করি, অথচ কত সহজে খাদ্যের সমস্যা মেটান যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেন আজ মেতে গেছেন, বার-বার সুশীলদাকে ডাকছেন, একই কথা বার-বার শুনছেন, সবাইকে ডেকে শোনাচ্ছেন।

সন্ধ্যাবেলায় সুশীলদা পাপ্লাজীর মৃত্যুর পর নরদেহে পুনরাবির্ভাবের বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আতিবাহিক দেহ ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রফুল্ল—আপনার নাকি পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত মনে আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি জানি, তা' কল্পনা কিনা বুঝতে পারি না। তবে যেন স্পষ্ট মনে হয়, আমি আর কর্ত্তামা নদীতে একটা নৌকায় বেড়িয়েছি—চারিদিকে কত কাছিম। কর্ত্তামাকে এ-কথা জিজ্ঞাসা করেছি—কর্ত্তামা আমার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন। আমার মনে পড়ে—এক সময় পাহাড়ের পাদদেশে ছিলাম, একটা পাথরের উপর আমি বসতাম, সামনে দিয়ে পূর্ব্ববাহী ছোট নদী ব'য়ে যেত, সেখানে লাল-লাল সুন্দর পথ, আমার একটা বৌ ছিল, সে আমাকে খুব ভালবাসত, এখন গেলে সে যেন এখনও আমাকে চেনে। * * * * এই জন্মের কথা মনে হয়, যেন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম একটা ঘরে, সেখানে মিট্‌মিট্‌ ক'রে আলো জ্বলছিল—মা বলেছেন যে ঠিক ঐ রকমই নাকি হয়েছিল। আমি কত কী বোধ করি, সব real (সত্য) মনে হয়—অচানক কত কথা মনে জাগে, আগে বলতাম না, এখন দুই-একটা বলি।

Ecto-plasmic body (কারণ-দেহ)-সম্বন্ধে আবার কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Germ-plasm (জনন-কোষ) থেকেই তো body (শরীর), তার beyond-এ (অতীতে) যে body (দেহ) তাই। Gaseous (গ্যাস) জিনিসটা যখন liquid (তরল) হয়, steam (বাষ্প) যখন condensed (ঘনীভূত) হ'য়ে

vapour-এর (জলকণার) রকমে আসে, তখন আমরা form (আকার)-টা দেখতে পাই। Ecto-plasmic body (কারণ-দেহ)-টাও তাই খুব fine matter-এর (সূক্ষ্ম পদার্থের) composition (সংমিশ্রণ) ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রফুল্ল—শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর স্বামিজী তো তাঁকে বহুবার দেখেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বামিজী হয়তো দেখতে পারেন, কি আর একজন হয়তো দেখতে পারে—কিন্তু environment-এর (পরিবেশের) সকলে যদি স্বাভাবিকভাবে না দেখতে পারে তাহ'লে কী হ'লো? আমার রকমটাই এইরকম যে, concrete (বাস্তব) না হ'লে আমার কিছু ভাল লাগে না। যদি কোন instrument (যন্ত্র)-এর মধ্যে-দিয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে environment-এর (পারিপার্শ্বিকের) সকলে মিলে বোধ করতে না পারি—তাহ'লে খুশি হই না। তাই, আমার কথাগুলির মধ্যে বোধহয় Philosophy, Art, Religion—সবকিছু Science-এ merge ক'রে গেছে (দর্শন, কলা, ধর্ম্ম—সবকিছু বিজ্ঞানের সাথে মিলে আছে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর অমর ভাইকে (ঘোষ) গ্রামের এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একমণ চাল সংগ্রহ ক'রে দিয়ে আসতে বললেন। বললেন—চালটা যেন ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিশেষ একটি vision (দর্শন)-সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন—আমি একদিন কাশীপুরের রাস্তা দিয়ে আসছি—দেখছি, চারিদিক জ্যোতিঃতে ছেয়ে গেছে, চারিদিকে সব দেবদেবীরা গান করছেন—দুটো line (পঙক্তি) আগে আমার মনে ছিল, অনেকবার বলেছিও—এখন 'স্বাগতম্' এই পদটা আমার শুধু মনে পড়ে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে একদিন বেতবনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলাম—কোন খেয়াল থাকত না। চলছি তো চলছি—পথ-ঘাট না দেখে সিধে হাঁটতাম—কেউ ব'লে দিতে চেতনা আসতো—এখনও অনেক সময় মনে হয়, আমিই বুঝি গাছ হ'য়ে আছি।

ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারতে নাকি শ্রীশ্রীঠাকুরের পিঠে দাগ প'ড়ে গিয়েছিল, তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললেন—একজনকে হঁচোট খেতে দেখে যেমন আমরা ব্যথা বোধ করি—এও সেই ধরনের। Feeling (বোধ)-টা এত strong (তীক্ষ্ণ) যে without physical stimulus nerve irritated হয় (ভৌতিক উত্তেজনা ছাড়াও স্নায়ু উত্তেজিত হয়), যেমন night pollution (স্বপ্নদোষ)—মনে হয় যেন sexual intercourse (যৌন-সংস্রব) হ'চ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' হয় না, তবু semen discharged (বীর্য্যপাত) হয়।

যাঁরা খুব ভালভাবে স্বস্ত্যয়নী পালন করেন, তাঁরা যদি স্বস্ত্যয়নীর ফুল-টুল দিয়ে কবচ ক'রে দেন, নাকি খুব ফলপ্রদ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই সম্পর্কে বললেন—বোধহয় একটা vital push (জীবনীয় উদ্দীপনা) দিতে পারে তারা।

২৬শে আশ্বিন, ১৩৪৬, শুক্রবার (ইং ১৩। ১০। ১৯৩৯)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছনে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় বেঞ্চিটির উপর এসে বসেছেন। এক-এক ক'রে লোক জমতে লাগলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর এক দাদাকে কাজ-কর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করছিলেন, তিনি বললেন—সহকর্ম্মীর ঔদাসীন্য ও গাফিলতির দরুন কাজ আশানুরূপ হয়নি।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ললিতগম্ভীর ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন—আমরা principle-এ (আদর্শে) যদি খুব strong (অটুট) হই—তাহ'লে আমরা পারিপার্শ্বিকের কাছে yield (বশ্যতাস্বীকার) করি না, বরং পারিপার্শ্বিক আমাদের কাছে yield (বশ্যতাস্বীকার) করে। আমাদের যদি এমন ঝোঁক থাকে যে, যা' করার তা' করবই, আর সত্যি-সত্যি তা যদি করিই এবং সে-কাজে যদি পারিপার্শ্বিককে নিয়ে চলা প্রয়োজন হয়, তবে পারিপার্শ্বিকের সকলেও উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—যারা চায় না, তারা আপনা থেকে খ'সে পড়ে। আমি আর বীরুদা (রায়) একদিন একসঙ্গে যাচ্ছি—বীরুদা কিছুদূর গিয়ে tired (ক্লান্ত) হ'য়ে ব'সে পড়ল—আমি তার জন্য wait (অপেক্ষা) না ক'রে সোজা হাঁটতে লাগলাম, বীরুদাও উপায়ান্তর না দেখে হাঁটতে সুরু করল। তাই, ঢিলেমি বা গাফিলতিকে প্রশ্রয় দিতে নেই। মজা এমনি—মানুষের ইচ্ছাকৃত ত্রুটি অবশভাবে ভুল-ত্রুটিকেই ডেকে আনে। কেউ হয়তো কোথায়ও যাবে কোন কাজের জন্য—পাকে-চক্রে হয়তো মঘার দিনই যাত্রা করল—আগে-পরে যাওয়ার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তা' ঘ'টে উঠলো না—ঐ দিন গিয়ে অনেক বাধা-বিপত্তির পর তবে হয়তো কার্য্য সমাধা হ'লো—এমন দেখলে বুঝতে হবে, তাদের principle (আদর্শ)-মুখী motor-sensory co-ordination (বোধ ও কর্ম্মস্নায়ুর সঙ্গতি)-সম্বন্ধে কোন-না-কোন গণ্ডগোল আছে—হয়তো immediate motor-sensory co-ordination (ত্বরিত-সঙ্গতি) নেই, পারিপার্শ্বিকের influence (প্রভাব) হয়তো original intention then and there fulfil (মূল উদ্দেশ্য তখন-তখন পূরণ) করতে দেয়নি, গোড়ায় একটা intention (অভিপ্রায়) ব্যাহত হবার দরুন brain-এ (মস্তিষ্কে) একটা blundering twist (ভুলের গেরো) পড়ে—পরে একটা intention (অভিপ্রায়)-মাফিক কাজ করার সময় সেই twist (গেরো)-টাই ভুল ও বেঘোরের সৃষ্টি ক'রে তোলে।

তবে কাজের পথে বাধা-বিঘ্ন থাকলেও ঘাবড়ে যেতে নাই। আমাকে একবার কুষ্টিয়ার D. S. P. (ডি. এস. পি) ডেকে নিয়ে বললেন—তোমার কাছে সকল রকম

লোককে আসতে দিতে পারবে না। নানারকম ভয় দেখালেন। কিন্তু আমি বললাম—আমি কাউকে বারণ করতে পারব না, আর আপনারও এমন কথা বলা উচিত না। পরে তিনিই দু'বেলা আসতেন, দু'বেলা না হ'লেও একবেলা তো আসতেনই। এইরকম হয়।

আগে যখন আমরা কথাবার্ত্তা বলতাম, আলাপ-আলোচনা করতাম, কত spy (গুপ্তচর) আসত, সব টুকে-টুকে নিত। একটা বাক্স তৈরী করেছিলাম, steamer-এর passenger (স্টীমারের যাত্রী)-দের কাছে থেকে ভিক্ষা করা হ'তো—সেই টাকা দিয়ে কতজনের সাহায্য করতাম—কত spy (গুপ্তচর)-দের পর্য্যন্ত তাদের বিপদ-আপদে সাহায্য করেছি—তারাই আবার আমার পিছনে লাগত, আমি বুঝতাম সব, তবু দিতাম।

প্রফুল্ল—তা'তে তো তাদের ক্ষতিই করা হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবতাম, ওদের যদি না দেখি—ওরা বাঁচবে না। রোগী যে কুপথ্য করে, সে কি আর বুঝে করে—ব্যাধিতে করায়। ওদেরও সেইরকম। আমি ভাবতাম—বেঁচে তো থাক, বেঁচে থাকলে তবে আস্তে আস্তে correction (সংশোধন) হবে, পথ খোলা থাকবে—যদি সাবাড়ই হ'য়ে যায়, তাহ'লে তো কোন আশাই থাকে না।

তপোবনের শৈলমাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, কী খবর?

শৈলমা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল বড় এক ড্যাগ ভাত নামাতে পারিস?

শৈলমা—তা' বোধ হয় পারি, তবে কষ্ট হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর ঐ বুড়ো হাড়ে যা' পারিস, অনেক চ্যাংড়াও তা' পারে না।

শৈলমা—সে আপনার দয়া (ব'লে হাসতে লাগলেন)।

শৈলমার বিমর্ষ মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

এরপর দেবদেবী-সম্বন্ধে কথা উঠলো—শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বলছিলেন—আমি যখন ব'সে-ব'সে নাম করতাম, কেষ্টঠাকুর এসে বাঁশী বাজাতেন—একেবারে কান enchantingly (মোহন ভঙ্গীতে) ঝালাপালা ক'রে দিতেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখতাম আমার বয়সী, তবে রং কিন্তু কালো নয়—দূর্ব্বা যদি কিছু দিয়ে ঢেকে রাখা যায়, কিছুদিন পরে তার যেমন রং হয়, অনেকটা সেইরকম। মা-কালীকে অনেকবার দেখেছি, দেখামাত্র মনে হ'তো যে আমার মা। আমার মা'র সঙ্গে কোন পার্থক্য মনে হ'তো না—তাই বোধহয় মা'র উপর অত টান বেড়ে গিয়েছিল।

একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম—গিয়ে খুব পিপাসা পেয়েছিল। একজন অনেককে জল দিল, আমাকে দিল না—আমার বড় রাগ ও দুঃখ হ'লো। রামকৃষ্ণদেবের ঘরের দিকটায় গেলাম—গিয়ে যেন খুব পরিচিত মনে হ'লো। অবশ্য ও-কিছু নয়, আগে শোনার দরুনও হ'তে পারে, তারপর আমি পঞ্চবটী-তলায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম—দেখলাম, মা-কালী আসছেন। কালো তবু অত্যন্ত soothing (স্নিগ্ধ) রূপ, কাছে এসে আমার মাথাটা তুলে নিজের হাঁটুর উপর রাখলেন—তাঁর স্পর্শে আমি কেমন হ'য়ে গেলাম—তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে পারলাম না—যা' বলেন তাই করি। আদর ক'রে বললেন—তুই সবার সামনে খেতে চাইলে আমি কি তা' দিতে পারি? লক্ষ্মী, এইগুলি খা। দেখি, সোনার মতো উজ্জ্বল থালায় লুচি, বরফীর মতো সন্দেশ ইত্যাদি—খাইয়ে দিলেন। খেলাম, খেয়ে বড় তৃপ্তি পেলাম। জল-টল যখন খাওয়া হয়েছে, তখন কে এসে আমাকে ডাকল, ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি, ক্ষিদে-তেষ্টা নেই। রাত দশটা পর্য্যন্ত কত হাঁটলাম তবু ক্ষিদে পেল না—শুনেছিলাম, এ-সব কথা কাউকে বলতে নেই, তাই কাউকে তখন বলিনি।

কথা চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কথার ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে তামাক, সুপুরি, জল চেয়ে খাচ্ছেন। আরো লোক এসে জড় হয়েছে—সবাই সেই আনন্দমধুর-বচন-সুধাপানে বিভোর।

ইতিমধ্যে সুশীলদা আসলেন। জাতিস্মর-সম্পর্কে তিনি বললেন—জাতিস্মরত্ব যদি জাগেও, তাহ'লেও তো দুঃখ! অনেক ক্ষেত্রে পরজীবনে মিলিত হবার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে—শান্তি মেয়েটির পূর্ব্বজীবনের স্বামী হ'লো ব্রাহ্মণ আর শান্তি হয়েছে কায়স্থ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুবিধা হয় সমাজ-ব্যবস্থার দরুন; তা' না হ'লে অসুবিধা হবার তো কথা নয়। যে ক'টা মেয়ের কথা জানা গেছে, প্রায়ক্ষেত্রেই তো অনুলোম হয়—আর নিম্নবর্ণ কিংবা স্ববর্ণ না হ'য়ে যদি মেয়ে উচ্চবর্ণে জাত হয় এবং তার যদি স্বামীর স্মৃতি জ্বলজ্বলে থাকে তার বিয়ে করাই উচিত নয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে গেলেন। স্নানের আগে হরিপদদা বেশ ক'রে তেল মাখিয়ে দিলেন। চৌবাচ্চায় নেমে স্নান করতে-করতে বললেন—সুশীলদা! জাতিস্মরতার secret (রহস্য)-টা বের ক'রে সকলকে জানিয়ে দিন—বলুন, পেয়েছি অমৃত, লভিয়াছি পথ। আমি নিজে অনেক দেখেছি—কেষ্ট ঠাকুর-টাকুর ইত্যাদি, কিছুতে আমি সন্তুষ্ট হ'য়ে যাইনি—এই যেমন আমি আছি, আমাকে একজন দেখছে—আর একজন দেখছে না, এমনটা হ'চ্ছে না—অর্থাৎ সবাই দেখছে—আমি যেমন ইচ্ছে করছি, তারা যে তাই করছে তা'ও নয়—যে-কোন ব্যাপার এইরকম সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ও বাস্তব না হ'লে আমার তৃপ্তি আসে না। সেটা কা'রও ব্যক্তিগত সাধনলব্ধ

শক্তির উপর নির্ভর করবে না—তা' হবে একটা normal phenomenon (স্বাভাবিক ব্যাপার); আর, এই যে জাতিস্মররা জন্মেছে, এরা খুব সাধারণ ঘরেই জন্মেছে—এর জন্য যে খুব সাধনার দরকার হয় তা'ও মনে হয় না—কি-একটা কারণ আছে সেটা আবিষ্কার করতে পারলেই ঘরে-ঘরে, জনে-জনে এটা সম্ভব।

গোপালদা—সুশীলদা বলছিলেন, একজনের জাতিস্মরত্ব ছিল না, অসুখের পর জাতিস্মরত্ব জেগে উঠলো—এও তো ভারী মজা! তাহ'লে electricity (তড়িৎ) কিংবা অন্য কোন stimulus or shock (ধাক্কা) দিয়ে brain-এর (মস্তিষ্কের) নূতনতর arrangement ও adjustment (সমাবেশ ও নিয়ন্ত্রণ) ক'রে যা' latent (সুপ্ত) ছিল তাকে তো potent (সক্রিয়) করা যায়—তেমন হ'লে তো জাতিস্মরত্ব আমরা এ জীবনে লাভ করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লাসের সঙ্গে বললেন—অসম্ভব কিছু না। যেমন ক'রে পার, কাজ হাসিল হ'লে হয়।

২৭শে আশ্বিন, ১৩৫৬, শনিবার (ইং ১৪।১০।১৯৩৯)

সূর্য্য ডুবে গেছে পদ্মাপারের আকাশের বুকে—শরতের সন্ধ্যা তার স্নিগ্ধ ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে আশ্রমের আঙ্গিনায়—শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের ধারে তাঁবুতে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছেন—এমন সময় কণামার জন্য হরেনদা (ভদ্র) রান্নার সমস্ত সরঞ্জাম কিনে এনেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর কা'কে দিয়ে কণামাকে ডাকতে পাঠাবেন ভাবছেন—তিনি সর্ব্বসমক্ষে দান গ্রহণ করতে লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করবেন, তা' বুঝতে পারছেন। তিনি যা'তে লজ্জার মধ্যে না পড়েন, শ্রীশ্রীঠাকুর সেজন্য চিন্তা করছেন। শেষটা যজ্ঞেশ্বরকে (ঝা) দিয়ে ডাকতে পাঠালেন।

রাত্রে আবার বীরেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) অনুরোধ জানাচ্ছেন—বীরেনদা! আপনি কণার ওষুধপত্র ও পথ্যাপথ্যের ভার নেবেন? রোজ এক সের ক'রে দুধ খাওয়াবেন। (হাত দিয়ে দেখিয়ে) এইয়্যা মোটাসোটা ক'রে দেওয়া চাই। পারবেন না বীরেনদা?

বীরেনদা বললেন—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের রাজভিখারী। বিশ্বের কল্যাণের জন্য তিনি ভিক্ষা ক'রে বেড়ান। যাদের জন্য ভিক্ষা করেন শুধু তাদের উপকারই তাঁর লক্ষ্য নয়, যাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করেন—ভিক্ষা গ্রহণ ক'রেই তাদেরও মঙ্গলসাধন করেন। তাঁর খুঁটিনাটি কাজ পর্য্যন্ত সর্ব্বজনের সর্ব্বতোমুখী কল্যাণের আমন্ত্রক। আমরা একটা দিক সামাল দিতে গিয়ে দশটা দিক বেঠিক ক'রে ফেলি—আমাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, সবটা দিক আমাদের দৃষ্টির সামনে ফুটে ওঠে না। তাই স-ইষ্ট-পারিপার্শ্বিক সমগ্র জীবন

সুবিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে না, শত চেষ্টার তরতরানি নিরর্থক হ'য়ে দাঁড়ায়—কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা, কল্পনা, আহার, নিদ্রা, শোয়া, বসা, দাঁড়ান, চলা, কথা, চাউনি, হাসি, মস্করা, ভাবভঙ্গী—যাবতীয় যা'-কিছুই নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানমুখর—তাই তা' সার্থক ও অব্যর্থ।

২৮শে আশ্বিন, ১৩৪৬, রবিবার (ইং ১৫।১০।১৯৩৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বাঁধের পাশে তাঁবুতে এসে বসেছেন। কলকাতা থেকে কয়েকটি ভাই এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন পারিপার্শ্বিকের সহানুভূতিহীনতা-সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যে কী করল না-করল, তুই তা' দেখতে যাবি কেন? তুই ভাববি, তুই কী করেছিস না-করেছিস। তোর এতটুকু অসুবিধায় যদি লাখ মানুষের মাথার টনক ন'ড়ে না যায় তবে তুই একটা কেমন মানুষ? তুই যদি মানুষের তেমনতর নিত্য-প্রয়োজনীয় হ'য়ে দাঁড়াতে পারিস—মানুষ বাপ-বাপ ব'লে আপন দায়ে তোর জন্য ছুটে আসবে। তুই এতটুকু স'রে দাঁড়ালে—অসমর্থ হ'লে লাখ মানুষের পেটের ভাতে টান পড়বে, চোখ থেকে রাত্রির ঘুম চ'লে যাবে। ততখানি না ক'রে পারিপার্শ্বিকের সেবা দাবী করা তো সমীচীন নয়। পারিপার্শ্বিক তোর সেবা না ক'রে পারে এমন অবস্থায় পারিপার্শ্বিককে রাখিস কেন? সেবার সাহায্যে তুই হ'য়ে উঠবি লাখ লোকের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, বিলাসের সামগ্রী, ভালবাসার চেতনা।

প্রফুল্ল—অনেক মানুষ এতই self-sufficient (স্বয়ংসম্পূর্ণ), তাদের অর্থ-সামর্থ্য এতই আছে যে তারা হয়তো অন্যের সেবার ধার ধারে না—তাদের কাছে এগোনই তো মুশকিল হ'য়ে দাঁড়ায়, তাদের সম্বন্ধে কী করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যদি তার বাড়ীর পাশে দশহাত প্রাচীর দেয়—তোর সেবা-বুদ্ধি এতখানি keen (তীব্র) হওয়া চাই, যা'তে তুই ও-সব ডিঙ্গিয়ে molecular form-এ (অণুরূপে) তার কাছে গিয়ে পড়তে পারিস! অন্য কে কী করল—দেখবি না, নিজের দিকে চাইবি। আর জানবি, যত সব বাণী, নিয়ম-কানুন—তা' অন্যের জন্য নয়, তোর নিজেরই জন্য, তাই নিজেকে আগে ঠিক করবি।

একটি ভাই নিজে চুরি না-করা সত্ত্বেও অবস্থার চাপে প'ড়ে রেহাই পাবার জন্য বলেছিল যে সে চুরি করেছে—সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—তুই চুরি করিসনি, অথচ সবার ভয়ে স্বীকার করলি যে, চুরি করেছিস—এটা ভাল নয়; এর থেকে অনেক সময় principle betray (আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা) করবার tendency (প্রবণতা) আসে। তবে যদি দেখিস, তোর একটা কাজের জন্য আর

একজনের উপকার হয়, তখন করতে পারিস—তুই সইতে পারিস, আর একজন সইতে পারে না, তেমন অবস্থায় তা' করা চলে।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—Animal life-এও (পশুজীবনেও) আমরা দেখতে পাই, female (মেয়ে) male (পুরুষ)-কে woo (আমন্ত্রণ) করে—এমনি হয়তো male (পুরুষ) indifferent (উদাসীন), কিন্তু female (মেয়েছেলে) যেই গরম হ'লো male (পুরুষ) অমনি পাগল হ'য়ে ওঠে। মানুষের বেলায় female (মেয়ে) woo (আমন্ত্রণ) না করতেই যদি male sexually engaged (পুরুষ যৌনসম্পর্কে লিপ্ত) হ'তে চায়, female (মেয়েছেলে) তা' পছন্দ করে না, অন্তরে-অন্তরে repel (প্রত্যাখ্যান) করে, তেমন পুরুষকে অশ্রদ্ধা করে, ভাবে—'ওইজন্যই তুমি আমার পাছে-পাছে ঘোরো'। এতে পুরুষ ও নারী উভয়েই mentally ও physically deteriorate (শারীরিক ও মানসিক অধোগমন) করে, সন্তানাদিও vitally weak (প্রাণ-সম্পদে দুর্ব্বল) হয়—আর, এমনতর সঙ্গমের ফলে প্রায়ই ছেলে না-হয়ে মেয়ে হয়—অবশ্য এটা আমার মত। Male must be worshipped from the side of the female (পুরুষ মেয়েদের দ্বারা পূজিত হওয়া চাই-ই)।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা-সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—শ্রেষ্ঠপ্রাণতা না থাকলে research (গবেষণা) হয় না। Research (গবেষণা) করতে গেলে বিশেষ কতকগুলি চারিত্রিক গুণের প্রয়োজন হয়। শ্রেষ্ঠপ্রাণতার ভিতর দিয়ে সেগুলির উদ্ভব হয়। আবার একটা জায়গায় যথাযথভাবে research (গবেষণা) ও তৎ-সম্বন্ধীয় যাজন হ'তে লাগলে সেই research spirit (গবেষণার মনোভাব) দেশে চারিয়ে যায়—আর, research-এর (গবেষণার) ফলে যে fine delicate instrument (সূক্ষ্ম যন্ত্র) বের হয়, তা' use (ব্যবহার) করতে করতেও মানুষের উন্নতি হয়—একটা মানুষ যদি দশ বছর ধ'রে microscope use (মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার) করে, তার চোখের sensitiveness (শক্তি)-ও keen (তীব্র) হয়।

২৯শে আশ্বিন, ১৩৪৬, সোমবার (ইং ১৬। ১০। ১৯৩৯)

পারিপার্শ্বিকের সেবার অজুহাতে আমরা যে অনেক সময় বাবা, মা বা গুরুজন ও পরিবারের প্রতি করণীয়ে ত্রুটি করি, সে-সম্পর্কে আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—পরিবারের কিংবা most immediate environment (নিকটতম পরিবেশ)—যেখান থেকে মানুষের অন্নসংস্থান হয়, তাদের সেবা না ক'রে বাইরের সেবা করতে গেলে, সে-সেবা নিরর্থক হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রথমতঃ সেখানকার সেবা করা দরকার—অবশ্য তা' তখনই ignore (উপেক্ষা) করা যায় যখন কিনা ইষ্টের কাজ

ক'রে আর সময় পাওয়া যায় না। সময়-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইষ্টের কাজের অজুহাতে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

এরপর ভূপেশদা (দত্ত) একটা মোটরের ক্যাটালগ দেখাতে নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চশমা চোখে দিয়ে পাতা উল্টিয়ে দেখতে-দেখতে বললেন—আমার মাথায়ও অনেক সুন্দর-সুন্দর মডেল আসে, বলিই বা কা'কে, আর করেই বা কে?

৩০শে আশ্বিন, ১৩৪৬, মঙ্গলবার (ইং ১৭।১০।১৯৩৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বাঁধের ধারে খড়ের ঘরে চৌকিতে বসেছিলেন—Students' organisation (ছাত্র-সংগঠন) কেমন হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে জনৈক দাদা জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ করতে-করতে যখন যে-প্রয়োজন দেখা দেয় তার সমাধান করা ভাল—এতে জবর জিনিস হয়।

হিটলার-মুসোলিনীর কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু না থাকলে মানুষের balance (সমতা) ঠিক থাকে না। শিবাজী রাজা হ'য়েও রামদাসকে রাজ্য দিয়ে নিজে প্রতিনিধি হিসাবে রাজত্ব চালাতো। রামদাসকে সে জুজুর মতো ভয় করতো। এ ভয়টা কিন্তু ভালবাসার অমোঘ টানে। অতো বিপদের মধ্যে প'ড়েও তাই সে ঠিক ছিল—তার গায়ে একটা আঁচড় লাগেনি। মুসোলিনী ইচ্ছা করলে রাজাকে অস্বীকার করতে পারে কিন্তু তা' সে করে না।

হিটলারের কথায় বললেন—শুধু মাতৃভক্তিতে সব হয় না—fulfilling (পরিপূরক) একজন থাকা দরকার হয়। হোক না একটা মানুষ সামান্য নগণ্য, কিন্তু ইষ্টে তার টান যদি থাকে সে বড় হবেই। আজ একটা মানুষকে দেখছ মিটমিট ক'রে তাকাচ্ছে, পরশু যে সে কত বড় হ'য়ে উঠবে তা' কি তুমি বলতে পার? মূল সম্বলটুকু থাকলে তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী—ঐ অনুরাগই তাকে যোগ্যতায় দিগ্বিজয়ী ক'রে তোলে।

কথাপ্রসঙ্গে শম্বুকের কথা উঠলো—শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শম্বুক বর্ণাশ্রম ভেঙ্গে দিচ্ছিল, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল। ব্রাহ্মণত্ব আমাদের প্রত্যেকের আদর্শ বটে, তা' কিন্তু আমাদের বর্ণোচিত কর্ত্তব্যকে অবহেলা ক'রে নয়। Instinct (সহজাত সংস্কার)-মাফিক কাজ ক'রে তার ভিতর-দিয়ে ব্রাহ্মণত্ব evolve (উদ্ভিন্ন) করাতে হয়। আমাদের জনক ক্ষত্রিয়ের কাজ ছেড়ে দেননি। একজন যদি বৈশ্য হয়, বৈশ্যের সহজাত কাজ ignore (উপেক্ষা) ক'রে সে ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করতে পারে না। আর, তাই যদি করতে যায়, সমাজে ভাঙ্গন সুরু হয়। যে-বৈশ্য বৈশ্যের কাজই করতে জানে না—সে আবার ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হবে কেমন ক'রে? যে যা' করুক তার

hereditary instinct (জন্মগত সংস্কার)-এর উপর দাঁড়িয়ে করবে—তবেই সমাজ ঠিক থাকে। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের মাঝে যে প্রতিঋত্বিক্ করা হচ্ছে—তারাও কাজ করবে ঠিক ঐ-ভাবে। আর্য্যরা acquisition-এর (অর্জ্জিতবিদ্যার) চাইতে instinct (সহজাত সংস্কার)-কে প্রাধান্য দেয়। Instinct (সংস্কার) হ'লো automatic (স্বতঃ)—যেমন আমাদের heart (হার্ট) আজকাল স্বতঃই চলে, এক সময় হয়তো এমনভাবে চলতো না, তখন হয়তো চেষ্টা ক'রে চালাতে হয়েছে, আজকাল attention (মনোযোগ) দিই আর না-দিই, heart (হার্ট) চলেই; এইরকম automatic (স্বতঃ) যে গুণ তাই instinct (সংস্কার)। পুরুষ-পুরুষানুক্রমিক ধ'রে চলতে-চলতে একটা জিনিস instinct (সংস্কার)-এ পর্য্যবসিত হয়। উজীরপুরের কামাররা এখনও নাকি হাতে যে temper (পোলাদ) দেয় তার তুলনা নেই—তারা নাকি পিস্তলও তৈরী করতে পারে। Instinct (সহজাত সংস্কার) হাজার বছরেও মরে না। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যই দ্বিজ, আর আর্য্যকৃষ্টিতে initiated aborigines-রা (দীক্ষিত অনার্য্যরা) শূদ্র। তারা হাতে-কলমে কাজ করতো—practice (অনুশীলন) বাদ দিয়ে তাদের theoretical training (তাত্ত্বিক শিক্ষা) দেওয়া হ'তো না। মাথা তো পাকা নয়, কী বুঝতে কী বুঝবে,গণ্ডগোল ক'রে ফেলবে, তার তো ঠিক নেই। তাই এই ব্যবস্থা। ...... ইষ্ট ও কৃষ্টির ভিত্তির উপর আজই যদি আমরা গুচ্ছ বেঁধে উঠতে পারি—কী যে ক'রে ফেলতে পারি তার ঠিক নেই। আমাদের রক্তে সব-কিছু র'য়ে গিয়েছে—চাই তার উপযুক্ত পোষণ। অনুলোম অসবর্ণ বিয়ে ও একাদর্শ গ্রহণ—এই দুটো হ'লো সমাজের cementing factor (সংহতির উপাদান)। আবার তা' জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাদের কী যে ভুল—একজনকে নিন্দে ক'রে আর-একজনকে প্রতিষ্ঠা করতে যাই, তাই জাতটা হ'য়ে গেছে disintegrated into lumps (টুকরো-টুকরো বিচ্ছিন্ন)। পূর্ব্বতন-পরিপূরণী বর্ত্তমানকে কেন্দ্র ক'রে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির উপর দাঁড়াতে হবে। নিজেরা করবে, অন্যকেও করাবে—এই যজন-যাজন দিয়ে যে কী ক'রে ফেলা যায়! এক হাজার ঋত্বিক্ যদি আজ বাংলার পল্লীতে-পল্লীতে যাজনে ব্রতী হয়—তারপর এক-একদল এক-এক province-এ (প্রদেশে) যদি বেরিয়ে যায়, জাতটা গ'ড়ে তুলতে কতদিন লাগে?

আমাদের দীপঙ্কর—এই তো বজ্রযোগিনী বাড়ী, বাঙ্গাল, যাজনের সাহায্যে তিনি কী ক'রে ফেললেন? বাঙ্গালী জাতির মধ্যে খাঁটি Aryans (আর্য্য) আছে, অন্যদিকে যখন অত্যাচার আরম্ভ হয়েছিল তখন তাদের অনেকে এদিকে এসে পড়েছিল। এদের রক্ত, এদের জান যে-সে ব্যাপার নয়। আমরা তো জানিই না আমাদের নিজেদের কী ছিল—কেষ্টদা যে-সব তথ্য যোগাড় করেছেন, তা' শুনলে তো অবাক হ'তে হয়। একগাট্টা হ'য়ে উঠলে এ-জাতের সঙ্গে পারা মুশকিল।

চন্দননগরের কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী করতে হবে তা' তো ঠিকই আছে। এখন—"মারি অরি পারি যে কৌশলে"।

প্রফুল্ল—ঠিক আছে বলতে তো আপনি ইষ্টস্বার্থ এবং ইষ্টপ্রতিষ্ঠার কথা বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ওই হ'লো ভবসাগরের compass (দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র)। কী করণীয়, ঐ দিয়েই মেপে-মেপে ঠিক করতে হবে—ও ছাড়া আর কথা নেই—একটা যেন North Pole (উত্তর মেরু) আর একটা যেন South Pole (দক্ষিণ মেরু)। শুধু ইষ্টস্বার্থ দেখলেই হবে না। তুমি হয়তো দশ লাখ টাকা চুরি ক'রে ইষ্টস্বার্থ সিদ্ধ করতে পার, কিন্তু তা'তে লোক বলবে যে অমুক চোরের গুরু—তাতে ইষ্টস্বার্থ সাধন হ'তে পারে, কিন্তু ইষ্টপ্রতিষ্ঠা হবে না—এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এমনকি আপাতদৃষ্টিতে কোন গর্হিত কর্ম্ম ক'রেও যদি ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা দুই-ই অক্ষুণ্ণ থাকে তাহ'লে তাতেও মঙ্গলের অধিকারী হওয়া যেতে পারে। পাপ হ'ল তাই যা' নাকি পালন থেকে পতিত করে—এ-ছাড়া পাপের আর কোন মানে নেই। তারপর বললেন—কেষ্টদা যদি ঠিক করে যে পাঁচশ' লোককে কিছুতেই পড়তে দেবে না—তাদের উন্নতির জন্য যদি আপ্রাণ চেষ্টা করে, সর্ব্বভাবে সেবা করে, আর এই পাঁচশ' লোক যদি কেষ্টদার জন্য একটা ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে, তাতেই কেষ্টদার ডোল ভ'রে যায়, তার নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে আরো কতজনকে পালন করতে পারে।

প্রফুল্ল—চতুরাশ্রমের মধ্য-দিয়ে যে normal (সহজ) সন্ন্যাস, তা' ছাড়া কি সন্ন্যাস-গ্রহণ ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধু সে-ই যে কিনা সব নিষ্পন্ন করতে পারে—সাধু কথাটা এসেছে সাধ্‌-ধাতু থেকে। Responsibility (দায়িত্ব) যে নেয় না, কর্ত্তব্য যে করে না, সে আবার কিসের সাধু। সৎ-এ যার মন ন্যস্ত হয়, তার তো কর্ম্ম ও দায়িত্ব বেড়েই যায়। আমার মনে হয়, মানুষ চতুরাশ্রমের ভিতর-দিয়ে না গেলে তার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর গোপালদাকে (মুখোপাধ্যায়) ডাকতে বললেন। গোপালদা আসলে তাঁর কাছে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কাজের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বলছিলেন—আর্য্যদের কী রূপ তা' তো আমাদের চোখে পড়ে না, তাই বুঝি না। সে-রূপ যদি আবার ফুটে ওঠে—তবেই বুঝব তাদের মর্য্যাদা। বর্ণোচিত সমীচীন গুণ বিকাশ হয়েছে, এমনতর বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আজকাল কমই দেখতে পাওয়া যায়। বৈশ্যরা যদি ঠিক থাকতো তাহ'লে কি আমাদের এই দুর্দ্দশা হয়? বৈশ্যরা যখন ইষ্ট ও কৃষ্টিকে ভুলে গিয়ে বিদেশী শ্বশুরদের সঙ্গে যোগ দিল—তখন থেকেই জাতির সর্ব্বনাশ শুরু হ'ল। বৈশ্যেরা বহির্দ্দেশে বাণিজ্য করত, সেই সব দেশ থেকে মেয়ে বিয়ে ক'রে আনত, তাদের সন্তান-সন্ততি আবার বিপ্র, ক্ষত্রিয়

ও বৈশ্যেরা বিয়ে করত। যতদিন বৈশ্যেরা ইষ্টকৃষ্টি-অনুগ চলনায় চলেছিল—ততদিন কোন অসুবিধা হয়নি, কিন্তু ধনমদ-মত্ততায় যখন তা' বিসর্জ্জন দিল তখন থেকেই বিপর্য্যয় আরম্ভ হ'ল।

কেষ্টদাকে দুইজন mechanic (কারিগর) খুঁজতে বললেন, যারা ঢালাই, লেদ ইত্যাদি সব কাজ জানে। শ্রীশ্রীঠাকুর আক্ষেপ করতে লাগলেন—আমার এখানে লোকেরই অভাব, যথাস্থানে উপযুক্ত লোক পেলে কী ক'রে ফেলতে পারতাম। লোক-অভাবে laboratory-র (গবেষণাগারের) instrument-গুলি (যন্ত্রপাতিগুলি) নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। কারখানায় উপযুক্ত লোক পেলে হাজার লোকের পেটের ভাতের ব্যবস্থা হ'তে পারে। আর, এমন লোক চাই যে মাইনে নেবে না, কিন্তু সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিয়ে সব worker (কর্ম্মী)-দের maintain (ভরণ-পোষণ) করবে এবং নিজের minimum (ন্যূনতম) যা' দরকার তাই নিয়েই খুশি থাকবে। এখানে আসলে বাইরের কেউ হয়তো মাইনের লোভ দেখিয়ে তাকে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করবে, সে যেন তা'তে না ভোলে। Institution (প্রতিষ্ঠান) গ'ড়ে তোলা মুখ্য না হ'য়ে টাকা মুখ্য হ'লে যত বড় expert-ই (দক্ষই) হোক, successful (কৃতকার্য্য) হওয়া দুরূহ। তারপর cool temperament (ঠাণ্ডা মাথা) হওয়া চাই, এখানে নানা প্রকৃতির লোক আছে, অনেকে হয়তো তাকে অতিষ্ঠ করবে, তবু টিকে থাকার মতো শক্তি চাই, নচেৎ মুশকিল।

১লা কার্ত্তিক, ১৩৪৬, বুধবার (ইং ১৮।১০।১৯৩৯)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বাঁধের ধারে চৌকিতে। অনেকে উপস্থিত আছেন। সত্যদা (দে) অসুখ থেকে উঠেছেন, ভাতের ওপর দুর্নিবার টান হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমার খুব ক্ষিদে হয়েছে, যা' পথ্য ব্যবস্থা করেছেন, তা' খাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝলেন সত্যদা প্রকারান্তরে ভাত খাবার অনুমতিই চাইছেন, অথচ তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে হবে। উৎসাহ দিয়ে বলতে লাগলেন—ক্ষিদেই তো রাজা। ক্ষিদেই তো লক্ষ্মী, খাওয়ার চাইতে ক্ষিদে ভাল—ক্ষিদেই তো খায়, খিদে হ'তে থাক্, যখন দেখবি—মুখে গন্ধ নেই, তখন তোর ভাত খাবার সময় এসেছে বুঝবি।

সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোক নানা প্রশ্ন করছিলেন—আমরা যত যা' করি না কেন, luck (ভাগ্য)-এর উপর সব নির্ভর করে। একজন কত খেটেও কিছু করতে পারে না. আবার কেউ হয়তো অল্প চেষ্টাতেই successful (কৃতকার্য্য) হ'য়ে দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Luck (ভাগ্য) কিন্তু করার উপর নির্ভর করে। যে পারে না, বুঝতে হবে তার করাতেই গণ্ডগোল আছে। অদৃষ্ট মানে, আমার যে-কর্ম্মের ফল পারিপার্শ্বিকে

চারিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে আছে। Principle (আদর্শ) না থাকলে করাগুলির মধ্যে বিন্যাস আসে না, শৃঙ্খলা ফুটে ওঠে না, individuality (ব্যক্তিত্ব)-ই grow করে (বাড়ে) না, personality (ব্যক্তিত্ব) integrated (সংহত) হয় না, বৃত্তিই তাকে guide (চালিত) করে। বৃত্তিগুলি গোল—তাই ওদের বৃত্তি বলে, মানুষ বৃত্তির বাইরে আর কিছুই দেখতে পায় না। ওই-ই হয় তাঁর universe (বিশ্ব), এর একটার সঙ্গে আর-একটার কোন যোগ নেই। যখন যেটার মধ্যে যায় তার মধ্যেই ঢুকে প'ড়ে থাকে। কতজনেই তো কত খাটে, কিন্তু একটা চাষার ছেলে দেখতে-দেখতে হয়তো minister (মন্ত্রী) হ'য়ে গেল—তা' হয় কি ক'রে? ওই টান। টানই সব। পৃথিবীতে এমন মানুষ দেখতে পাবেন না, ঠিক এ-কথা বলতে পারি না, যা'-হোক, খুব কম মানুষই দেখতে পাবেন—যারা প্রকৃত বড় হয়েছে অথচ কোন superior beloved (প্রেষ্ঠ)-এর উপর active attachment (সক্রিয় অনুরাগ) নেই। আমরা history (ইতিহাস) পড়ি, কিন্তু একটা life (জীবন)-এর glowing point (দীপন-কেন্দ্র) আমাদের চোখে পড়ে না—তাহ'লে দেখতে পেতাম যে, শ্রেয়ে অনুরাগ ছাড়া কেউ প্রকৃত বড় হয়নি।

ভদ্রলোক—আমি একজনের উপর depend (নির্ভর) করতে যাব কেন? আমি নিজেই তো পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের existence (অস্তিত্ব) যে depend (নির্ভর) করে অন্যের উপর। আমি কিছুদিন 'সোঽহং সোঽহং' করতাম—ওটা যেন মানুষের ধাতে খাপ খায় না, ওতে সব-কিছু নিজের উপর recoil (প্রত্যাবর্ত্তন) করে। আমি 'সোঽহং' তখনই বলতে পারি—যখন আর সবাইকে সেই সোঽহং-এর রূপে দেখতে পারি—তা' না হ'লে আমি 'সোঽহং' আর ও-শালারা কিছু না—এমন বোধ থাকলে উন্নতি হয় না। আমি বুঝি 'তুহং'—তুমি ব'লে একজন যদি থাকে তাকে fulfil (পূরণ) করার urge (আকূতি)-এর দরুন tension (টান) যদি থাকে, তা' থেকেই আমাদের sensitiveness (সাড়াপ্রবণতা) ও receptivity (গ্রহণক্ষমতা) grow করে (বাড়ে), তার ফলেই আমরা বড় হ'তে পারি—নচেৎ সব-কিছু নিজেদের উপর recoil (প্রত্যাবর্ত্তন) করে। মোট কথা, মানুষের মধ্যে আছে libido বা সুরত। আমি ইংরাজী জানিনে, মুখ্যু মানুষ, তবু আবার ইংরাজী কই—এই সুরত চায় যুক্ত হ'তে, এই সুরত মা, বাবা, গুরু ইত্যাদিতে ঠিকভাবে যুক্ত হবার ফলে যে-মানুষ active (কর্ম্মঠ) হ'য়ে ওঠে, তার উন্নতি হবেই। গীতায় আছে—"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য, নচাযুক্তস্য ভাবনা, নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।" আরো কী আছে তো?—"যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্।" তাই না? এই হ'লো কথা। আবার ঠাকুর কথার মানে—তিনি ঠক্কুর অর্থাৎ ঠক্কর দেন। আমাদের বৃত্তির সঙ্গে আর তাঁর সঙ্গে conflict (সংঘাত) বাধে; এই conflict (সংঘাত)-এর ফলে আসে adjustment (নিয়ন্ত্রণ)।

ভদ্রলোক—হিটলার-মুসোলিনীর মাতৃভক্তি তো বুঝি, কিন্তু গুরুভক্তি তো দেখি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমনভাবে মাতৃভক্ত হ'লে তারই ঠেলা সামলান দায়—তারপর তো গুরুভক্তি। গুরুর প্রয়োজন এইজন্য যে তিনি সব stage-এই (স্তরেই) guide (পরিচালিত) করতে পারেন, যা' অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়,—আর তাঁকে ভালবেসে, অনুসরণ ক'রে আমরা দিন-দিন বড় হই। গুরুভক্তি বা মাতৃভক্তি থাকলে আপনা থেকেই motor-sensory co-ordination (কর্ম্ম ও বোধস্নায়ুর সঙ্গতি) আসে। এই আদিত্যকে (মুখোপাধ্যায়) দেখলে হয়!

শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে ভদ্রলোক বলছিলেন—তাঁকে বড় জোর superman (অতিমানব) বলতে পারি, ভগবান বলতে পারি না, হাজার হ'লেও তিনি মানুষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিন্তু ভগবান বলতে মানুষ বাদ দিয়ে কিছু বুঝি না—তেমন ভগবান যদি থাকেনও তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? তিনি আমাকে একটা তিলের নাড়ু পর্য্যন্ত জুটিয়ে দেন না। ভগবান বলতে বুঝি সেই মানুষ, যাঁর ভিতর ষড়ৈশ্বর্য্য জাগ্রত। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে তাঁর কবিত্ব বুঝি না—আগে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কথা, তারপর তাঁর কবিত্ব। দয়া বলতে দয়াবান লোকের কথাই মনে পড়ে—দয়াবান ছাড়া দয়া থাকে কোথায়? তা' বোধ করি কেমন ক'রে?

পূজোর ছুটি হ'য়ে গেছে। আজ ষষ্ঠী। বহু লোকজন বাইরে থেকে এসেছেন—আসছেন। সুধামা'র উপর আনন্দবাজারের ভার, তার শরীর অসুস্থ। শ্রীশ্রীঠাকুরের কত চিন্তা, একবার অমর-ভাইকে (ঘোষ), একবার ভূষণদাকে (চক্রবর্ত্তী), একবার গোপালদাকে (মুখোপাধ্যায়), একবার এক দাসদাকে খোঁজ নিতে বলছেন, আবার টাকা যোগাড়ের চেষ্টা করছেন।

ভূষণদা এসে বললেন—তরকারীতে কম পড়বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অস্থির হ'য়ে উঠলেন, বলতে লাগলেন--তাহ'লে কত রাত্রে খেতে দিবি! কতজন গাড়ীতে এসেছে, সারাদিন কিছু খায়নি!

এত ব্যাপারের মধ্যে আবার প্যারীদাকে ডেকে বলছেন—প্যারী! বড়বৌকে (শ্রীশ্রীবড়মা) একটা বেড-পিল দিও কিন্তু।

২রা কার্ত্তিক, ১৩৪৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১৯। ১০। ১৯৩৯)

সকালে পাবনা আশ্রমের বাঁধের ধারে খড়ের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে একঘর লোক ব'সে আছেন।

চন্দননগরের কেষ্টদা বললেন—কেউ মারা গেলে অশৌচের ব্যবস্থা কেন? বিভিন্ন বর্ণের অশৌচ-পালনের পার্থক্যের কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ মৃত্যুর পর প্রিয়জন খুব depressed (অবসন্ন) হ'য়ে পড়ে—সেইজন্যই অশৌচ। মনটা recover (সুস্থ) করতে যে-বর্ণের যেমন সময় নেয়—সেই বর্ণের অশৌচকাল সেইভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে।

কেষ্টদা—মাথা নেড়া করে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুণ্ডনের একটা physiological effect (শারীরিক ক্রিয়া) আছে। হয়তো ultra-violet rays (অতিবেগুনী রশ্মি) ইত্যাদি brain absorb করতে (মস্তিষ্ক শুষে নিতে) পারে।

কেষ্টদা—প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রায়শ্চিত্ত একটা physio-psychical treatment (শারীর-মানস চিকিৎসা) বিশেষ, কতকগুলি জিনিস খেতে হয়, তার medicinal effect (ভেষজ ক্রিয়া) আছে, যে-সব nerve impaired (স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত) হয়—তা' invigorate (সতেজ) করে, আর ওর আদত কথা হ'লো চিত্তশুদ্ধি।

জনৈক দাদা—মুণ্ডন মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুণ্ডন মানে আত্ম-সমর্পণ। মুণ্ডন মানে মুণ্ডন of the being (সত্তার)। কথায়-কথায় বলতে লাগলেন—আমরা রাশিয়া-জাপানের কথা শুনে অবাক হ'য়ে যাই, কিন্তু একদিন অন্য দেশ আমাদের কথা শুনে অবাক হ'য়ে যেত। ব্রাহ্মণেরা গবেষণা করতেন, মাসের পর মাস তখনকার-মতো নতুন-নতুন model of machine (রকমের যন্ত্র) বের হ'তো, laboratory-তে (গবেষণাগারে) তাঁরা কত-কী বের করতেন। তাঁদের কাজ ছিল ঋত্বিক্‌দের মতো, তারপর ক্ষত্রিয়েরা আর একটু grosser (স্থূল) কাজ করতেন, ক্ষতের থেকে ত্রাণ করা ছিল তাঁদের কাজ, বৈশ্যেরা অন্নের ব্যবস্থা করতেন। দ্বিজেরা সদাচারগুলিকে অভ্যাসে পরিণত ক'রে ফেলতেন। সদাচার তাই, যা'-কিনা বাঁচিয়ে রাখে—যেমন প্রস্রাব ক'রে জল নেওয়া, মুখের মধ্যে আঙ্গুল না দেওয়া, নাক ঝেড়ে হাত ধোওয়া ইত্যাদি—hygienic standpoint থেকে (স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে) এ-সবের অবশ্য প্রয়োজন। সদাচার যারা পালন করে তারা আবার অনাচারে সহজে আক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। সদাচার-বিরুদ্ধ কোন-কিছু তাদের সহ্য হয় না।

উপনয়ন-সম্পর্কে বললেন—উপনয়ন মানে উপনীত হওয়া, গুরুগৃহে উপনীত হ'য়ে উপনয়ন গ্রহণ করতে হ'ত। উপনয়ন হ'লো আমাদের পূর্ব্বপুরুষের স্বীকৃতি। উপনয়ন গ্রহণ না-করলে, আমাদের ঋষি-মহাপুরুষদের সঙ্গে যে কোন সম্পর্ক ছিল

তা'ই যেন বোঝা যায় না। মুসলমান কর্ম্মচারীরা বেশ নামাজ পড়বার জন্য ছুটি নেয়, কিন্তু আমাদের হিন্দুদের সন্ধ্যা করবার জন্য ছুটির ব্যবস্থা নেই—এ তো আমাদের দোষে, এক ভাই যদি সন্ধ্যার জন্য ছুটি চায় আর-একজন বলবে—না, আমি কাজ করব। কী যে আমাদের অধঃপতন! আমরা এক হ'তেই পারি না। আর, ভগবান আমার সামনে জুটিয়ে দেনও দৃষ্টান্ত। একবার নারায়ণগঞ্জ থেকে আসছি, ওখানে একটি মুসলমান মেয়েছেলের গায়ের ওড়না না বোরখা একটা কনেষ্টবলের গায় লেগেছিল—আর সেই কনেষ্টবলটাকে কি মার। কুড়ি-পঁচিশজনে মিলে তাকে একেবারে ফুটবল ক'রে ফেলল। মেরে পিষে দিল। তখনও পুরোপুরি ইংরেজী আমল, এখনকার মতো একজনও দেশের লোক মন্ত্রী হয়নি। ওই দেখলাম—আর সকালে গোয়ালন্দে steamer (ষ্টীমার) থেকে নামবার সময় দেখি, এক সাব-ডেপুটি তার বৌ নিয়ে আসছে, এমন সময় কে একজন তার বুক চেপে ধরেছে, আর সকলে বলছে—বৌকে যেমন মেম সাজিয়ে নিয়ে বেড়াও, করবে না, বেশ করেছে। আমি ভাবতে লাগলাম—কেউ যদি অন্যায়ই ক'রে থাকে, তার কি ক্ষমা নেই! তাকে কি এমন ক'রে অপদস্থ করতে হয়! আমি ভদ্রলোকের পিছনে-পিছনে গেলাম। একটু তফাতে এসে ভদ্রলোক স্ত্রীকে বকতে লাগলেন—তুমি অত লোকের মধ্যে চেঁচালে কেন? চেঁচালে কেন? এই তো আমাদের অবস্থা।

আর-একবার দেখেছিলাম পোড়াদহ ষ্টেশনে—একটি মেয়ে পায়খানায় গেছে—একটা পুরুষ সেইদিকে ঢুকল—এবং সে সরতে-সরতে এমন জায়গায় চ'লে যাচ্ছে যেখানে পুরুষটির সুবিধা হয়, পরে তাড়া দিতে লোকটি মাঠের মধ্যে দৌড় দিল। লোকটি চ'লে যাবার আধঘণ্টা পর পর্য্যন্ত মেয়েটি কাঁপতে লাগল। কিন্তু তারপর ঐদিনই ব্যাণ্ডেলে দেখলাম—কাছা দিয়ে কাপড়-পরা একটি মেয়েমানুষ—বোধ হয় মারাঠী হবে। একটা পুরুষকে পায়ের জুতো খুলে চটাপট-চটাপট মার—পুরুষটা ছুটে পালাল, কেউ কোন কারণ বুঝতে পারল না। মুখ ধোবার সময় মেয়েটির গায় জল লাগিয়েছিল—এই বোধহয় অপরাধ। এই মারাঠা জাতটাও একসময় আমাদের মতো ছিল, কিন্তু শিবাজী এসে এদের গ'ড়ে দিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যায় কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একরকম মানুষ আছে, তাদের হয়তো কোন মেয়েকে খুব ভাল লাগল—কিন্তু approach করবার (এগোবার) সাহস নেই, ভয় পায়—অথচ মনে-মনে তার জন্য অভাব বোধ করে, টানটা ছাড়তে পারে না—আর তার অভাব মেটাতে চায় আর-একজনকে দিয়ে—যাকে ভালবাসে না, যা' সে পছন্দ করে না, দেখাচ্ছে, তাই যেন খুব ভালবাসে। তাদের সবই এমনি উল্টো, সেখান থেকে ঘা খেল, গেল অন্যত্র। কাউকে হয়তো মা-বোন ব'লে ভালবাসতে আরম্ভ করলো, খুব মিশে পড়লো, কিন্তু তলে-তলে রইলো শয়তানি—এইরকম এদের libido (সুরত) পৈতের মতো

জড়া পাকিয়ে যায়, distorted (বিকৃত) হ'য়ে পড়ে। এরা সব-কিছু বোঝে উল্টো, কেউ হয়তো তাকে বলল—ওখান থেকে লাফ দিও না—সে সোজাভাবে কথাটা কিছুতেই নিতে পারবে না, ভেবে নেবে তাকে বুঝি অপমান করা হ'চ্ছে। একটা জিনিস তার হয়তো খুব ভাল লেগেছে—তখন সে দেখাবে তা' যেন সে পছন্দ করে না—vigorously oppose-ই (জোরের সঙ্গে প্রতিবাদই) করতে থাকবে। এরকম যাদের হয়, তাদের শোধরান মুশকিল। এরা gentlemanly pose (ভালমানুষী চাল) নিয়ে চলে, খুব mild (নম্র)-মোলায়েম কায়দাকরণ ক'রে চলে—অথচ insincerity-তে (কপটতায়) ভরা—এদের সারা বড় কষ্টকর। আর-একরকম আছে damaged (বিধ্বস্ত) যেমন বিল্বমঙ্গল—এরা হয়তো কারো জন্য একেবারে উন্মাদ হ'য়ে ওঠে—কোনদিকেই খেয়াল রাখে না—debauched life lead (ব্যভিচারী জীবন যাপন) করে—কিন্তু একটা নৌকার মধ্যে একটা ফুটো হ'লে সেই ফুটো-জায়গায় একটা গোঁজা দিয়ে দিলে যেমন যে নৌকা সেই নৌকা—আগে যেমন পাঁচশো মণ মাল বইতে পারত, তেমনি পারে—এদেরও সেইরকম, ওই ফুটোটা যদি একটিবার ঠিক ক'রে দেওয়া যায়, Superior Beloved-এ (প্রেষ্ঠে) attached (অনুরক্ত) হয়, তবে normal (সহজ) মানুষ হ'য়ে দাঁড়ায়—তাই damaged (বিধ্বস্ত সুরত) অনেক ভাল।

একটা মানুষ যখন বলে—সংসার নিয়ে পেরে উঠছি না—অভাব-অভিযোগ, দুঃখকষ্ট, ছেলেপেলে অবাধ্য ইত্যাদি, তখন বুঝতে হবে, তার কোন obsession (অভিভূতি) আছে, সেইজন্যই সব নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। একেই বলে মায়া—মায়া আমাদের পরিমাপিত ক'রে তোলে, জীবন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিয়ে যায়, এ হ'লো বৃত্তির খেলা—বৃত্তাকার তাই বলে বৃত্তি, বৃত্তির মধ্যে মানুষ যখন থাকে তখন চলার পথ পায় না। প্রকৃতপক্ষে জরা-মৃত্যু ছাড়া আর কোন দুঃখ নেই—অন্য যা'-কিছু জীবনে আসে—তা' আমাদের বলে—আমাদের গ্রহণ কর, আমাদের দিয়ে তুমি পুষ্টি সংগ্রহ কর। সব-কিছু আসে আমাদের serve (সেবা) করতে, আমাদের principle (আদর্শ) থাকলে ওরাই খোরাক হ'য়ে দাঁড়ায়—যাই আসুক না কেন, আমরা ঘাবড়াই না, ওদের জীবন-বৃদ্ধির কাজে নিয়োগ করতে পারি।

এক দাদা পরোপকার ও দেশসেবার কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালমন্দ যাই করি না কেন, principle (আদর্শ) না থাকলে কিছু integrated (সংহত) হয় না। সি, আর, দাস যখন leader (নেতা) হ'য়ে গেলেন, একজন বিশিষ্ট নেতার তখন মনে-মনে ক্ষোভ হয়েছিল, তিনি আমার কাছে এসে বলেছিলেন—দেশ আমাকে চাইলো না, দেশের জন্য আমি এত করলাম। আমি বললাম—তা' তো হবেই। আপনি তো কাউকে fulfil (পরিপূরণ) করার জন্য

এ-সব করেননি। প্রথমে উনি কথাটা বুঝতে পারেননি, পরে মৃত্যুর আগে বুঝেছিলেন। আমরা যদি কা'রও উপকার করতে যাই এবং কোন *প্রত্যাশা রাখি—তখনই সে* rigid (কঠোর) হ'য়ে ওঠে—ভাবে, ওঃ, তুমি তিন পয়সা দিচ্ছ—পাঁচ পয়সা পাবার লোভে, সে-সব চালাকী খাটছে না। আত্মস্বার্থ-আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করলে অমন না হ'য়ে পারে না, কিন্তু ইষ্টস্বার্থ-ইষ্টপ্রতিষ্ঠার জন্য করলে অন্যে তোমার ইষ্টের প্রতি ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে তোমার প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে ওঠে। তুমি হয়তো বললে—ভাই! তোমাকে যা' পারলাম দিলাম, তোমার কাছ থেকে আমি এ আর ফিরে চাইনে; ভাই, আমার দশাও এইরকম ছিল তাঁর দয়ায় আমি এখন সব বুঝেছি—সার্থক হয়েছি। এতে মানুষ automatically grateful (স্বতঃই কৃতজ্ঞ) হয়। কোন মানুষ এতেও যদি ভাল না হয়—তবে বহুদিন ধ'রে ইষ্টানুগ সেবা ও অনুধাবন করলে ঠিক হ'য়ে যায়—যদি কিনা জন্মগত ব্যত্যয় না থাকে। প্রকৃতির নিয়মই এইরকম। তুমি হয়তো তোমার স্ত্রীর ডালে ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছ, তরকারী কুটছ, ছেলেমেয়ে রাখছ—অথচ তোমার পুরুষত্ব নেই, তোমার স্ত্রী তখন তোমাকে পেয়ে বসবে, তোমার উপর দৌরাত্ম্য করবে, তোমার জন্য এতটুকু ভাববে না, তোমার কথা শুনবে না। কিন্তু তুমি যদি বল—তোমার মতো কত মেয়ে আছে, তুমি যদি আমার মা-বাবার সেবা না কর, তুমি আমার কেউ নও। দেখবে তোমার স্ত্রী আপনা-থেকেই ঠিক পথে চলবে। মানুষকে বৃত্তিমাফিক সেবা করার ফলে উভয়েরই সর্ব্বনাশ হয়, কিন্তু শ্রেয় কাউকে fulfil (পরিপূরণ) করার জন্য যদি সেবা করা যায়, সকলেই মঙ্গলের অধিকারী হয়।

যতীনদা—একজন দেখে কি-ক'রে বুঝব যে ইনি আমার গুরু হবার উপযুক্ত কিনা? বিশ্বাস আসবে কী-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখা মাত্রই কি বোঝা যায়? কেউ-কেউ পারে। তবে সঙ্গ করলে বোঝা যায়। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া দৃষ্টিশুদ্ধতা, দৃষ্টিশুদ্ধের্হি বিশ্বাসঃ, বিশ্বাসাৎ নির্ব্বিচারতা, নির্ব্বিচারাৎ ভবেৎ প্রেম, প্রেম্নশ্চাত্মসমর্পণম্।

সঙ্গ করলে শ্রদ্ধা আসে, শ্রদ্ধার ফলে দোষদর্শন দূর হ'য়ে যায়। ভালটাকে মন্দ ব'লে দেখার প্রবৃত্তি থাকে না, আর মন্দ ব'লে কিছু দেখতেও পাই না। তারপরে আসে বিশ্বাস, বিশ্বাস আসলে আমরা প্রশ্নশূন্য হ'য়ে দাঁড়াই। তৃপ্তিতে আমাদের মন ভ'রে যায়, এতে জন্মে প্রেম, ভালবাসা, টান। আর, প্রেম আত্মসমর্পণে পরিণত হয়—প্রিয় ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরেনদাকে (ভদ্র) ডেকে একজন রোগীর জন্য আটটা কমলা আনতে দিলেন।

ইষ্টপ্রাণতা-প্রসঙ্গে কথা উঠলো, বললেন—ইষ্টপ্রাণতা তিন রকমের—সবচেয়ে ভাল হলো passion-pervading attachment (বৃত্তি-ভেদী অনুরাগ) যে-বৃত্তি আমার

ইষ্টকে fulfil (পরিপূরণ) করে না, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আর, যা' কোন-না-কোন ভাবে ইষ্টকে fulfil (পরিপূরণ) করে, সে-সম্বন্ধে আমার কোন প্রশ্ন নেই—করবই। আর-এক রকম—passion-compromising (প্রবৃত্তির সঙ্গে আপোষকারী)। আমার complex (প্রবৃত্তি)-এর সঙ্গে যতটুকু খাপ খায়, ইষ্টকে ততটুকু follow (অনুসরণ) করি—আর নিকৃষ্ট হ'চ্ছে passionate (প্রবৃত্তিমুখী)—এখানে ইষ্টকে আমার বৃত্তির fulfilment-এর (পূরণের) জন্য utilise (ব্যবহার) করি—ঠাকুর! আমি তোমায় কত ভক্তি করি, ডাকি, দিনরাত কাঁদি, ঠাকুর, ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়েটা যদি ঘটিয়ে দাও, তাহ'লে তুমি প্রকৃত ঠাকুর, তবে তোমার ভোগ দেব, ইত্যাদি।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ভোলানাথদা (সরকার) প্রমুখ এসে পড়লেন। আজ সারাদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার কথা বার-বার জিজ্ঞাসা করছেন, কেষ্টদা আসতেই কি স্ফূর্ত্তি। বললেন—আমি ভাবছিলাম, আপনি হারিয়ে গেছেন নাকি?

কেষ্টদা ও উপস্থিত সকলেই হেসে ফেললেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও সঙ্গে-সঙ্গে হাসতে লাগলেন। ভোলানাথদা পায়ের ব্যথার কথা জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দ-আবেগে বলতে লাগলেন—আপনি ঐ ন্যাঙড়া পা নিয়ে যা' ক'রে এসেছেন—সে তো একটা অমানুষী কাণ্ড, আমি তো ভাবতেই পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে এইরকম প্রাণ-মাতান কথা শুনে দুনিয়ার দুঃখকষ্ট সব ভুলে যেতে হয়—যারা শোনে, যারা দেখে তাঁকে, তারাই শুধু বোধ করতে পারে এর মর্ম্ম—শিরায়-শিরায় আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। বিশ্বগ্রাসী ব্যগ্রতা নিয়ে নিখিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার উন্মাদ-আকাঙ্ক্ষা তাদের উদ্বেল ক'রে তোলে।

৩রা কার্ত্তিক, ১৩৪৬, শুক্রবার (ইং ২০। ১০। ১৯৩৯)

রাত্রিবেলা যতীনদা, কেষ্টদা (চন্দননগরের), অমর ভাই (ঘোষ) প্রমুখ ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর্য্যদের প্রত্যেকটা জিনিস যে কতখানি experiment-এর (পরীক্ষার) ফল এবং এরা যে কত-বড় scientific race (বিজ্ঞানবিৎ জাতি) আমি যতই ভাবি, ততই ভক্তিতে আমার মাথাটা নুয়ে পড়ে।

নানাবিধ সদাচার, হোম ইত্যাদির কথা বলতে লাগলেন—প্রত্যেকটি সদাচারের hygienic effect (স্বাস্থ্যোন্নয়নী ফল) আছে। অজ্ঞাতকুলশীল কা'রও হাতে খেতে নেই। শরীরের জন্য খাওয়া-দাওয়া-সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। কার যে কী disease (রোগ) আছে, তা' তো জানা নেই। একজন হয়তো নিজে immune

(সংক্রামণমুক্ত), কিন্তু তার হাতে কিছু খাবার ফলে আর একজন হয়তো সংক্রামিত হ'লো। স্বপাকই শ্রেয়ঃ। দোকানের খাবার না-খাওয়াই ভাল। সদাচার-বিহীন বিপ্রের হাতেও খেতে নেই। অন্যের বিছানায় শোওয়া উচিত নয়—অন্যের সঙ্গে শোয়াও ঠিক নয়। আর-একজনের কাপড় পরতে নেই। গণোরিয়া রোগীর কাপড় প'রে অনেকের গণোরিয়া হয়েছে তা' আমি জানি। সেবার মেথরদের সঙ্গে একসঙ্গে খেল, কিন্তু ওর ফলে যে কতজন কত disease carry (রোগ গ্রহণ) করেছে তার কি ঠিক আছে? ছোটবেলা থেকে ভাই-ভাই একসঙ্গে খেয়ে তাই মিল থাকে না, আর একদিন-দু'দিন একসঙ্গে খেলে যদি মিল হ'তো তাহ'লে তো আর কথা ছিল না।

প্রায়শ্চিত্তে গোময় খায়, গোময় দিয়ে ঘর লেপে,—আমরা হয়তো ভাবি অনর্থক; কিন্তু গোময়ের মতো ব্যাক্টেরিয়া-ফাজ খুব কমই আছে—অর্থাৎ গোময়ের মধ্যে একরকম জিনিস আছে যা' ব্যাক্টেরিয়া নষ্ট করে, খেয়ে ফেলে।

প্রসঙ্গক্রমে বললেন—অনুলোম বিয়েটা ভারী চমৎকার জিনিস।

যতীনদা—এখনই দু'-তিনশো অনুলোম বিয়ে যদি হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, এখন বেশী নয়, আরো খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে করাই ভাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে কয়েকটি মেয়ের জন্য ভাল পাত্র দেখতে বললেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন—যেখানে যাবেন, লক্ষ্য রাখবেন—বিয়েগুলি যেন ঠিকমতো হয়।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৪৬, শনিবার (ইং ২১। ১০। ১৯৩৯)

সকালে শ্রীযুক্ত খেপুদার (প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর একখানি বেঞ্চে ব'সে আছেন—প্রশান্ত বদনে। বাবলাগাছের ফাঁক দিয়ে হেমন্তের স্নিগ্ধ কিরণ এসে লুটিয়ে পড়েছে পায়ের তলে, আশেপাশে বহু মা ও দাদারা দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যাজন-সম্পর্কে বললেন—যাজন হ'লো দৈনন্দিন জীবন-চলনার পথ বাতলে দিয়ে elate (উদ্দীপ্ত) ক'রে actively Ideal-এ interested (সক্রিয়ভাবে আদর্শে অনুরক্ত) ক'রে তোলা। ঠাকুরের কথা কওয়া লাগে শেষে। আগেই যদি বলতে সুরু কর—'ঠাকুর না হ'লে কিছু হবে না'—সেটা তোমার পক্ষে সত্য হ'লেও তার কাছে কী? যা'ই কর না কেন, তার problem-এর (সমস্যার) মধ্য-থেকে যেতে হবে। সেখান থেকে গেঁথে তোলা লাগে, তবেই শক্ত হয়। দেখেন না, ভিত থেকে লোহা দিয়ে গেঁথে তুললে কেমন শক্ত হয়। যে যেখানে যা' নিয়ে আছে, তা' থেকে আরম্ভ করতে হবে। তোমার প্রতি interested (অনুরক্ত) হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তোমার Ideal-এ (আদর্শে) interested (অনুরক্ত) হবে।

মন্মথদা (দে)—মেয়েদের ক্ষেত্রে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়ে তো আর পুরুষ না। তাকে মেয়ের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে হবে। মেয়েরা তো যেখানে-সেখানে যাজন ক'রে বেড়াতে পারে না আপনাদের মতো। বিধিসঙ্গতভাবে পরিবারের সেবা-শুশ্রূষার মধ্য-দিয়ে তাদের সব। তা' না-ক'রে তথাকথিত প্রগতিবাদী মেয়েদের মতো চললে—তারা বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে!

একটি দাদা বলছিলেন—স্বস্ত্যয়নী-ব্রত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝি—কিন্তু নিয়ে কী-ক'রে চালাব তাই ভাবি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমনভাবে খাওয়া-দাওয়া চলে—তেমনিভাবেই স্বস্ত্যয়নী আরম্ভ ক'রে দিতে হয়, দিয়ে ভাবতে হয়,—কী করা যায়, না যায়। তবেই করা যায়।

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৪৬, মঙ্গলবার (১৪। ১১। ১৯৩৯)

দুপুরে খেয়ে এসে বিছানায় শুয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে (ভট্টাচার্য্য) বলছেন—আমার মনে হয়, sperm (শুক্রকীট) যে আতিবাহিক সূক্ষ্ম উপাদান বহন ক'রে শরীর সৃষ্টি করে, মৃত্যুর পরও সেই উপাদান হয়তো থেকে যায়—নষ্ট হয় না এবং তাকেই বলে লিঙ্গ-শরীর। তা' এত সূক্ষ্ম যে আগুনে তা' পোড়ে না, একেই বলে ecto-plasmic body (আতিবাহিক সত্তা)। আর, মানুষের বেলায় এটা যদি সত্য হয়, তবে গাছপালা, কাপড়-চোপড়, ইঁট-কাঠ সবক্ষেত্রেই এমনতর। তাই আমার মনে হয়, মৃত্যুর পরও মানুষ কাপড় পরতে পারে, ইচ্ছা করলে কিছু খেতে পারে—সেই অবস্থায় যেমন ক'রে তা' সম্ভব। এমনতর মনে হয়—সত্য-মিথ্যা জানি না।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছনে বকুলতলায় ব'সে সিঁথির ভবতারণদার (বসু) সঙ্গে নানা-বিষয় আলোচনা করছেন—কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও খেপুদা (চক্রবর্ত্তী) সেখানে ব'সে আছেন—শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে একটা বাণী প'ড়ে শোনাতে বললেন—সন্তানদের চরিত্রগঠন-সম্বন্ধে একটা বাণী প'ড়ে শোনান হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—বাপ হয়তো নিজের গুরুজনকে দেখিয়ে ছেলেকে বলছে—ওঁকে প্রণাম কর, অথচ নিজে প্রণাম করছে না, এটা বড় খারাপ। নিজে প্রণাম ক'রে তারপর তাকে বলতে হয়, তবেই ফল হয়। তারপর, বাপ হয়তো সন্তানের কাছে তার মায়ের ন্যায্য প্রশংসা করে না, কিংবা মা হয়তো বাপের গুণের কথা কয় না, এতে খুব ক্ষতি হয়—regard (শ্রদ্ধা) বাড়ে না। আর, মা-বাপ যদি ছেলেমেয়েদের সামনে ঝগড়া-বিবাদ করে, তার দরুন দারুণ কুফল ফলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—এই যে টাকা-পয়সা! একে আমি তত মূল্যবান মনে করি না। কেউ দিলে কিছু পাওয়ার দরুন যে খুব একটা খুশি হই তা' নয়,

কিন্তু যে দিচ্ছে, দেওয়ার urge (আকূতি)-টাই তার পক্ষে মঙ্গলজনক দেখে ভাল লাগে। অবশ্য কিছু পেলে ভাবি—পাঁচজনের অভাব মেটাতে পারব, যার যা' দরকার দিয়ে দিই, এর উপর আমার লোভ নেই, টান নেই,—আমার সব চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছেন আপনারা। আমার এমন স্বভাব যে কা'রও যদি একটু অসুখ করে, তাহ'লে মনে হয়, আমার কী-যেন মস্ত ক্ষতি হ'য়ে গেল, মন খারাপ হ'য়ে যায়। আবার মানুষের সঙ্গে আমার সম্বন্ধও তাদের খারাপ নিয়ে—কেউ এসে একটা সুখের সংবাদ, কৃতার্থতার সংবাদ দেয় না, অসুবিধায় পড়লেই আমার কাছে আসে। একজন হয়তো প্রার্থনা করছে—ঠাকুর, আমি এই লটারির টিকিট কিনেছি, পাঁচ হাজারের বেশী যা' পাই, সব তোমার। পাঁচ হাজারের বেশী এক পয়সাও আমি রাখব না। হয়তো পঞ্চাশ হাজার টাকা পেল। তখন আর দেখা পাওয়ার জো নেই। ওই টাকাগুলো দিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ ক'রে সর্ব্বস্বান্ত যখন হবে তখন হয়তো আমার কাছে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু তখন তাকে দেখে এ-কথা বলতে পারি না—তুমি অমন করেছ, তাই এমন হয়েছে। সে-কথা তখন মনে পড়ে না, তার কষ্ট দেখে ব্যথিত হ'য়ে পড়ি, তাকে না দেখে পারি না, তার অবস্থা দেখে ভুলে যাই।

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪৬, বুধবার (ইং ১৫। ১১। ১৯৩৯)

স্থান ঃ পাবনা, সৎসঙ্গ-আশ্রম। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত স্থানীয় একজন প্রবৃত্তি-তাড়িত হ'য়ে স্বধর্ম্ম ও কৃষ্টি ত্যাগ ক'রে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করবে ব'লে স্থির করেছে। এই সংবাদ পেয়ে তিনি দারুণ মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়েছেন। দুপুরে খেতে গিয়ে ভাতের থালায় হাত দিয়ে উঠে এসেছেন, খেতে পারেননি, ঘুমুতেও পারেননি। লোকটিকে ডাকিয়ে তার সঙ্গে নিরালায় কথাবার্ত্তা বলছেন, বোঝাচ্ছেন—পূরয়মাণ ইষ্ট, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও পিতৃপুরুষকে অস্বীকার ক'রে যে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ তা' কতখানি সত্তাসম্বর্দ্ধনার অর্থাৎ ধর্ম্মের বিরোধী। কারণ, ঐভাবে যাঁকে গ্রহণ করা হয়, তার ভিতর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধোচ্ছল আগ্রহ তো থাকেই না, বরং ধর্ম্মের নাম ভাঁড়িয়ে নিজের অপকর্ম্মকে সমর্থন করার প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ প্রেরণাই থাকে প্রবল, তা'তে ক'রে তাঁকে এবং প্রতিপ্রত্যেকটি প্রেরিতকেই অবমাননা করা হয়।

লোকটি বুঝেও বুঝছে না, তাই তাঁর মন বড় বিমর্ষ। চোখ-মুখের দিকে চাওয়া যাচ্ছে না।

৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৪৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১৬। ১১। ১৯৩৯)

সত্যদা (দে) বলছিলেন—কলকাতার এক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের নল কেনা উপলক্ষ্যে অনেককে ফাঁকি দিয়ে তাদের ইষ্টভৃতির টাকা নিয়ে নিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমন দেয় কেন? যারা দেয়, তাদেরই তো দোষ। বিশ্বাস রাখা ভাল, কিন্তু বেকুব হওয়া ঠিক নয়। আর, ইষ্টভৃতির টাকা যে কোথায় পাঠাতে হবে—আমি তা স্পষ্ট ক'রে লিখে দিয়েছি, অপরের উল্টো কথা মেনে নেয় কেন? এ কথা মনে রেখো যে, ইষ্টার্ঘ্য বরাবর আমার অর্থাৎ সৎসঙ্গের ফিলান্থ্রপি অফিসেই পাঠাতে হবে। এ কথা সবার জানা উচিত যে, আলো জ্বললে সেখানে যেমন পোকা আসে, তেমনি টিকটিকিও আসে।

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬, বৃহস্পতিবার (ইং ৭। ১২। ১৯৩৯)

শীতের পড়ন্ত বেলায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে একখানি বেঞ্চের উপর ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবল্লভ গোস্বামী নামক একজন কীর্ত্তনিয়ার সঙ্গে কথা কইছেন—"স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাত্র-বিশেষে ফল।" একই libido (সুরত) যার উপর গিয়ে পড়ে, যেখানে set (ন্যস্ত) হয়, তার উপরই সব-কিছু নির্ভর করে। তাই সদ্‌গুরুর উপর libido (সুরত) ঠিকভাবে set হ'য়ে গেলে (ব'সে গেলে) "মার দিয়া কেল্লা।" (শ্রীশ্রীঠাকুর একটি দাদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন)—আপনার খোস্তামারা কথা, ওই-ই যদি ইষ্টের জন্য লাগান,—তাই মানুষের কানে মধু ঢেলে দেবে। একজন হয়তো আপসোসের কান্না কাঁদে, সে যদি ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপরায়ণ হ'য়ে ওঠে, তার কান্না মানুষকে একেবারে ভাসিয়ে দেবে। কাম, ক্রোধ কমানর কিছু দরকার নেই, শুধু ওদের ইষ্টমুখিনতার দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে—কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ম'রে গেলে ইষ্টের কাজ করবে কী দিয়ে?

আর, ধর্ম্মের একটা নিশানা আছে—পূজা-আচ্চা করি, ভগবানকে ভালবাসি অথচ আমার দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা বাড়ছে না, সপারিপার্শ্বিক আমি উচ্ছল হ'য়ে উঠছি না—এতে বুঝতে হবে, আমার চলার গণ্ডগোল আছে। কেউ ঐশ্বর্য্য চা'ক আর না চা'ক—ইষ্টপ্রাণ হ'য়ে চলার পথে ঐশ্বর্য্য তাকে আলিঙ্গন করবেই।

সেবাসম্ভূত প্রকৃত ঐশ্বর্য্য হ'লো একটা নিদর্শন যে সে ধর্ম্মকে যথাযথ আচরণ করেছে। এইজন্য চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত, ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।" তবে কোন-একটা কিছু স্তর বা অবস্থা বা আর্থিক উন্নতি লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে ইষ্টকে ভালবাসে, তার কিছুই হয় না—'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।'

মানুষ 'অনন্যভাক্' অর্থাৎ অনন্য-ভজনশীল হ'য়েই আছে—ইষ্টকে নিয়ে 'অনন্যভাক্' হ'তে পারলেই কাম ফর্সা। তাঁকে ভাল লেগে গেলে সব-কিছু তলে প'ড়ে যায়, যাজনে ওই তাঁর জন্য তাঁকে ভাল-লাগা গজায়।

যাজনে brain-এর (মস্তিষ্কের) সবগুলি sphere (দিক) active (সক্রিয়) হ'য়ে ওঠে, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাসনার knot ও obsession (গেরো ও অভিভূতি)-গুলি ভেঙ্গে যেতে থাকে, যদি-কিনা মানুষ নিরাশী ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে যাজনের আনন্দের জন্যই যাজন ক'রে চলে।

অনেক কথার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে ভরদ্বাজ University (বিশ্ববিদ্যালয়), বশিষ্ঠ University (বিশ্ববিদ্যালয়), শাণ্ডিল্য University (বিশ্ববিদ্যালয়)—এইরকম ছিল। কৃষ্টির জাগরণের জন্য আবার সব গ'ড়ে তুলতে হয়।

২৩শে পৌষ, সোমবার, ১৩৪৬ (ইং ৮।১।১৯৪০)

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), গোপালদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মোড়ায় ব'সে আছেন, হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের পণ্ডিতমশায় আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ার আনতে বললেন, গোপালদা চেয়ার এনে দিলে পণ্ডিতমশায় চেয়ারে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—আমি তো এক-সময় খুব নামধ্যান করতাম। কাজ বাদ দিয়ে শুধু নামধ্যান কিছুদিন ক'রে কেমন যেন নিথর হ'য়ে গেলাম—ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ কোন sensation (ভাব)-ই যেন feel (বোধ) করতাম না, আগের সেই tremor of life (জীবনের স্পন্দন) চ'লে গেল, solid (নিরেট) হ'য়ে উঠলাম—সে এক নরক-বিশেষ, তারপর আমি নামের সঙ্গে-সঙ্গে কাজের দিকে মন দিলাম, তখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিলে এল। যে-সব ছেলে বাড়ীর কাজ করে না কিংবা কোনপ্রকার motor-activity-তে (কর্ম্মে) লিপ্ত নয়, তাদের পড়াশুনোর মাথাও নিরেট হ'য়ে ওঠে। যাদের মা-বাপকে কিছু দেওয়ার দিকে নজর আছে—তারা ভাল হবেই। যারা মা-বাপের জন্য, পরিবারের জন্য কিছু করে না, অথচ পাড়ার লোকের জন্য খেটে বেড়ায়, বুঝতে হবে—সেখানে abnormality (অস্বাভাবিকতা) ঢুকেছে। আর, স্ত্রীলোকের প্রতি উল্লম্ফী উৎকট সহানুভূতি sexual throbbing (কামস্পন্দন) -এরই পরিচয় দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাল স্বস্ত্যয়নী করেছিলি?

প্রফুল্ল—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও' ভিক্ষা করতেই পারে না।

কেষ্টদা বললেন—ভিক্ষায় অষ্টপাশ কেটে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যিই তাই। ইষ্টের জন্য ভিক্ষা মানুষকে ভিতর থেকে তৈরী ক'রে তোলে। ইষ্টার্থে বিধিমতো ভিক্ষা মানুষকে বড় ক'রে তোলে, বৃত্তিস্বার্থপ্রলুব্ধ ভিক্ষা আবার জাহান্নমে নিয়ে যায়।

ঐদিন পরে একসময় শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে (বসু) বলছিলেন—যুগাবতার ছাড়া অন্য কেউ ধ্যেয় নন। যুগাবতারের অবর্ত্তমানে তাঁ'তে অচ্যুত-আনতি-সম্পন্ন, ছন্দানুবর্ত্তী, জীবন-বৃদ্ধির আচরণ-সিদ্ধ তঁদ্‌বংশধর ইষ্ট-প্রতীকস্বরূপ থাকতে পারেন। পরবর্ত্তী এসে গেলে তখন তিনিই হবেন ধ্যেয়।

১৩ই মাঘ, ১৩৪৬, শনিবার (ইং ২৭। ১। ১৯৪০)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের পাশে খড়ের ঘরের বারান্দায় মোড়ার উপর ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) কবিতাকারে দেওয়া ছড়াগুলি পড়ছেন। পাশে যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), যোগেনদা (হালদার), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ অনেকে দাঁড়িয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বিয়ে করার পর পুরুষের স্ত্রীকে বলা উচিত—দ্যাখো! আমার বাবা, মা, ভাই, বোন ইত্যাদিকে সর্বপ্রকারে সেবা করাই তোমার কাজ—এ ছাড়া আমি নিজে কিছু চাই না। নিজেরটা নিজে ক'রে নেওয়াই ভাল। স্ত্রীর প্রতি দরদ-বশতঃ যদি বলা যায়—এ লোকটা যে পারে না সে-দিকে লক্ষ্য নেই। বাবা-মা যে কী! তাহ'লে সর্ব্বনাশ, তোমাকে ভেড়া বানিয়ে ফেলবে। দেখেন না, কত বলদ আছে—তারা হামেশা বৌ-এর তরকারী কোটে, ছেলেপেলে রাখে, তাকে খুশি করবার জন্য তার ফরমাস খেটে বেড়ায়। বৌ-এর একটু কাশি হ'তেই বৌ হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বলবে—গেছি! গেছি! গেছি! (শ্রীশ্রীঠাকুর এমনভাবে অঙ্গভঙ্গী করলেন, চোখেমুখের এমন অবস্থা, যেন দেখলে মনে হয়, সত্যিই তিনি নিজেই বুঝি কাতর হ'য়ে পড়েছেন।) তখন স্বামী যদি হা-হুতাশ ক'রে ছুটোছুটি করতে থাকে, তাহ'লেই বুঝে নেবে—'মানুষটাকে তো কাবেজে এনেছি'। তখন বরং বলতে হবে—'অমন ক'রে ব'সে থাকলে তো চলবে না, মা-বাবার জন্য অমুক-তমুক করা লাগবে'—তারপর সে সোজা হ'য়ে যায়, ভাববে এ তো সোজা পাত্র নয়। আর, সত্যিই যদি তার গুরুতর কিছু হয়—নিজেই বাবা-মার সেবা করতে হয়। যদি ইষ্টের কাজের পথে কোন স্ত্রী বাধা জন্মায়, তার সঙ্গে বাদানুবাদ না ক'রে, বোঝাতে না-যেয়ে নিজে অটুট হ'য়ে চলতে হয়—তখন সে আস্তে-আস্তে বলির মোষের মতো—flat (কাত) হ'য়ে পড়ে। আমি যত কথাই বলি না কেন, সার কথা হ'লো ইষ্টস্বার্থী হও—ইষ্টস্বার্থী হ'লে সব গোলমাল চুকে যাবে। মানুষ বউস্বার্থী হয়, তার জন্য অর্থসমস্যা, রোগ, মামলা-মোকদ্দমা, অশান্তি এবং অন্যান্য যত সব বিভ্রাট। "আমি" যার স্বার্থ হই, আমাকে যে দেয়, আমার জন্য যে করে, তার ভাল হয়ই,

কিন্তু মানুষ তা' বোঝে না, অনেকেরই আমার কাছ থেকে নেবারই রোখ। আমি কয় লাখ টাকা মানুষকে দিয়েছি না? কিন্তু যারা নিয়েছে তাদের একটারও কিছু হয়নি, বরং অবনতি হয়েছে। মূলে গোল হ'লে সবটাতেই গোল ঢুকে যায়, কিছুতেই সামঞ্জস্য থাকে না। অনেকে সারাদিন খাটে আর বগবগ করে অথচ কাজ সারতে পারে না, বুঝতে হবে তাদের টানেরই খাঁকতি রয়েছে।

১৪ই মাঘ, ১৩৪৬, রবিবার (ইং ২৮। ১। ১৯৪০)

আজ বিকালে মায়েরা সব জড় হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানায় ব'সে আছেন সহাস্য বদনে। সারা অঙ্গ দিয়ে যেন আনন্দের ছাপ ফুটে বেরুচ্ছে। শঙ্খিনী, হস্তিনী, পদ্মিনী, চিত্রাণী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের নারীর বিষয় আলোচনা হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শঙ্খিনী হোক, হস্তিনী হোক, পদ্মিনী হোক, যোগিনী, ভোগিনী, ডাকিনী, নাগিনী হোক, ইষ্টপ্রাণা যেই নারী সেই সবার সেরা।

কণা-মা খুব রুগ্ন অথচ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুব অসংযত। তিনি বলেন—আমি ইচ্ছা ক'রে অপথ্য করি না। তাই নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তার সঙ্গে রহস্য করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাই তো! প্রকৃতি করায় কর্ম্ম, মোর কিবা দোষ। তবে তুই খেয়ে এসে যে 'মাগো', 'মাগো' করিস্!

শ্রীশ্রীঠাকুর এমন সুর ক'রে 'মাগো' বলতে লাগলেন, যে কারও পক্ষে হাসি সংবরণ করা সম্ভব হ'লো না।

১৫ই মাঘ, ১৩৪৬, সোমবার (ইং ২৯। ১। ১৯৪০)

বেলা প্রায় গোটা দশেকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বাবলাতলায় ফিলান্থ্রপি অফিসে ব'সে আছেন। পাশে দাঁড়িয়ে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)। একজনের সঙ্গে সমাধি-সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে বললেন—সমাধি হ'লো integrated solution (সংহত সমাধান)-এর পর যে অবস্থাটা হয় তাই। মানুষ মনে করে, সমাধি হ'লে মানুষ বুঝি আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে, কিন্তু তা' নয়। চিন্তা করতে-করতে কোন প্রশ্ন বা সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হ'লে অর্থাৎ সম্যক্ ধারণা হ'লে মনে-মনে যে তৃপ্তির বোধটা জাগে, যে আনন্দের আবেশটা আসে, সেই অনুভূতিটাই সমাধি। সমাধি নানারকমভাবে হয়—প্রত্যেকটা জিনিসের বিভিন্ন phase (দিক) আছে তো, একটা বিষয়ের universe-এর (বিশ্বের) সবগুলি phase (দিক) যখন জানার মধ্যে, বোধের

মধ্যে ধরা দেয় তখনই ক্ষণিক সমাধি হয়। তাই বলে, সমাধিতে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে যায়। শুধু intellectual solution (বৌদ্ধিক সমাধান) হ'লে তাকে সমাধি বলে না, with sensation (বোধে) বোধ করা চাই। আর, সব-কিছু ইষ্টে সার্থক হওয়া চাই। সমাধির সঙ্গে-সঙ্গে আসে কর্ম্ম। যে solution (সমাধান) পাওয়া গেল তাই তখন work out (রূপায়িত) করা হয়। আপনার কিছুই বাদ যাবে না যদি বেশ্যাবাড়ি যেয়ে থাকেন, পেন্সিল ছুঁড়ে থাকেন বা কুল খেয়ে থাকেন—সব-কিছু থাকবে, with meaning (অর্থসহ) হাজির হবে। আপনার universe-এ (বিশ্বে) যা' আছে, আপনার মতো ক'রে সব-কিছু জানতে হবে—ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য। মানুষ-মাত্রেরই মধ্যে রয়েছে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ, সে যার সংস্পর্শেই আসুক না কেন, তা' সে জানতে পারে। আমি এত কথা বলি কি-ক'রে—সব তো realised facts-এর (অনুভূত তথ্যের) উপর based (প্রতিষ্ঠিত)। আর, যতভাবে যত কথাই আমি বলি না—আমি বলি কিন্তু এক কথাই। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—'এখন সব জ্ঞান দিচ্ছি না।' তিনি closed (অপ্রকাশিত) রেখেছিলেন কিছু, কিন্তু আমি সব disclose (প্রকাশ) ক'রে দিচ্ছি। সব যে দিয়ে গেলাম পরিষ্কার ক'রে, তাও মানুষ আপনাদের কাছে না আসলে বুঝতে পারবে না। আপনারা হবেন কত মানুষের জীবন-দেনেওয়ালা। আপনারা যাঁরা অচ্যুত নিষ্ঠা ও আনুগত্য নিয়ে আমার সঙ্গে actively (সক্রিয়ভাবে) কাজ করছেন, তাঁরা হলেন future Gurus and Saviours of humanity (মানবজাতির ভবিষ্য গুরু ও উদ্ধাতা)।

নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান কী, সেই বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধরুন, কলকাতার বাড়ীর জন্য সওয়া লাখ টাকা তুলতে হবে। আপনি ভাবলেন, পাঁচশত লোকের কাছ থেকে টাকা তুলবেন, এটা হ'লো নিয়ন্ত্রণ; তারপর ঠিক করলেন, প্রত্যেকের কাছ থেকে ২৫০ টাকা ক'রে নেবেন, সেটা হ'লো সামঞ্জস্য। তারপর কেমন ক'রে এই টাকা তোলা যায় সে-ফন্দীটা আপনি চিন্তা ক'রে এঁটে ফেললেন—সেটা হ'লো আপনার সমাধান।

"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' গীতার এই প্রসঙ্গে বললেন—স্মৃতিবাহী চেতনা থাকলে মৃত্যুও মৃত্যু নয়, পুনর্জন্মও পুনর্জন্ম নয়।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর কেষ্টদা একজনের ব্যবসাজীবনের উন্নতির ইতিবৃত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—স্বস্ত্যয়নীর একটি principle (নীতি) ওর মধ্যে আছে। যে যেখান থেকেই evolve করুক (উন্নত হোক) না কেন, আসতে হবে এখানে। স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতি অল্প-বিস্তর যাদের চরিত্রগত, তাদের আর উন্নতির ভাবনা ভাবতে হবে না।

২১শে মাঘ, ১৩৪৬, রবিবার (ইং ৪। ২। ১৯৪০)

বিকালে অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে খড়ের ঘরে ব'সে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটি দাদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমি ওকে বলছিলাম যে, আমার যার উপরে ঝোঁক পড়ে, তাকে আমার মতো ক'রে নিতে না পারলে শান্তি পাই না—গালাগালি ক'রে, মেরে-কেটে, যেমন ক'রে হোক তাকে অতটা দেখতে চাই। এ যে সহ্য করতে পারে না, সে কিন্তু আর পারল না। রামদাস স্বামী শিবাজীর উপর কি কঠোর ছিলেন। শিবাজী কিন্তু রামদাসের শাসন মাথা পেতে নিত। এমন রোখ থাকা চাই যে, সবাইকে ইষ্টানত না করা পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হব না, এতে হয় চরম দুঃখ, না হয় উন্নতির উন্নত শিখর। টান যার যত নিভাঁজ, সংকল্পও তার তত পাকা।

২২শে মাঘ, ১৩৪৬, সোমবার, (ইং ৫। ২। ১৯৪০)

সকালে বাঁধের ধারে খড়ের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর স্ফূর্তিযুক্ত হ'য়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রামদা (বিশ্বাস), হরিপদদা (সাহা), উমাপদদা (বাগচী), খগেনদা (সাহা), প্রফুল্ল প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঋত্বিক্-অধ্বর্য্যুদের পক্ষে মাসিক দু'-চারশ টাকা প্রীতি-অবদান পাওয়া কঠিন ব্যাপার কিছু নয়। এমন হবে যে, ভাল লোক যত সব এইদিকে চ'লে আসবে—government (সরকারী) চাকরীর জন্য লোক কমই পাওয়া যাবে। একটা সাবডেপুটির চাকরীর চেয়ে যাজকের কাজ সবদিক থেকে লাভজনক। প্রত্যেক ঋত্বিকের সঙ্গে আবার তার staff (কর্ম্মচারী) থাকবে, ডাক্তার থাকবে, Engineer (যন্ত্রনির্ম্মাতা) থাকবে, Agriculturist (কৃষি-বিদ্যাবিৎ) থাকবে, Scientist (বৈজ্ঞানিক) থাকবে। হয়তো এক জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে না, অমনি ঋত্বিকের মাথায় টনক ন'ড়ে যাবে, তার দল research (গবেষণা) সুরু ক'রে দেবে। এরা সর্ব্বভাবে service (সেবা) দেবে। স্বরাজ-স্বরাজ করে, এমনভাবে চললে movement (আন্দোলন) না-ক'রেই স্বরাজ এসে যাবে। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা সুবিধাজনক, লোকে আপনা থেকেই বুঝতে পারবে। তখন একটা District Magistrate (জেলা-শাসনকর্ত্তা) কোন-কিছু করতে গেলে ঋত্বিক্‌দের পরামর্শ না নিয়ে করতে পারবে না। তারা নিজেরাই টের পাবে যে তারা বা কতটুকু কার্য্যক্ষম এবং এরা বা কতখানি। মানুষ আরো বুঝবে—নিজেরা খিন্ন হ'য়ে যে movement (আন্দোলন) করা যায়, তারই বা কী ফল আর এরই বা কী ফল। এই সোজা কথাটা অনেকে বোঝে না। তাই দেখুন, আর্য্য-পন্থাটা কী-ব্যাপার! এই জন্যই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির কথা শাস্ত্রে অত ক'রে ব'লে গেছে। ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু ও যাজকের profession-এর (বৃত্তির) চাইতে honourable

profession (সম্মানীয় বৃত্তি) আর হ'তে পারে না। এর প্রত্যেকটা পয়সা মানুষের বুকভরা টানের তোড়ে দেওয়া—এ কত পবিত্র, চাকুরীর পয়সার সঙ্গে এর তুলনা হয় না।

২৪শে মাঘ, ১৩৪৬, বুধবার (ইং ৭।২।১৯৪০)

বাঁধের ধারে তাসুতে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর এক মৌলভী সাহেবের সঙ্গে বিকালে আলাপ করছিলেন—পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীদের কথা রসুল কত ক'রে ব'লে গেছেন—এমন কি বলেছেন শুনেছি, এত prophet (প্রেরিতপুরুষ) আসবেন, যাঁদের সবার নাম দেওয়া সম্ভব নয়। এও নাকি বলেছেন—যে প্রেরিতপুরুষদের মধ্যে প্রভেদ করে এবং একজনকে ছোট ক'রে আর-একজনকে বড় করতে চায় সেই কাফের। বাপের হয়তো পাঁচ ছেলে আছে—তাদের একজনকে বাপের ছেলে ব'লে সম্মান দিলে, অন্যদের তাঁর ছেলে ব'লে স্বীকার করলে না, এতে বাপকেই কি খাটো করা হ'লো না? পৌত্রের মধ্যে যদি ঠাকুরদাকে দেখতে না পেলে তবে ঠাকুরদাকেই দেখা হয়নি। পৌত্রের মধ্যে ঠাকুরদা আছেন—পরবর্ত্তীর মধ্যেও পূর্ব্ববর্ত্তী আছেনই। টিকা-টিপ্পনীই সর্ব্বনাশ করে, সোজা কথাটা ঘুরিয়ে বাঁকা ক'রে ফেলে। আদত জিনিসটা বোঝা যায়। সেখানে কোন গরমিল নেই। ব্যাখ্যার কের্দ্দানিতেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। একদল আছে, তারা খোদাকে মানে কিন্তু রসুলকে মানে না—এমন অসম্ভব কথাও মানুষ কয়? হজরত রসুল, হজরত ঈশা, হজরত বুদ্ধের মধ্যে অনেকে আবার পার্থক্য করে—এর চেয়ে ভুল আর নেই।

রাত্রিতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাঙ্গলায় যে কয়টা Division (বিভাগ) আছে, সেই কয়টা University (বিশ্ববিদ্যালয়) হওয়া দরকার। এক-এক ঋষির নামে এক-একটা University (বিশ্ববিদ্যালয়) হবে। তাঁদের work revive (কাজ পুনরুদ্ধার) করা, সেই সম্বন্ধে research (গবেষণা) করা,—তাঁদের idea popularise করা (মত সাধারণের ভিতর প্রচার করা) হবে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য—অন্যান্য সব বিষয়ও পড়ান হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুতে যাবার আগে বললেন—আজ ইষ্টভৃতি-সম্বন্ধে আট-দশটা ছড়া দিয়েছি।

প্রফুল্ল—আপনি যে movement (আন্দোলন) করতে চাচ্ছেন—ইষ্টভৃতি তার একটা মস্ত factor (উপাদান)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাভারতের সময়ও নাকি যাজন ও লোকশিক্ষার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছিল; ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যুর উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায় শুনেছি।

প্রফুল্ল—আপনার movement (আন্দোলন)-এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের movement (আন্দোলন) সবদিক থেকে মেলে, যেন parallel movement (প্রতিরূপ আন্দোলন), politics-এর (রাজনীতির) কথা পর্য্যন্ত বাদ যায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেলে নাকি? আমি ইচ্ছে ক'রে কিন্তু কিছুতে হাত দিইনি, সব evolve করছে (উদ্ভিন্ন হয়েছে), কেমন ক'রে যেন এসে পড়ছে।

১০ই আষাঢ়, ১৩৪৭, সোমবার (ইং ২৪।৬।১৯৪০)

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এবং অন্যান্য সকলে সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে যুদ্ধের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে চৌকিতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—যা' আরম্ভ করা হয়েছে যদি propagate (প্রচার) করার সময়টুকু পাওয়া যায়, এর মধ্যেই যদি কিছু বিপর্য্যয় না ঘটে তবে এই হ'য়ে দাঁড়াবে the world-rescue (জগৎ-উদ্ধারের পথ)। আর, এটা খুব normal (স্বাভাবিক), utopian (কাল্পনিক) কিছু নেই এতে। Bengal (বাংলা) যদি একটা unit হ'য়ে দাঁড়ায়, Bengal (বাংলা) যদি ঠিক হয়, তখন সহজেই আর সব হ'য়ে যাবে। ভারত এক লহমাতেই জগতের গুরু হ'তে পারে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে কথাবার্ত্তা বলছেন—এমন সময় দূর থেকে শ্রীযুত হেম চৌধুরীকে দেখামাত্র চকিতে নল ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে 'দাদা' ব'লে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন। তিনি একখানা চেয়ারে বসার পর নিজে বসলেন।

১১ই আষাঢ়, ১৩৪৭, মঙ্গলবার (ইং ২৫।৬।১৯৪০)

সকালবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট ঘরে ব'সে বলছিলেন—ইষ্টভৃতি জিনিসটা আগে ছিল, স্বস্ত্যয়নী জিনিসটা আমি গুছিয়ে দিয়েছি—স্বস্ত্যয়নীর form (স্বরূপ)-টা দিয়েছি, এটা সেদিক থেকে নতুন, আগে থাকলেও বোঝা যেত না। ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী যদি করে তবে দেখিস্, দুই-এক পুরুষের মধ্যে কী হ'য়ে যায়। দুই-এক পুরুষ পরে বোঝা যাবে।

ইষ্টভৃতিতে পুরুষকার ও দৈবের যোজন হয়—এর মানে জানতে চাইলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পুরুষকার হ'লো motor part (শিল্পী-অঙ্গ) এবং দৈব হ'লো sensory part (অনুভূতি-অঙ্গ)। ইষ্টের জন্য কতকগুলি করা হ'লে— করার যে accumulated effect (সঞ্চিত ফল) তা' আমাদের বোধে ধরা দেয়—অর্থাৎ

কতকগুলি অজানা জানা হ'য়ে আসে এর ভিতর-দিয়ে, তার ফলে সেই জানা-মাফিক পরে কাজ করতে সুবিধা হয়। ইষ্টানুগ বোধ, অভ্যাস ও প্রেরণা তদনুগ কর্ম্মেই প্রবৃত্ত করে। এইভাবে চলে।

প্রশ্ন করা হ'লো—যে-কোন কাজ করা হোক না কেন, তারই তো effect (ফল) আছে—শুধু ইষ্টভৃতি কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের কোন principle (আদর্শ) নেই—তারা ধরতে পারে না, effect (ফল)-টা কাজে লাগাতে পারে না, তাদের experience (অভিজ্ঞতা) হয় না। কারণ, প্রবৃত্তি তাদের নাকে দড়ি দিয়ে যখন যে-ভাবে চালায়, তারা সেইভাবে চলতে বাধ্য হয়। বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে সত্তাপোষণী রকমে চলতে পারে না।

১২ই আষাঢ়, ১৩৪৭, বুধবার (ইং ২৬।৬।১৯৪০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে Philanthropy Office (সৎসঙ্গ অফিস)-এ এসে বসেছেন। কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক town (সহর) থেকে এসেছেন। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার claim (দাবী) কী? Jesus, Mohammed (যীশু, মহম্মদ) সকলেই তো তাঁদের claim (দাবী) জানিয়েছিলেন, আপনার কি তেমন কোন claim (দাবী) আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি claim (দাবী)-ফ্রেইম বুঝি না—তিনি যা' বলান, করান—তাই বলি, করি। আমি হ'লাম ঢাকের বাঁয়ার মতো।

১৮ই আষাঢ়, ১৩৪৭, মঙ্গলবার (ইং ২।৭।১৯৪০)

বরিশালের অতুলদা (গুহ), অক্ষয়দা (পূততুণ্ড) প্রমুখ এবং কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও আরো ক'জন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নানাকথা বলছেন—পুরুষের অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ ও বহু বিবাহ একান্ত দরকার। বহুবিবাহ হ'তে সুরু করলে নিকৃষ্ট পুরুষেরা মেয়ে পাবে না, ফলে অন্য সমাজ থেকে অনুলোমক্রমে মেয়ে আহরণ কবতে চেষ্টা করবে, এতে সমাজ পুষ্টই হ'তে থাকবে—সমাজের আত্মীকরণ ও আপ্তীকরণ-ক্ষমতাও বেড়ে যাবে।

একটু পরে আবার বললেন—হজরত যীশু, হজরত মহম্মদ আমাদেরও prophet (প্রেরিতপুরুষ)। আর্য্যধারা যদি জীবন্ত থাকত, তাহ'লে হজরত যীশু, হজরত মহম্মদ হয়তো একাদশ অবতার, দ্বাদশ অবতার ব'লে পরিগণিত হ'তেন। Anti-Biblism (বাইবেল-বিরোধী), Anti-Quranism (কোরাণ-বিরোধী), Anti-Vedism (বেদ-বিরোধী)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার নিরাকরণ করতে হবে। শাক্ত বিপ্র এবং

বৈষ্ণব বিপ্র-পরিবারে যেমন বিয়ে সাদির কোন নিষেধ নেই—সৌর বিপ্র ও গাণপত্য বিপ্রে যেমন বিয়ে চলতে পারে, ইষ্ট, কৃষ্টি ও পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যবাহী রসুল-ভক্ত বিপ্র, বুদ্ধভক্ত বিপ্র, খ্রীষ্টভক্ত বিপ্রের সঙ্গেও তেমনি বিধিমাফিক বিয়ে-থাওয়া হ'তে পারে—এতে কোন বাধা নেই। কারণ, স্বধর্ম্ম ও কৃষ্টি-নিষ্ঠ থেকে যে-কোন পূরয়মাণ মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধানতি নিয়ে চলা ধর্ম্মের পরিপন্থী তো নয়ই বরং পরিপোষক। তবে প্রত্যেকটি বিয়ের ব্যাপারে খুব হিসাব ক'রে চলতে হবে, যাতে কোন রকমের ব্যত্যয়ী কিছু বা প্রতিলোম-সংস্রব কিছুতেই না ঘটে।

১৯শে আষাঢ়, ১৩৪৭, বুধবার (ইং ৩। ৭। ১৯৪০)

অক্ষয়দা (পূততুণ্ড), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আরো অনেকে সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Organisation-এর (সংগঠনের) জন্য ভালো লোকের দরকার। Active (কর্ম্মঠ), sincere (বিশ্বাসী) এবং commonsense (সাধারণ জ্ঞান)-ওয়ালা লোকই organisation (সংগঠন)-এর উপযুক্ত। Organisation-এর instinct (সংস্কার) আমাদের মধ্যে ঢোকা চাই—একজনে হয়তো তোমাকে অযথা কিছু বলল—অমনি যদি আর-একজন এসে তাকে ধরে, তাকেই বলে organisation (সংগঠন)। প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য feel (বোধ) করবে, প্রত্যেকে নিজের কাজ করবে, প্রত্যেকে প্রত্যেককে help (সাহায্য) করবে। এটা বোঝা চাই, কেউ যদি affected (ব্যাহত) হয়, সে নিজেও তা'তে affected (ব্যাহত) হ'চ্ছে। সে তার স্থান ছেড়ে out of inferiority (হীনত্ব-পরবশতায়) অন্য কেউ হ'তে চাইবে না, সগৌরবে তার দায়িত্ব সম্পাদন ক'রে অন্য সবার সুবিধা ক'রে দেবে। আমাদের এই body-system (শরীর-বিধান)-এর মতো হওয়া চাই—চোখ চোখই থাকে, চোখ কখনও কান হ'তে চায় না, কানও চোখ হ'তে চায় না—তাহ'লে গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। প্রত্যেকটা part (অঙ্গ) প্রত্যেকটা part (অঙ্গ)-কেই help (সাহায্য) করে, নিজের কাজ ক'রে যায়; জানে, তা' হ'লে সমগ্র শরীর নিয়ে নিজেও দুর্ব্বল হবে—মারা পড়বে। এতখানি automatic (স্বতঃ) হওয়া চাই।

২৮শে আষাঢ়, ১৩৪৭, শুক্রবার (ইং ১২। ৭। ১৯৪০)

অরুণ (জোয়ার্দ্দার) খুব অন্যায় করার দরুন শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বেশ ক'রে পিটুনি দিয়ে দিলেন। সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের রাগ দেখে ভয়ে জড়সড়। পরক্ষণেই শ্রীশ্রীঠাকুরের শান্ত-সৌম্য ভাব ফিরে আসল—তখন তাঁকে দেখে আর বোঝার জো নেই যে একটু আগেই তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেছিলেন।

রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার—অরুণের বাবা) এলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বার-বার বলতে লাগলেন—মা-বাপের উপরই সব-কিছু নির্ভর করে। যখন শাসন করার দরকার, তখন শাসন করে না। যখন নিজের অসুবিধা হয়, নিজে বিরক্ত হয় তখন সহ্য করতে না পেরে রাগের বশে অযথা শাসন করে। আমরা ছেলেপেলের মঙ্গল চাই না। বাপ ছেলেকে শাসন করলে মা হয়তো তাকে গালাগালি দেয়, তারপর ছেলের সামনেই হয়তো বাবা মাকে মারতে যায়, মা বাবাকে গালাগালি দেয়। এ-রকম আবহাওয়ায় ছেলেপেলে কি ভাল হ'তে পারে? ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হ'য়ে যায়। লেখাপড়া হোক বা না হোক, ছেলের অভ্যাস, ব্যবহার, ঝোঁকটা ঠিক ক'রে দিতে পারলেই হ'লো। ৪/৫ বৎসরের মধ্যেই ঐটা তৈরী ক'রে দিতে হয়, যত বেশী বয়স হয় ততই অসুবিধে। ৪/৫ বৎসরের মধ্যে না হ'লে ৮/১০ বৎসর, তা' না হ'লে ১২/১৪ বৎসরের মধ্যে ঠিক করতে হয়। এরপর আর হ'য়ে ওঠে না। Guardian (অভিভাবক), মা, বাপ যদি ছেলে তৈরী ক'রে না দেয়, কোন মাষ্টারে কিছু করতে পারে না।

পরে সন্ধ্যাবেলায় একটা ছড়া দিলেন—ছড়াটা সেই ছেলেটির জন্য দিয়েছেন, সে-কথাও পরে বললেন। কেমনভাবে তাকে মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলা যায়, তার মা-বাবার সঙ্গে সে-বিষয়ে কত আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। অতঃপর কেষ্টদার কাছে ছেলেটির ভার দিলেন। আমাদের মানুষ ক'রে তুলবার জন্য তাঁর কত না দরদ, কত না চিন্তা!

এক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন—যারা ঠিকমতো চলে না, তাদের আপনি স্থান দেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা হ'লো fallen sons (হতভাগা সন্তান), আর আমি হলাম তাদের foolish father (বোকা পিতা)। ভাবি, একদিন-না-একদিন ওরা যদি মানুষ হয়, ফিরে দাঁড়ায়।

২৯শে আষাঢ়, ১৩৪৭, শনিবার (ইং ১৩।৭।১৯৪০)

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত কতকগুলি ছড়া পড়ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটা ছড়ার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বললেন—কারো অদ্রোহ প্রতিষ্ঠা হ'লে সে শত্রুদের মধ্যে সহজেই মিল করতে পারে।

সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ-সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—সর্ব্বজ্ঞত্ববীজের রকমটা অনুসন্ধিৎসার ফলে যার মধ্যে ফুটে ওঠে, সে যে-কোন অবস্থাকেই তার নিজের favour (আয়ত্ত)-এ নিয়ে আসতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এটা খুব স্পষ্ট দেখতে

পাওয়া যায়—তাঁর সব জীবনটা যেন একেবারে ভগবান। আর, সব কিছুর এমনতর অনুকূল নিয়ন্ত্রণই organisation (সংগঠন)।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছড়াগুলির minimum conception (ন্যূনতম বোধ) যদি প্রত্যেক পরিবারে থাকে এবং তা'রা কাজের ভিতর-দিয়ে যদি তা' অনুসরণ করতে চেষ্টা করে, তবে আর কিছু লাগে না।

সরোজিনীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের খোকা সিনেমা দেখতে চাচ্ছে, কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, যেতে দিয়ে কাজ নেই।

তার একটু পরেই অরুণ এল। তাকে দেখে বললেন—দ্যাখ্, যতদিন এখানে সিনেমা না গ'ড়ে তুলতে পারবি, ততদিন সিনেমা দেখতে যাবি না—কেষ্টদা কিংবা তোর মা যদি নিয়ে যেতে চায় এবং না গেলে দুঃখিত হয়, তখন ছাড়া।

অরুণও খুশি হ'য়ে রাজী হ'লো। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—ওকে সদাচারগুলি শেখাবেন, সন্ধ্যাটাও যেন রীতিমতো করে।

৩১শে আষাঢ়, ১৩৪৭, সোমবার (ইং ১৫। ৭। ১৯৪০)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে তাসুতে ব'সে হাসতে-হাসতে বলছিলেন—ছড়াগুলির হয়তো কত আদর হবে, স্কুলের পাঠ্য হবে, এর কত ব্যাখ্যা হবে, আবার জন্মগ্রহণ করলে সেগুলি পড়তে হবে। হয়তো ব্যাখ্যা বুঝতে পারব না, মার খেতে হবে মাষ্টারের কাছে—সেইজন্যই কি এইগুলি লিখছি!

কেষ্টদা মনুসংহিতা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন—"স্ত্রী আয়-ব্যয় সমস্ত বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—বউ হওয়া কি সোজা কথা, সুধা এদিক থেকে অনেকখানি। রুক্মিণীর কথা শুনেছি, সে নাকি এমনভাবে সব ঠিক ক'রে রাখত যে, কেষ্টঠাকুরের কিছু ভাবতেই হ'তো না। Josephine (যোশেফাইন—নেপোলিয়ানের স্ত্রী)-ও শুনেছি, যুদ্ধের জন্য funds (অর্থ) পর্য্যন্ত collect (সংগ্রহ) করত।

পরে কথায়-কথায় কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তো experience (অভিজ্ঞতা) থেকে সব কথা বলেন, কিন্তু এত কী-ক'রে মনে থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে কি আর থাকে, মনে পড়ে—line (সূত্র) বাঁধা আছে, একটাব সঙ্গে-সঙ্গে তার সব কথা এসে পড়ে, সব বোধ করা কিনা, এ তো fact (মর্ম্মকথা) —তাই একে বিজ্ঞান বলে। এর একটা কথার গণ্ডগোল হ'য়ে গেলে সব গণ্ডগোল

হ'য়ে যাবে। যা'-যা' নিয়ে একটা কিছু হয়, অন্যান্য সবটার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মায় mechanism (কলাকৌশল) শুদ্ধ motto (ছড়া)-গুলিতে দেওয়া হয়েছে। এ সত্ত্বেও যতদূর পারি, সহজ করতে চেষ্টা করেছি বরাবর।

সন্ধ্যাবেলায় প্রফুল্লকে ডেকে বললেন—দুটো জিনিস—Ideal (আদর্শ) ও Eugenics (বিবাহ-বিধি) ঠিক থাকলে balance (সমতা) ঠিক থাকে।

একটু পরে গম্ভীরভাবে নিশ্চয়তার কণ্ঠে বললেন, দ্যাখ্, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপর হ'য়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ক'রে যাওয়াই সব, এর জেল্লা যার যত বেশী এবং বৃত্তি যার যত নিয়ন্ত্রিত—সেই তত বড়। যারা বড় হয়েছে তারাই কোন-না-কোনভাবে এটা করেছে।

অনেক রাত্রে একটি দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটি অভিযোগ জানাতে আসেন। তখন সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ভাইকে শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকে পাঠান। তারা আসলে অভিযোক্তাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—যখন শুনেছিলে তখনই শুনে নেওয়া উচিত ছিল, সত্যি ব্যাপারটা কী, মিটমাট ক'রে ফেলা উচিত ছিল। তিন মাস ধ'রে তোমার মনের মধ্যে এ-সব অনুযোগ মজুত হ'য়ে তোমার মাথা গরম হয়ে উঠেছে, মানুষের কথায় বিশ্বাস করতে-করতে তোমার বিশ্বাস সহজ হ'য়ে গেছে। এখন সবই তুমি বিশ্বাস করতে পার! কেউ যদি বলে যে আমি তোমার সর্ব্বনাশ করতে চাচ্ছি, তা' তুমি বিশ্বাস করতে পার, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে সে-কথা কেউ বললে আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

সংশ্লিষ্ট একটি দাদাকে বললেন—পরের কাছে শুনেই তুমি চ'টে গেলে। কিন্তু বেকুব! তুমি বিনীতভাবে সব কথা ওকে গিয়ে খুলে বলতে পারলে না? তা' না ক'রে অযথা যার-তার কাছে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করতে লাগলে। এটা ভাল করনি।

আর-একজনকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—এরা এমন হয়েছে যে, একজনের কথা আর একজনকে এমন ক'রে বলবে যা'তে বিরোধ বাধে, পরস্পরের মধ্যে মিল যা'তে হ'তে পারে সেদিক দিয়ে যাবে না—এই রকমটাই সংহতি নষ্ট করে। অমিলের নিরসন ক'রে মিল করতে পারাই তো কৃতিত্ব। সেই বুদ্ধি যদি না গজায়, সকলেরই ক্ষতি।

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৭, সোমবার (ইং ২০।৭।১৯৪০)

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুত অনাথ চৌধুরীর জন্য আজ নিজেই অর্থ-সংগ্রহে বেরিয়ে ছিলেন। টাকা চাইবার সে কী অপূর্ব্ব ভঙ্গী! তিনি চাইলে দিয়ে যেন মানুষ কত তৃপ্তি বোধ করে, শত অসুবিধা-সত্ত্বেও কেউ 'না' বলে না, যেমন ক'রে হোক কিছু যোগাড় ক'রে দেয়ই।

বিকালে হঠাৎ প্রফুল্লকে বললেন—কেষ্টদার জন্য যদি বি-এ পাশ assistant (সহকারী) যোগাড় ক'রে দিয়ে তুই আর বীরেন তপোবনে যাস, তাহ'লে এখনই আরম্ভ ক'রে দিতে পারি। Education (শিক্ষা) কা'কে বলে দেখে নেব। তোরা সব research (গবেষণা) করবি—কেষ্টদা মাঝে-মাঝে যাবে—'শিক্ষা-প্রসঙ্গে' একখানা বেরিয়ে যাবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর খবরের কাগজ পড়া শুনলেন।

৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৭, সোমবার (ইং ২২। ৭। ১৯৪০)

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর খেয়ে আসবার পর বাঁধের ধারের তাসুতে অনেক কথা হ'লো। মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন খাওয়ার অপকারিতা-সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন।

তারপর বলতে লাগলেন—ইংরাজীর প্রতি সবার কেমন একটা ঝোঁক রয়েছে। 'নানাপ্রসঙ্গে' যদি ইংরাজীতে বের হ'তো তাহ'লে সবাই বেশী পড়তো, আলোচনা করতো। বাঙ্গলায় যে-সব বিশ্লেষণ ক'রে দেওয়া হয়েছে তা'তে যেন ভাল লাগে না, মাথায় ধরে না, বোধগুলিও বাঙ্গলায় প্রকাশ না ক'রে ইংরাজী শব্দেই বলে, বাঙ্গলা ভাষায় যেন stimulus পায় না। Stimulus ব'লে ফেললাম—'উত্তেজনা' কথা ব্যবহার না ক'রে stimulus কথা ব্যবহারেই যেন মন সাড়া দেয়; বাঙ্গলা ভাষায় যথাযথভাবে সাড়া নিতে ও দিতে আমরা অভ্যস্ত হ'তে পারিনি, একেই বলে cultural conquest (কৃষ্টিগত পরাভব)।

কেষ্টদা বললেন—আমার মনে হয়, বাঙ্গলা ভাষা তত developed (পুষ্ট) নয়, অনেক সূক্ষ্ম ও বিচিত্র বোধ ও ভাবের চর্চ্চা বা পরিচয় বাঙ্গলা ভাষায় হয়নি। আপনার 'সৃজন-প্রগতি' বলতে গিয়ে ইংরাজীতে একটা শব্দও coin (উদ্ভাবিত) করা দরকার হয়নি, কিন্তু বাঙ্গলায় কত শব্দ coin (উদ্ভাবন) করতে হয়েছে—অবশ্য বাঙ্গলায় যেটা দিয়েছেন সেইটাই বেশী accurate (যথাযথ)। Stimulus কথাটার যতগুলি facet ও phase (দিক) আছে, 'উত্তেজনা' এই শব্দের তা' নেই।

তখন অনুভূতির বর্ণনা, সৃজন-প্রগতি ইত্যাদি-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতদূর বলা যায়, তা' আমি বলেছি, কিছু বাদ রাখিনি। এখন বোধহয় আর অমন বলতে পারি না। ভাবি, কেমন ক'রে বললাম। কেষ্টদা তো বললেন, Science and Religion blended (বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম মিশ্রিত) হ'য়ে গেছে—কোন পার্থক্য নেই। এত বললাম, বোধ করলাম, কিন্তু আমার যে কিছু-একটা হ'লো তা' মনে হয় না, আমি যা' ছিলাম তাই আছি।

প্রফুল্ল—আপনার কি কিছু নূতন লাগে না? কিছু পেলেন বা হ'লেন ব'লে বোধ করেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, কিছুই না, একই রকম। কেষ্টদা, আপনি যে এম-এ পাশ করেছেন তা'তে কিছু হয়েছেন ব'লে মনে হয়?

কেষ্টদা—না।

প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর?

প্রফুল্ল—না তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ রকম! আমাকে যদি কেউ বিশেষ মর্য্যাদাসূচক কিছু বলতো, আমার কিছুই মনে হ'তো না। তবে ভাবতাম, মা যেন শোনেন। মাকে তাক লাগিয়ে দেওয়া—এই ছিল আমার ব্যবসা। এই ছাড়া কোন ব্যবসা আমি জীবনে করিনি। মা আবার আমার সামনে কিছু বল্‌তেন না। খ্যাপাকে (শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) ডেকে-ডেকে জিজ্ঞাসা করতাম, মা কী বলে-টলে। খ্যাপা বলতো, ধান-চালের কথা, জায়গা-জমির কথা, আমার কথা কিছু বলত না। জিজ্ঞাসা করতেও পারি না, অথচ মনে-মনে লোভ—মা আমার কথা কী বলেন একবার শুনি। সারা দুনিয়া আমার প্রশংসা করুক তা'তে আমার কিছু আসে যায় না, আমি কেয়ারও করি না, মা'র খুশি ছাড়া কিছুতেই যেন খুশি বোধ করতে পারতাম না, মা'র কাছ থেকে কিছু না পেলে মন সাড়া দিত না। কাগজগুলি বের হ'লে মা'র কাছে দিতাম, মা প'ড়ে কী বলে; মা'র বাহবা পেলেই হ'ল। মা গিয়ে জীবনের কোন সার্থকতা নেই। মা কেবল বলা আরম্ভ করেছিলেন—তোরে দিয়ে আমার সব আশা পূর্ণ হয়েছে, আর কিছু বাকি নেই। তখন মা'র অবস্থার জন্য মন খারাপ, তাই ও-কথাতেও তত আনন্দ বোধ করতে পারিনি।

প্রফুল্ল—মনের গভীরে গেলে আমরা তো কেমন benumbed (অবশ) হ'য়ে পড়ি, কাজকর্ম্ম করতে পারি না, দুটো একসঙ্গে চলে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একসঙ্গেই তো চলে, আমি তো তাই করেছি, করছি।

প্রসঙ্গক্রমে ভাববাণী ও অনুভূতি-বর্ণনার তুলনা ক'রে বললেন—এ দুটোর মধ্যে অনুভূতির বর্ণনাই ভাল, এতে বোধ বেশী, মুগ্ধীভাব কম, কিন্তু সমাধি-অবস্থায় মুগ্ধীভাব বেশী, বোধ কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—যদি মানুষের কিছু জ্ঞান হয় আমার কথা দিয়ে, তার জন্য কৃতিত্ব আপনারই, আপনিই সব আমার ভেতর থেকে বের করেছেন।

'কথাপ্রসঙ্গে' তাড়াতাড়ি ছাপানোর জন্য কেষ্টদাকে বললেন।

কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—বেদাভ্যাস কোন্‌টাকে বলব, করতে হবে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যেমন আপনি মনুসংহিতা পড়েছেন, মনুসংহিতার নীতিগুলি বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজে কেমন ক'রে প্রয়োগ করা যায় তা' ভাবছেন, করছেন—

একেই বলে বেদাভ্যাস। বেদাভ্যাস মানে ঋগ্বেদ-যজুর্বেদ ইত্যাদি শুধু পড়া নয়। বেদ মানে recorded experience (লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা), বেদাভ্যাস মানে সেই experience (অভিজ্ঞতা) জেনে নিয়ে কাজে লাগিয়ে তারপর মিলিয়ে দেখা।

প্রফুল্ল—জাতিস্মরতার মধ্যে অদ্রোহের স্থান কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্রোহভাব থাকলে মন obsessed (আবিষ্ট) হ'য়ে থাকে, নানারকম ভাবের উদয় হয়, সবটার expression (ভাব) দেওয়া যায় না, repression (নিরোধ) হয়—এতে জাতিস্মরতার ব্যাঘাত জন্মায়। ...... যারা অত্যাচারে-অত্যাচারে আমার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে, তুলছে, তাদের কথা মনে হ'লে ভাবি, ওদের উপর রাগ করলে যদি ওদের কোন ক্ষতি হয়, মারা যায়, তাই অমনি মনে আসে—Let them enjoy their little days, their lowly bliss receive, Oh do not take lightly away the life—thou canst not give. (তারা তাদের স্বল্প দিনগুলি উপভোগ করুক। তাদের অকিঞ্চিৎকর আনন্দ উপভোগ করুক, যে-জীবন তুমি দিতে পার না—তা' অতি তুচ্ছভাবে তুমি নষ্ট ক'রো না।)

ওদের প্রয়োজনের সময়ে ওরা কিছু চাইলে তখন ভাবি—Thy necessity is greater than mine. (তোমার প্রয়োজন আমা-অপেক্ষা বড়), যা' চায়, না দিয়ে পারি না!

৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৭, মঙ্গলবার (ইং ২৩।৭।১৯৪০)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সকালে বনবিহারীদাকে (ঘোষ) দুঃখ ক'রে বলছেন—জয়পুর state-এ কত পুরোনো পুঁথি আছে, আয়ুর্বেদ-সম্বন্ধে এমন গ্রন্থ আছে যা' এ পর্য্যন্ত published (প্রকাশিত) হয়নি। রাজ-রাজড়া মানুষ, ইচ্ছা করলেই ওরা এগুলি বের করতে পারে। তা'তে মানুষের কত উপকার হয়। দেশের কী অবস্থা যে হয়েছে, মানুষের কী যে বুদ্ধি!

বৈকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—আমাদের দেশে যে population (লোকসংখ্যা) তা'তে ইণ্ডিয়া থেকে ৫/৭ কোটি গণসেবক-বাহিনী সংগ্রহ করতে পারলে ভাল হয়। তারা দেশের স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি ও নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকবে। তারা যদি সবদিক থেকে সুশিক্ষিত, সংহত ও সক্রিয় হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে ভারতের তো উন্নতি হবেই, সকলেই উপকৃত হবে।

বনবিহারীদা কথাচ্ছলে প্রশ্ন করলেন—সুভাষ বোস কর্পোরেশনে মুসলমানদের সঙ্গে co-operation (সহযোগিতা) করবার যে policy (কৌশল) করেছেন, সেটা ভাল নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Co-operation তো ভালই, কিন্তু principle (আদর্শ) যদি sacrifice (বিসর্জ্জন) করতে হয় তার জন্য, তা'তে কোন লাভ নেই। অবশ্য সুভাষবাবুর ক্ষেত্রে এ-কথা হয়তো প্রযোজ্য নয়। তবে তথাকথিত উদারনৈতিকতা দিয়ে কিছু হয় না, principle-এ (উদ্দেশ্যে) যারা fanatic (অচ্যুত) হয়, তারাই কিছু করতে পারে। আমরা অনেক সময় personal gain-এর (ব্যক্তিগত লাভের) জন্য community (সম্প্রদায়)-কে sacrifice (বিসর্জ্জন) করি, কিন্তু আদর্শে অনুরাগ থাকলে তা' করা যায় না। মুসলমানদের মধ্যে প্রতিলোম ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তাদের এক "লায় লাহেল্লা ......" থাকার দরুন সমাজটা খানিকটা integrated (সংহত) হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু পূরয়মাণ আদর্শে সংহত হওয়ার বাণী সৃষ্টির প্রথম উষায় ঋষিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হওয়া সত্ত্বেও—তাঁদেরই সন্তান আমরা তা' জানি না, মানি না—তাই যা' হবার তাই হ'চ্ছে। আর, প্রতিলোম যা' সমাজে চলছে, এতে আর সর্ব্বনাশের দেরী নেই। জাতকে ধ্বংস করতে হ'লে শুধুমাত্র প্রতিলোম ঢুকিয়ে দিয়েই তা' হ'তে পারে। এখন তোমাদের যে principle (আদর্শ ও নীতি) আছে, সেইটে যদি জোরসে চালাতে পার, তাহ'লেই নিস্তার।

বনবিহারীদা নিজে-নিজে বললেন—তাহ'লে আমাদের নিজেদের খুব fanatic (অচ্যুত) হ'তে হবে। হিন্দু ব'লেও কথা নয়, মুসলমান ব'লেও কথা নয়, সকলকেই সত্যিকার ধর্ম্মপরায়ণ করে তুলতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ওই ঠিক বলেছিস্।

শ্রীশ্রীঠাকুর সতীশদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—নূতন Register-এ ২৫,০০০ সৎসঙ্গী হয়নি?

সতীশদা (দাস)—অনেক বেশী হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তো এক লাখের উপর হয়েছে। এগুলি যদি organised (সুব্যবস্থিত) হ'তো, তাহ'লে কী বিরাট হ'য়ে যেত। এদের চেষ্টায় অসৎ যা' তা' নিরুদ্ধ হ'তো, সৎ-এর উদ্বর্দ্ধন হ'তো, সকলেরই বাঁচার পথ পরিষ্কার হ'তো।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের সময় হ'য়ে গেছে, কিন্তু তবু তিনি উঠছেন না। বার-বার উঠতে বলায় বললেন—ওরা টাকা নিয়ে আসুক। (শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরায় তিনি একজনকে ১৭৫ টাকা সাহায্য করবেন ব'লে মনস্থ করেছেন এবং ৭ জনকে ২৫ টাকা ক'রে সংগ্রহ করতে বলেছেন)।

মায়া মাসীমা বলছেন—কতক্ষণে টাকা নিয়ে আসবে ঠিক কি? তুমি বরং খেয়ে নাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুখে কিছু না-বললেও আমি ভাবছি, খাবার আগে দেব। তাই না দিয়ে উঠি কী-করে?

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৭, মঙ্গলবার (ইং ১৩।৮।১৯৪০)

আট-নয় দিন পূর্ব্বে ট্রেন-দুর্ঘটনায় সর্ব্বজনপ্রিয় গোপালদা (শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, সৎসঙ্গের সেক্রেটারী এবং ঋত্বিগাচার্য্য-সচিব) এবং দুর্গাদা (দুর্গাচরণ সরকার, সৎসঙ্গের বিশিষ্ট কর্ম্মী) মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই সংবাদ পাওয়ার পর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃসহ শোকে ও দুঃখে অভিভূত হ'য়ে পড়েন। তাঁর অবিশ্রান্ত আর্ত্ত ক্রন্দন, করুণ বিলাপ ও বুকফাটা আর্ত্তনাদে আশ্রমের আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। শ্রাবণের দুর্য্যোগের সঙ্গে এক গভীর বিষাদের কালো ছায়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। দিনরাত কাঁদতে-কাঁদতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ ফুলে ওঠে, গলা ভেঙ্গে যায়। তবু কান্নার বিরাম নাই। যিনি সবার সান্ত্বনা, তিনি আজ শোকে অধীর, তাঁকে সান্ত্বনা দেবে কে? তাঁর এই অবস্থা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে গোপালদার মা ও মাসীমারা এসে বললেন—গোপালী! আমরা যে তোমার এ অবস্থা আর চোখে দেখতে পারি না। আমাদের মুখ চেয়ে তুমি শান্ত হও। কী আর করবে? ভাগ্যে যা' ছিল তা' হয়েছে। এখন তুমি ভাল না থাকলে, কার মুখ চেয়ে আমরা দাঁড়াব?

তাঁদের নিরন্তর প্রবোধনায় শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে-ধীরে শান্ত হ'লেন। আজ ২/৩ দিন হ'লো স্বাভাবিকভাবে কথাবার্ত্তা বলছেন। আজ সকালে তাসুতে ব'সে আছেন। সম্মুখের দিগন্তবিস্তৃত চরে জলের ঢল নেমেছে। মাঝে-মাঝে উদাস-দৃষ্টিতে সে-দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। এমন সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। কেষ্টদা মনোবিজ্ঞান-সম্বন্ধে একখানা নতুন বই পড়ছেন। সেই-সম্বন্ধে গল্প সুরু করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বললেন—অতীতকে আমরা সবসময় ব'য়ে নিয়ে চলেছি। অতীতের ভাল-মন্দ কিছুই আমাদের ছাড়ে না। আপনার পিতৃপুরুষ বংশ-পরম্পরায় যে-সব আচার-অনুষ্ঠান ও কর্ম্ম করেছেন, তার ভিতর-দিয়ে আপনার বংশে বিশেষ কতকগুলি instinctive-trait (সহজাত গুণ)-এর সৃষ্টি হয়েছে। সেইগুলির উপর দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। আপনার এই ভিতকে যদি আপনি ignore (উপেক্ষা) করেন, তাহ'লে nowhere (স্থিতিহীন) হ'য়ে যাবেন। তাই family-tradition (পারিবারিক ঐতিহ্য) থেকে deviated (বিচ্যুত) হওয়া ভাল না।

কেষ্টদা—কা'রও family-tradition (পারিবারিক ঐতিহ্য) যদি খারাপ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাস্তবকে তো অস্বীকার করা বা মুছে ফেলা সম্ভব নয়। তাই ভাল-মন্দ যাই থাক, তাকেই mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে হবে towards being and becoming (জীবনবৃদ্ধির দিকে)। এইজন্যই দরকার Ideal (আদর্শ)। আদর্শের সেবায় যা' লাগান যায়, তা' খারাপ হ'য়েও মহা ভাল হ'য়ে ওঠে; আবার, আদর্শের সেবায় যা' লাগে না, যা' নিজ খেয়ালের খোরাক জুগিয়ে চলে, তা' ভাল হ'য়েও

অনর্থের সৃষ্টি করতে পারে। Surrender (আত্মসমর্পণ)-এর ভিতর-দিয়ে কদর্য্য যা', তা'ও সুন্দর হ'য়ে ওঠে, আর তার অভাবে সুন্দর যা' তা'ও কুৎসিত হ'য়ে পড়ে। একজন পণ্ডিত-লোক তার পাণ্ডিত্য দিয়ে যদি কাউকে fulfil (পরিপূরণ) না করে, তার পাণ্ডিত্য বিধবার বিলাসিতার মতো অশোভন ও পীড়াদায়ক হ'য়ে ওঠে। আবার, একজন মহামুখ্যুও যদি মাতৃভক্ত, পিতৃভক্ত ও গুরুভক্ত হয়, তাকে দেখে মানুষের প্রাণ জুড়োয়ে যায়। তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন সমাজ-সংসারের একটা শোভা। এই প্রফুল্ল যদি আমার জন্য বিয়ে করে, আমার জন্য সংসার করে, আমি যেমনটি চাই ঠিক তেমনি করে, তাহ'লে সেইটেই হবে ওর পক্ষে প্রকৃত সন্ন্যাস, আর তা' না ক'রে যদি নিজের খুশিমতো অবিবাহিত জীবনও যাপন করে, তাতে ওর knot (গেরো) ভাঙ্গবে না। যতই ধর্ম্ম করছি ব'লে মনে করুক না কেন, আদতে ফয়দা কিছু হবে না। ...... গোপালের তো কথাই নেই। আমার হাতের লাঠির মতো ছিল, আমার ইঙ্গিত বুঝে চলতে চেষ্টা করত। যেমন ছিল বিদ্যে, তেমনি ছিল বুদ্ধি। তক্ষকের মতো তুখোড় ছিল। আমার চোখের একটা ঈশারা দেখেই বুঝত, কী আমি বলতে চাই। আর, দুর্গাচরণের কথা ভেবে দেখেন। আগে যতই অকাম ক'রে থাক, পরে খুব বদলে গিয়েছিল। বি. সি. চ্যাটার্জ্জী, এস. এন. মোদক—এই সব দরের লোক কত খাতির করতো ওকে। ও কিন্তু তুড়ে যাজন করতো। ঢাক-ঢাক গুড়ু-গুড়ু ছিল না! নাটুকে ভঙ্গীও জানতো খুব। এই হাসতিছে তো এই ঝর-ঝর ক'রে কাঁদে ফেলতিছে। মানুষকে খুব মজায়ে নিতে পারতো। হরেন বোসেরও ঐ ধরণ আছে।

এই সব কথাবার্ত্তার পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনান হ'লো।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—আপনি কিন্তু মাসীমাদের উপর সব সময় লক্ষ্য রাখবেন। সুধা যেন ফুলের (দুর্গাদার স্ত্রী) খোঁজ-খবর রাখে। রেণু (গোপালদার স্ত্রী) ও ফুলের দিকে আমি চাইতে পারি না। বুকখানার ভিতর কেমন যেন ক'রে ওঠে। এখন পরমপিতার দয়ায় কাচ্চাবাচ্চাগুলি ওদের বুক জুড়ে থাকে ও মানুষ হয়, তাহ'লেই হয়।

এই ব'লে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে কাতরস্বরে বললেন, 'দয়াল'।

কিছুক্ষণ পরে স্নান করতে উঠলেন।

৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪৭, মঙ্গলবার (ইং ২০।৮।১৯৪০)

আজ বিকেলে ফকিরবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়—Rajsahi Division-এর Inspector of schools) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের ধারে তাসুতে বসা। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে আব্দারের সুরে বলতে লাগলেন— দেখুন, আপনি এমন একটা

arrangement (ব্যবস্থা) ক'রে দেন যা'তে আমাদের ছেলেদের কোন অসুবিধা না হয়, আর এমনিভাবে করবেন যা'তে আপনার পরে অন্য কেউ তা' উল্টাতে না পারে।

ফকিরবাবু—তা' চেষ্টা করলে এখানে একটা centre (কেন্দ্র) করা যায়। আর, তপোবনের ছেলেদের সম্বন্ধে office (অফিস)-এর impression (ধারণা) এই যে, এখানকার ছেলেরা আগে অন্য school-এ প'ড়ে সেটা গোপন করে, তাই খুব scrutinise করে (খুঁটিয়ে দেখে)। Certificate (সার্টিফিকেট) নিয়ে আসলেই তো গণ্ডগোল থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Certificate (সার্টিফিকেট) যদি আনেও, তাহ'লে due time (উপযুক্ত সময়ে)-এর আগে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন না?

ফকিরবাবু—হ্যাঁ, তা'ও পারা যেতে পারে—যদি কিনা এখানকার shortened course (সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম)-এর special method (বিশেষ নিয়ম) সম্বন্ধে University (বিশ্ববিদ্যালয়)-কে convince (বিশ্বাস) করানো যায়। আমরা হয়তো এসে দেখলাম যে পড়ান খুব ভাল হয়—তা'তে চলবে না, system (ব্যবস্থা) -টাকে satisfactorily (সন্তোষজনকভাবে) explain (ব্যাখ্যা) করতে হবে, and that must be convincing (এবং সেটা প্রত্যয়োৎপাদী হওয়া চাই)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে আমি যখন কেষ্টদা, গোপাল, পঞ্চাননদা, বঙ্কিম ইত্যাদিকে নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, তখন কিন্তু wonderful effect (আশ্চর্য্যজনক ফল) দেখেছি। কতজনেই তো তিন বছরে পাশ করেছে, আর এই যারা পাশ করেছে, তাদের শেখাটাও third rate worth-এর (ওছা) নয়। শিক্ষাপদ্ধতি-সম্বন্ধে যা' বলেছি বা ক'রে দেখেছি, তখন ওরা কিছু-কিছু লিখে রাখত, সবটা লেখা নেই। এখন দেখছি, লেখা না-থাকলে কিছুদিন পর জিনিসটা মাথায় থাকে না। তাই এবার আমি ঠিক করেছি, (প্রফুল্লকে দেখিয়ে) এদের নিয়ে আর দুটো ব্রাহ্মণ M. A. জোগাড় ক'রে নূতন ক'রে আরম্ভ করব, প্রশ্নোত্তরছলে "শিক্ষা-প্রসঙ্গে" ব'লে একখানা বই হ'য়ে যাবে। সেটা convincing (প্রত্যয়-সন্দীপী) হবে কিনা জানি না। কারণ, আমি তো বলব আমার-মতো ক'রে আমার ভাষায়। আমার experience (অভিজ্ঞতা)-গুলি আমি ঢেলে দিয়ে যাব। লেখাপড়া জানি না, মুখ্যু মানুষ, তাই জানি না, কী হবে। তবে আমি দেব আমার যা' আছে—আপনাদের তা' থেকে খুঁজে-পেতে নিতে হবে—আপনাদের রকমের সঙ্গে মিলাতে গেলে পারব না! এখন তো একটু কমেছে, আগে আমি বি-এ পাশ শুনলেই ভয় পেয়ে যেতাম। তবে আমি যা' দিয়েছি সে কেষ্টদার উস্কানীতে। কেষ্টদা যখন বলতে লাগল—'ইংরাজীতে দেন, ইংরাজীতে দেন', আমি তো মনে-মনে হাসতাম, তারপর ফাজলামি ক'রে বলা সুরু করলাম। ওরা বলল—হয়; হয়তো হয়, রোক্ চেপে গেল, যা' মনে আসে বলতে লাগলাম, যেন মেঘগুলি

উড়ে-উড়ে যেত, আমি ধ'রে-ধ'রে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলতাম। হঠাৎ যদি একটা ক'রে word drop (শব্দ প'ড়ে) যেত, তখন জিজ্ঞাসা করলে আর বলতে পারতাম না, তাই নিয়ে ওদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথা ঘামাতে হ'তো। তারপর কেষ্টদা আবার ছড়া চাইল। আমি কি ছড়া বলতে পারি? ছোটবেলায় সবাই যেমন লেখে, আমিও হয়তো কবিতা ২/১টা লিখেছি। কিন্তু ছড়া বলা কি সম্ভব? কেষ্টদার ঠেলায় বলতে আরম্ভ করলাম, বললাম। ওরা তো খুব বলে, দেখেন তো আপনি একটু, আর শোনেন। এই যে এ-সব আমি বলতাম, করতাম—এর পেছনে আমার একটা রস ছিল, মা'র কাছে বাহাদুরি নেবার ইচ্ছা ছিল প্রবল। যা করতাম এই আশায় করতাম—মা শুনে বলবেন, বেশ হয়েছে—সেই ছিল আমার সার্থকতা, আমার পুরস্কার। মা চ'লে গেছেন, এখন আর কোন রস পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে (ভট্টাচার্য্য) ছড়ার খাতা নিয়ে আসতে বললেন।

কেষ্টদা আসলেন, পড়া সুরু হ'লো। একের পর এক, এমনি ক'রে ঘণ্টাখানেক ধ'রে নানাবিষয়ক বহু ছড়া পড়া হ'ল।

ফকিরবাবু তো অবাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ কি ছাপানোর মতো হয়েছে?

ফকিরবাবু—বলেন কী? এ তো ছড়া নয়, এ যে উন্নত ধরণের কাব্য, কতকগুলি জিনিস খুব সুন্দর হয়েছে।

ছড়া পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—আমাদের এখানে education (শিক্ষা) -টা নিতান্ত domestic (ঘরোয়া) রকমের হয়। B. A., M. A. পাশ ক'রেও এখানকার ছেলে-মেয়েরা বুঝতে পারে না যে তারা educated (শিক্ষিত) হয়েছে। তারা চলবে-ফিরবে, কথা কইবে নাংলা রকমে, আপনাকে এক গ্লাস জল দেবে, তা'ও সেইভাবে। একবার কলকাতা থেকে একটি matriculate (ম্যাট্রিকুলেশন পাশ) মেয়ে আশ্রমে এসে দেখে যে B. Sc. পাশ একটি মেয়ে অজ-পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো মাজায় কাপড় বেঁধে কালি-ঝুলি মেখে হাঁড়ি মাজছে। তাকে দেখে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না যে, সে অতখানি educated (শিক্ষিতা)।

ফকিরবাবু অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলেন। গল্পে-সল্পে আরো কিছু সময় কাটলো। তারপর ফকিরবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে গাত্রোত্থান করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে আবার আসতে বললেন।

৫ই ভাদ্র, ১৩৪৭, বুধবার (ইং ২১।৮।১৯৪০)

দুপুরবেলায় ঘুম থেকে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্য বদনে তাসুতে ব'সে আছেন, কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে নানা গল্প করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি কথা মনে হয়, তাকে যেন নিছক কল্পনা বলতে পারি না, স্মৃতি ব'লেই মনে হয়। তা' না হ'লে প্রত্যেকবারই একই রূপ নিয়ে হাজির হবে কেন? Fact (বাস্তব ব্যাপার) না হ'লে এমন হয় না। বেশ যেন মনে পড়ে, একটা পাহাড়ে দেশ, তার মধ্যে বিরাট একখানা পাথর, কত লতা, ফুল তার গা-বেয়ে উঠেছে, পাশে পশ্চিম দিক থেকে পূব দিকে নদী ব'য়ে যাচ্ছে, নদীটা প্রসারের তুলনায় খুব গভীর। আরো মনে হয়—বিরাট মাঠ, horizon-এর (দিগন্তের) ওপারে, দূরে অতিদূরে—কুষ্টিয়ার কলের চাইতেও দূরে সোনা দিয়ে মোড়ান বিরাট মন্দিরের চূড়ো, আমি যেন এসব জায়গায় কখন ছিলাম।

একটু পরে প্যারীদা একটা ছড়া এনে দিলেন। ছড়াটার মর্ম্ম হ'ল এই যে—কর্ম্মফল খণ্ডন হ'চ্ছে কিনা এটা বুঝতে গেলে দেখতে হবে, সৎকর্ম্মে আমরা বাস্তবভাবে ব্যাপৃত হ'য়ে উঠেছি কিনা। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাল কাজ করতে আরম্ভ করলেই যে তখন-তখন সব ভাল ফল পাওয়া যাবে, সে কোন কথা নয়। আগের খারাপ কাজের ফল দেখা দেবেই। কাজের effect (ফল) আছেই, তা' রুদ্ধ হবে না, কিন্তু সেটা মানুষ এমনভাবে manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে, utilise (ব্যবহার) করতে পারে যে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল প্রসব করবেই না। খারাপটা আসবে, কিন্তু তা' খারাপ করতে পারবে না। যেমন নরেনদা, তার হাত-পা পুড়ে গেল, সেই অবস্থাতেই এমনতর pose (রকম) নিয়ে দাঁড়াল যে environment (পরিবেশ) পর্য্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে গেল। নিজের অত পুড়ে গেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সকলকে ধ'রে-ধ'রে নিতে লাগল, আর ওরই মধ্যে যাজন সুরু ক'রে দিল। এমন আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে ফেলল যে যাদের কম পুড়েছিল, নরেনদার ভাব দেখে নিজেদের যন্ত্রণার কথা ভুলে গেল—ভাবল, যেন কিছু হয়নি। অত বড় একটা accident-এর (দুর্ঘটনার) ভিতর-দিয়ে environment (পরিবেশ)-কে কেমন win (জয়) ক'রে ফেলল, এমনি হয়।

রাজসাহী থেকে একটি ভাই এসেছেন। তিনি বেকার অবস্থায় আছেন ব'লে জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একমাস নিজে উপায় ক'রে ইষ্টভৃতি কর্। তখন পথ ঠিক পাবি।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর Philanthropy Office-এ ব'সে নফরদার (ঘোষ) সঙ্গে কথা বলছিলেন—অসুখ-বিসুখ যে হয় তার মূলে রয়েছে কোন-না-কোন বৃত্তি, সেই বৃত্তিবশে তদনুরূপ চলনায় মানুষ চলে, তারপর আসে অসুখ। ওখানে সন্ধান না ক'রে, ওতে হাত না দিয়ে যত-ভাবে যত জায়গাতেই খোঁজা যাক না কেন, যত ঔষধই খাওয়া হোক না কেন, কিছুতেই কিছু হয় না। ওষুধ রোগটা আটকে রাখতে পারে, এইমাত্র—যেমন একজন লোককে দরকার হ'লে বেঁধে রাখা যায়। কিন্তু

কারণকে অপসারিত না করলে—ওষুধ বন্ধ দিলেই আবার যা' তা'। চলাটা ঠিক করলেই অনেক অসুখ সেরে যায়, ওষুধ বিশেষ খাওয়ার দরকার করে না—তবে একদম যে দরকার হয় না এ-কথা বলি না। ওষুধ body (শরীর)-কে fit (উপযুক্ত) করতে সাহায্য করে। চরকে এই ধরণের কী-একটা শ্লোক আছে। অনেকের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে এতই রোক যে, তার অসুখের জন্য যদি তাকে কয়েকদিন থানকুনির ঝোল খেতে দেওয়া যায়, সে হয়তো চোখ-মুখ খিঁচিয়ে বিকট বিরক্তির সঙ্গে বলবে—থান্-কুনি থান্-কুনি থান্কুনি (শ্রীশ্রীঠাকুর এমন বিচিত্র ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন যে সকলে দেখে তো হাসতে হাসতে বাঁচে না।)—আর কিছু চোখে দেখে না—যত সব ছোটলোকদের কাণ্ড-কারখানা। আমি বাবাকে আগেই বলেছিলাম, তা' না, বাবার ছোটলোকের ঘর থেকে মেয়ে না আনলেই নয়, আমার জীবনটা একেবারে নষ্ট ক'রে দিল। অবশ্য, প্রকৃতপক্ষে হয়তো তার পছন্দমতোই এ বিয়ে হয়েছে। স্ত্রী যত্নসহকারে রোগা স্বামীকে উপযুক্ত পথ্য দিতে গেলে সে হয়তো রেগে তার গায়ে খড়ম ছুঁড়ে মারল, মাজাই কেটে গেল। লোভের বশে মানুষ কী করে আর না-করে, তার ঠিক নেই। আর, মানুষ যে নিয়ম পালন করে তার মধ্যেও তার বৃত্তির খেয়ালটুকু বাদ দেয় না। সে হয়তো থানকুনির ঝোলই খাচ্ছে, তার মধ্যে একটু আবার লঙ্কা রোজ টিপে নিচ্ছে, ভাতে-ভাত খাচ্ছে, তার মধ্যে দু-চামচ ঘি ঢেলে নিচ্ছে, বলে—ও না হ'লে কি হয়। পারা যায়! এই অনিয়ম করা সত্ত্বেও সে মনে কবে, সে ঠিকভাবে চলছে। মানুষ তার বৃত্তি-সম্বন্ধে কেমন বেহুঁশ ও blind (অন্ধ), আর এমনিভাবে চ'লে কোন ফল না পেয়ে শেষে বিজ্ঞের মতো আপসোসের সুরে বলে—হ্যাঁ! হ্যাঁ! সব দেখেছি, সব করেছি—ও কিছুতেই কিচ্ছু হয় না, কোনটায় কোন ফল নেই, সব বাজে কথা। এর জন্যই ভগবানের আর এক নাম বিধি, বিধিকে না মেনে কারো পারার জো নেই। মানুষ প্রবৃত্তির বিধিকেই মানে, কিন্তু জীবনের বিধিকে, সুখের বিধিকে মানে না—তাই দুঃখ হ'য়ে ওঠে অনিবার্য্য। তোমার অসুখ করেছে, তখন হয়তো তোমার কাঁঠাল খেতে ইচ্ছে করল, খেলে—একটা কাঁঠাল খেতে গিয়ে সারা জীবনের কাঁঠাল খাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেল, তখন না খেলে কত কাঁঠাল খাওয়ার পথ খোলা থাকত। তাই বুঝে-সুঝে চলার দরকার, ভেবে দেখতে হয়—কোন্ নিয়মে, কোন্ কায়দায়, কেমনভাবে চ'লে, ফিরে, খেয়ে, আচরণ ক'রে তুমি ভাল থাক—আর তেমনিভাবেই চলতে হয়।

পাবনার District Inspector of Schools (জিলা ইনস্পেক্টর অব স্কুলস) এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—শরীর সুস্থ থাকলে বেশী খেলেও তো অনেকের ক্ষতি করে না, বেশ সহ্য হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' প্রয়োজন তার চাইতে বেশী খেলেই তো তার চাপ আমাদের Stomach, Nerves, Heart (পেট, স্নায়ু, হৃদয়) ইত্যাদিকে বইতে হবে। কিন্তু

আপনি-আমি তো Sperm ও Ova-র product (শুক্র ও ডিম্বের ফল)—একটা limited energy (সীমিত শক্তি) নিয়ে জন্মেছি, আর তাই নিয়ে চলেছি। এই life-potency (জীবনীশক্তি)-কেই বলে আয়ু, এই আয়ু যদি অযথা অপব্যয় করি—এ তো ফুরোবেই, শরীর দুর্ব্বল হবেই—তা' হয়তো বহু পরে টের পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বছর বয়সে শরীরের উপর অত্যাচার করা সত্ত্বেও হয়তো আপনার ক্ষতি করে না, ষাট বছর বয়সে আপনি হয়তো দেখবেন আশি বছরে আপনার শরীর যতখানি অপটু ও জীর্ণ হ'তো, তাই হ'য়ে গেছে। অনিয়মের effect (ফল) তো আছে।

রাত দুপুরে, আন্দাজ দুটো-আড়াইটার সময়, তরু-মা এসে প্রফুল্লকে ডাকলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর ডাকছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যেতেই বললেন—ঐ ছড়াটা কী রে? ভালবাসার আছে একটি ছোট্ট সাবুদ লক্ষণা। তখন ছড়ার খাতা খুঁজে বের ক'রে নিয়ে সেটা কেষ্টদার হাতে দেওয়া হ'ল। কেষ্টদা সেটা পড়লেন। পড়া হ'লে পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসীমাকে ডেকে বললেন—শুনলি কালিদাসী? ছড়াটার অর্থ এই যে—প্রিয়কে দেখার হাজার মানুষই থাক না কেন, নিজে না দেখলে, তত্ত্বাবধান না নিলে, উপযুক্ত ব্যবহার ও ব্যবস্থিতি নিয়ে প্রিয়র সর্ব্বব্যাপারে ব্যাপৃত না থাকলে ভালবাসার জনের কিছুতেই তৃপ্তি আসতে পারে না—প্রিয়র ব্যাপারে তার সেবাহস্ত সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সক্রিয় থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে-নিজেই বলছেন—আমার কিন্তু আপনাদের জন্য ওমনি হয়। এত মানুষের মধ্যে একটা ছোট ছেলে 'ক্যাঁক্' ক'রে উঠলেও আমি যেন কেমন হ'য়ে পড়ি।

আজ রাত এগারটা সাড়ে-এগারটার সময় টের পাওয়া গেছে যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের সুপুরির কৌটায় কে নাকি বিষ রেখে গেছে। সুপুরি খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর যারপর-নাই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। এইরকম একটা ভীষণ মারাত্মক ষড়যন্ত্র ঘ'টে গেছে অথচ শ্রীশ্রীঠাকুব কেমন নিরুদ্বিগ্ন মনে সহজভাবে গল্প করছেন।

৭ই ভাদ্র, ১৩৪৭, শুক্রবার (ইং ২৩।৮।১৯৪০)

অনেকদিন পরে সুশীলদা (বসু) আশ্রমে বাংলা মায়ের কোলে ফিরে এলেন। ভাদ্রের ভরা নদী তখন কূলপ্লাবনী হ'য়ে আশ্রমের পাশ দিয়ে উচ্ছল আবেগে ছুটে চলেছে, আশ্রমের সামনের দিকে তখন এক অপূর্ব্ব শোভা। শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বাঁধের ধারে খড়ের চালাঘরখানিতে ব'সে আছেন। সুশীলদা সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি ইদানিং ভৃগুর কোষ্ঠী সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সব বিষয়ে নানা গল্প করছেন।

সুশীলদা—জয়পুর, কাশ্মীর ইত্যাদি রাজ্যে বহু সুন্দর-সুন্দর প্রাচীন গ্রন্থাদি আছে, সেগুলি এখনও ছাপা হয়নি। জার্ম্মানী ও আমেরিকা থেকে কত পণ্ডিত লোক ওখানে গিয়ে সেগুলি দেখে নেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রাজ্য-সবকার অনুমতি দেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে কতখানি উন্নত ছিলাম, তা' ভৃগুর এই একটা ব্যাপার থেকেই বোঝা যায়। আমরা যতখানি উঠেছিলাম ওবা এখনও সে-স্তরে পৌঁছায়নি।

ধাতুর রূপান্তর-সম্বন্ধে সুশীলদা আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর— Principle (নিয়ম)-টা ভালভাবে না জানলে tackle (পরিচালনা) করা মুশকিল।

পুনর্জ্জন্ম-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, মানুষ যে দশায় মারা যায়, সেই দশাতেই অর্থাৎ সেই গোচর ফলে জন্মে। একজনের জন্ম-লগ্ন থেকে সেইটে revert ক'রে (উল্টিয়ে) তার পূর্ব্বজন্ম জানা যেতে পারে। কোন্ point (জায়গা) থেকে revert করতে (ওল্টাতে) হবে, সেটা ঠিকভাবে বুঝতে হবে। গোপাল একবার আমাকে বলছিল—"আপনারটা উল্টিয়ে রামকৃষ্ণদেবের জীবন হয়; সেটার পিছনে বুদ্ধদেবকে পাওয়া যায়", ইত্যাদি। আমি তখনই ওকে বারণ করলাম, বললাম—'এমনতর কথা বলতে নেই।' ফলকথা, লগ্নটা যেন সূর্য্যের মতো ওঠে। একই স্থানে অবিকল একই লগ্নে দুই ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করতে পারে না।

সুশীলদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালেন যে, এক ভদ্রলোক মারা যাওয়ার পর তার বন্ধু ও বন্ধুপত্নী তার বিষয় আলোচনা ও চিন্তা করতে-করতে পরস্পর মিলিত হন এবং সেই রাত্রেই উক্ত বন্ধুপত্নীর গর্ভে তিনি স্থান লাভ করেন। পরজন্মে তিনি জাতিস্মর হওয়ার দরুন এটা পরীক্ষিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা হওয়াই সম্ভব। এইজন্যই শাস্ত্রে আছে, স্বামী স্ত্রী যেখানে নির্জ্জনে থাকে, সেখানে যেন অন্য রকমের impulse (সাড়া) না থাকে, তা'তে একটা soul in হওয়ার (আত্মা গর্ভে স্থান লাভ করার) পক্ষে ব্যাঘাত হ'তে পারে। আর, স্বামী-স্ত্রী যেখানে নিভৃতে একত্রে শুয়ে থাকে, সেখানে অন্য কারো যাওয়া নাকি পাপ।

এই সব কথার পর কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের অত্যাচার-সম্বন্ধে নানা কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আমায় উজাড় ক'রে মানুষের জন্য করেছি, আর মানুষও উজাড় ক'রে আমাকে অত্যাচার করেছে। আমি তখন মাসে ৩০০০ টাকা বাইরে দিই, অথচ মা মাসে ৩০০ টাকা ক'রে আমার কাছে চেয়েছিলেন, আমি তা' মাকে

দিতে পারিনি। এ আমার কম দুঃখ নয়। অভাবের তাড়নায় মা শেষটা আপনাদের কাছে হাত পাততে বাধ্য হতেন। আর, আমি যাদের দিয়েছি, তারা সেটা দান ব'লে ভাবেনি। দাবী ব'লে ধ'রে নিয়েছে। লিখে দেওয়ার কথায় সবাই চ'টে যেত, রাগ করত। আমি কিছু বলতাম না, আমার কাজ আমি ক'রে যেতাম। আমার ওতে কিছু স্বার্থও ছিল না, কিন্তু লিখে না দেওয়ায় আজ এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আমার কাছ থেকে নিয়ে-থুয়ে আজ আমার উপর যারা এমন অকথ্য অত্যাচার করছে তাতে যদি তাদের খানিকটা ভাল হ'তো, তা'ও খানিকটা সান্ত্বনা ছিল, কিন্তু এতে ক'রে তারা নিজের ক্ষতি করছে যে সব চাইতে বেশী, সেই আমার মস্ত আপসোস। ...... শেষটা আমার কথা শুনতো না, আমি কিছু বলতেও পারতাম না। সেবার উৎসবে দুই ধামা সোনা জোগাড় করেছিল, আমি বললাম, মোটরের দামের জন্য ৪০০ টাকা দিতে, তাও দিল না।

কেষ্ট দাস একজনের কাছ থেকে অপমানিত হ'য়ে আমার কাছে এসে যখন পড়ল, আমি বললাম—তুই এইভাবে-এইভাবে চল্, দেখবি, ব্রাহ্মণরাও তোকে ভক্তি করবে। আমার কথামতো চ'লে সত্যি-সত্যি তাই হ'লো। ...... দা একদিন ওকে প্রণাম করতে গেলে ও ছুটে পালাল, আরো কত কী হ'লো। শেষটা সহ্য করতে পারল না, মাথা বিগড়ে গেল, আরো কয়েকজনও ঐ সঙ্গে গিয়ে জুটলো।

প্রফুল্ল—ঠাকুরের টাকা public-money (সাধারণের টাকা)—এই ধরণের একটা ধুয়ো উঠেছে। তাতে আমি সেদিন একজনকে ধমক দিয়ে বললাম, আমার ঠাকুরের টাকা যদি public-money (সাধারণের টাকা) হয়, তবে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, প্রফেসর—কার টাকা public-money (সাধারণের টাকা) নয়? এরা প্রত্যেকে সেবা বিক্রি ক'রে টাকা নেন, আর আমার ঠাকুর ভালবাসার টানে প্রত্যাশারহিত হ'য়ে প্রাণপণ মানুষের সেবা ক'রে যাচ্ছেন সর্ব্বতোভাবে, তাঁর সে-ভালবাসাময় নীরন্ধ্র সেবার মূল্য দেওয়া যায় না। তবু মানুষ তাঁকে ভালবেসে, প্রাণের টানে যৎকিঞ্চিৎ অর্ঘ্য দিয়ে ধন্য হ'তে চায়, আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায়। তাই-ই তাঁর অর্ঘ্য, তাই-ই তাঁর প্রাপ্তি। নিজের চরিত্র ও যোগ্যতা-বলে এই যে সাত্ত্বিক অর্জ্জন—তা' হ'লো কিনা public-money (সাধারণের টাকা), আর দুনিয়ার প্রত্যেকের উপার্জ্জন হ'লো কিনা নিজস্ব। এই কথা শুনে সে একেবারে চুপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, আমি আমার যা'-কিছু নিয়ে পরমপিতার property (সম্পদ্) এবং প্রত্যেকেই তাই।

পূর্ব্বকথার সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—এমন লোকের কথাও আমি জানি যে আমাকে বিষ খাওয়াতে পারলে খুশি হয়। আমি ভাবি, কী আর করব? গোপাল (মুখোপাধ্যায়), দুর্গাচরণ (সরকার) গেছে, না হয় আমিও যাব। কিন্তু পরমপিতার দয়ায় তাঁর কাজ চলতেই থাকবে।

এই সব বলছেন, এরই মাঝে গ্রামের এক মুসলমান-ভাই খুবই সুন্দর একটি প্রজাপতি ধ'রে এনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে বলল—এটা আমার গায় পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঃ। বেশ চমৎকার তো! খুব ভাল। গায় পড়া সৌভাগ্যের লক্ষণ—তোর ভাল হবে, নিয়ে যা, রেখে দে গে, মারিস্ না কিন্তু।

সে প্রজাপতিটা নিয়ে খুশি মনে চ'লে গেল।

তখন-তখনই গান করতে-করতে এক ফকির এলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে দেখেই তার ভাষায় ব'লে উঠলেন—কাল কনে গেছিলু রে, সময়মতো আসতি হয়। তুমি সুবিধেমতো আসতি ভুলে যাও।

সে ওতেই মহাখুশি, পরে আসবে ব'লে তখনকার-মতো বিদায় নিল।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছনে বাবলাতলায় বেঞ্চে ব'সে আছেন—সুতৃপ্ত ভঙ্গীতে। অনেকেই উপস্থিত আছেন। যতীশদা (কর) আর-একটি দাদার সুবিধাবাদী স্বভাবের কথা বলছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—যাঁর কাছ থেকে সেবা নিয়ে বেঁচে আছি, তাঁর সুবিধার চাইতে নিজের সুবিধাকে বড় ক'রে দেখাই pauperism-এর (দারিদ্র্যব্যাধির) লক্ষণ। যে এরকম করে, তার conception (ধারণা) যতই big (বড়) হোক না কেন, সে pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) নিশ্চয়ই।

বীরেনদা (মুহুরী)—আমি দিন-পনর আগে চিঠি লিখেছিলাম—ইদানীং বড় অশান্তিতে আছি। আজ এসেছি, কাল সকালেই আবার যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অশান্তিতে মনটাকে বেশী উতলা হ'তে দিতে নেই। মনকে একটু আলগা রেখে সাক্ষীস্বরূপ দেখে যেতে হয়।

বেঞ্চের পেছন দিকে যে কাঠটাতে হেলান দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বসেছিলেন, সেটাকে দেখিয়ে বললেন—এটাকে যদি টেনে তুলতে চাই, এটার উপর ভর দিয়ে থেকে তা' পারা যাবে না, উঠে দাঁড়িয়ে করতে হবে। তাই, কিছুকে control-এ (বশে) আনতে গেলে তার above-এ (ঊর্দ্ধে) থাকতে হয়।

তারপর কাজল-ভাই সম্বন্ধে কথা উঠলো। কাজল পট ক'রে হেসে ফেলে মানুষকে সহজেই আপনার-ক'রে নিতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই আপনার-ক'রে নেবার ক্ষমতা বামনাই ক্ষমতা।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে চৌকিতে শুয়ে আছেন। কতিপয় দাদা ও মায়েরা উপস্থিত। দূরে আলোর কাছে একটা কুকুর ফড়িং ধরছিল। আবার ফড়িংগুলি যখন তার গায়ে এসে লাগছিল, সে চমকে লাফিয়ে উঠছিল। কেউই তা' লক্ষ্য করেননি। কিন্তু তা' শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ এড়ায়নি। তিনি দূর থেকে দেখছেন আর একটু-একটু

হাসছেন। হঠাৎ বললেন—দ্যাখ্ ব্যাপার! কুকুরটা পোকা ধরতে যাচ্ছে, অথচ পোকা গায় পড়লে কেমন করছে!

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্যচ্ছলে সহাস্যবদনে গল্প করতে লাগলেন—একবার একদল বিড়াল প্যারীর বিরুদ্ধে conspiracy (ষড়যন্ত্র) করেছিল। সেগুলি রোজ ওর বিছানায় মুতে রেখে যেত। প্যারী কশান যা' দিত, ওরা আবার তখন দলভারী ক'রে আসতো। ওর life (জীবন) একেবারে miserable (দুঃখময়) ক'রে দিয়েছিল।

প্রফুল্ল—ওরাও তো পারিপার্শ্বিক, এই পারিপার্শ্বিককে পরিপোষণী ক'রে তোলার জন্য বুঝি ভূতবলি ইত্যাদির ব্যবস্থা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

প্রফুল্ল—আচ্ছা, ওরা কি আমাদের ভাষা বুঝতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বোধ হয় পারে না। তবে ওদের ভাষা মানুষ বুঝতে পারে। তক্ষশীলায় এটা নাকি একটা subject (শিক্ষণীয় বিষয়) ছিল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কাগজ পড়া হ'ল এবং যুদ্ধ-সম্পর্কে আলোচনাদি চলতে লাগলো।

১৯শে ভাদ্র, ১৩৪৭, বুধবার (ইং ৪।৯।১৯৪০)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুর সাক্ষ্য দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেন ভাবিত হ'য়ে পড়েছেন—কেমন ক'রে সাক্ষ্য দেবেন। কোর্ট এসে জবানবন্দী নেবে। হাকিম ও দুই পক্ষের উকিল, মোক্তার আসবার আগেই শ্রীশ্রীঠাকুর কলা-কেন্দ্রের দক্ষিণ পাশের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন (কলাকেন্দ্রের মাঝের ঘরে কোর্ট বসবে)। কিছু পরেই পাবনার বিখ্যাত উকিল শ্রীরণজিৎ লাহিড়ী ও আশু রায় এলেন। রণজিৎবাবুকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সসম্ভ্রমে উঠে ব'সে 'আসুন দাদা, আসুন', ব'লে অভ্যর্থনা করলেন। রণজিৎবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে চিন্তাকুল দেখে ভরসা দেবার জন্য বলতে লাগলেন—সাক্ষ্য দেওয়া কিছুই না, কত অশিক্ষিত মেয়েছেলেরা পর্য্যন্ত কোর্টে গিয়ে জবানবন্দী দিয়ে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তার চাইতেও অখাস্তা।

আশুবাবুকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোকে যদি 'তুই' 'টুই' ব'লে ফেলি তা'তে কোন দোষ হবে না তো?

আশুবাবু—না, তোমার যা' ইচ্ছে ব'লো, আর আমার সঙ্গে কথা বলার দরকারও হবে না বিশেষ।

হাকিম, উকিল, মোক্তার এলেন। ঘরের ভিতরে ও বাইরে লোকে লোকারণ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝের ঘরের চৌকিতে অতি বিনীতভাবে বসলেন। দেখে মনে হয় যেন বিনয় ও নিয়মানুবর্ত্তিতার মূর্ত্ত প্রতীক—সহজভাবে ব'সে, হাতদুটি সংলগ্ন ক'রে হাকিমের দিকে চেয়ে যেন নির্দ্দেশের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। পেশকার শপথ নিতে বললেন। পেশকার প্রথমটা ব'লে যেতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রদ্ধাগম্ভীরচিত্তে মন্ত্রোচ্চারণের মতো কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করলেন।

ভোলা রায়ের পক্ষের উকিল পরেশবাবু (চৌধুরী) জেরা সুরু করলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর এক-এক ক'রে জবাব দিয়ে যেতে লাগলেন। উত্তরগুলি যথাযথ, সংযত ও পরিমিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার রকম দেখে, মনে হচ্ছিল তিনি পরেশবাবুকে আপনজন বিবেচনায় তাঁকে সত্য উদঘাটনে সাহায্য করতে উন্মুখ। প্রশ্নোত্তরের নমুনা দেওয়া হ'লো।

উকিল—অনন্তনাথ রায়ের কি আশ্রমে কোন দোকান ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎসঙ্গের একটা দোকান ছিল, অনন্ত দেখত, আমি প্রণামীর টাকাটুকি দিয়ে ও কিছু যোগাড় ক'রে দোকান ক'রে দিয়েছিলাম।

উকিল—আপনার পেশা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(যেন একটু বিব্রত হ'য়ে) আমি তো বরাবর এইসব নিয়েই আছি।

উকিল—এইসব কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Religious work (ধর্ম্মকার্য্য)।

হাকিম—আপনি কি হিন্দু বা মুসলমান এইরকম কোন ধর্ম্ম প্রচার করেন, না spirituality-র (আধ্যাত্মিকতার) culture (অনুশীলন) করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম বলতে আমি কী বুঝি, বলতে পারি?

হাকিম—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যখন সব-কিছু নিয়ে Ideal-এ (আদর্শে) ligared (নিবদ্ধ) হ'য়ে পারিপার্শ্বিক নিয়ে বাঁচা-বাড়ার পথে চলে, তখনই সে ধর্ম্ম পালন করে।

উকিল—আপনি কি সন্ন্যাসী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ন্যাসী বলতে আমি বুঝি তাঁকে যিনি তাঁর সমস্ত বৃত্তি ও শক্তি দিয়ে Ideal (আদর্শ)-কে fulfil (পরিপূরণ) করতে চেষ্টা করেন।

উকিল—আপনি কি জমিদার বা জোদ্দার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি নিজেকে তা' ভাবি না, আমি নিজেকে জমিদার বা জোদ্দার ব'লে মনেই করি না।

উকিল—আপনি কি ট্রাষ্টি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ট্রাষ্টি কা'রে কয় আমি বুঝি না, আমি যা' করি তা' করি। তা' যদি trusteeship cover করে (অস্তিত্বের অন্তর্গত হয়) তাহ'লে আমি trustee (অছি)। না হয় তো নয়।

উকিল—(একটা কাগজ দেখিয়ে)—আপনি কি ট্রাষ্টি হিসাবে এই জিনিসটা sign (সই) করেননি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sign (সই) করেছি কিনা মনে নেই, হয়তো ক'রে থাকতে পারি, ওরা এসে বলেছে, করেছি, কী হিসাবে করেছি জানি না।

উকিল—আপনি কি সৎসঙ্গের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেসিডেণ্ট কিনা জানি না, প্রেসিডেণ্ট বোধ হয় মা ছিলেন। তবে এই জানি, সৎসঙ্গ আমার থেকে evolve করেছে (উদ্ভূত হয়েছে)।

হাকিম—আপনি যে ১২,০০০ টাকা সেবার সৎসঙ্গকে দিলেন, কেন দিলেন? কোন্ সর্ত্তে দিলেন? আপনি কি সেটা loan (ধার) দিয়েছিলেন? আপনি কি পাবার আশা রাখেননি, কোন দাবী-দাওয়া রাখেননি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। ওরা এসে বলল যে ১২,০০০ টাকা দরকার, আমি সকলের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে যোগাড় ক'রে দিলাম, কোন প্রত্যাশা আমার ছিল না। আমার একমাত্র প্রলোভন ছিল সৎসঙ্গ বাঁচবে, তাছাড়া আমি আর কিছু চাইনি।

উকিল—আপনি কি বিয়ে করেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

উকিল—আপনার স্ত্রী ক'টি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—৬/৭টি। সবর্ণ বাদে অনুলোম অসবর্ণ মতেও আমি বিয়ে করেছি। আমার বিশ্বাস common Ideal (এক আদর্শ) ও অনুলোম বিয়ে এই দুটোই জাতকে integrated ক'রে রাখে। তাই example set করার (দৃষ্টান্ত স্থাপনের) জন্য আমি এই বিয়েগুলি করেছি। আমি না করলে তো চারাবে না। আমি স্থলবিশেষে যেখানে প্রয়োজন, বহুবিবাহকে সমর্থন করি, কিন্তু তা' অনুলোমক্রমিক।

হাকিম—অনুলোম কী?—Inter-caste Marriage (বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তথাকথিত Inter-caste Marriage প্রতিলোমও হ'তে পারে, তা' নয়, অনুলোম। অনুলোমে ছেলে হবে উচ্চবর্ণের, মেয়ে হবে নিম্নবর্ণের। উচ্চবর্ণের মেয়ের নিম্নবর্ণের ছেলের সঙ্গে কিন্তু বিয়ে হ'তে পারে না।

পরেশবাবু বুঝেসুঝেও না বোঝার ভান ক'রে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ছড়ার ক্রূর কুটিল, বিকৃত ব্যাখ্যা ক'রে, মুখে শাতনী হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে এক অবান্তর প্রশ্নবাণ ছুঁড়লেন আপনার প্রচারিত ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গই তো হ'লো সুন্দরী স্ত্রী এবং শ্যালক লাভ করা। কারণ, আপনিই তো বলেছেন—

" 'না' সুন্দরী বধূ যা'র
'হয় না' যার শালা,
অলক্ষ্মী তা'র ঘরে গিয়ে
হয়েছে অচলা।"

উকিলের এই প্রশ্ন শুনে সমবেত দর্শকবৃন্দ হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। আমাদের ভিতরে একজন বলল—উনি বোধহয় ভুলে গেছেন যে 'না' ও 'হয় না' কথা দুটি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে আছে। হাকিম মেজাজের সঙ্গে বললেন—Unnecessary comments by onlookers amount to contempt of court (দর্শকদেব অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য কোর্টের মর্য্যাদা-হানিকর)। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর নির্ব্বিকার ও নিরুদ্বেগভাবে নীরবে ব'সে আছেন। একবার একটু পরেশবাবুর দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি মেলে করুণার হাসি হাসলেন। রণজিৎবাবু তেজোদ্দৃপ্ত ভঙ্গিতে হাকিমকে বললেন—আমার মহাসম্ভ্রান্ত সাক্ষীর এই বাণীর গভীর তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট। তাঁকে এইসব অবাস্তব প্রশ্ন ক'রে বিব্রত করার অধিকার বিজ্ঞ কৌসুলির আছে কিনা সে-বিষয়ে আমি মাননীয়, সদাশয় কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

হাকিম পরেশবাবুকে বললেন—You may ask other relevant questions (আপনি অন্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে পারেন)।

এইভাবে আরো কিছু সময় চললো।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। খুব রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবু কেমন ধৈর্য্যের সঙ্গে জেরার উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। কত অবান্তর প্রশ্ন হ'চ্ছে, অথচ চোখে-মুখে এতটুকু বিরক্তির ভাব নেই। শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও প্রসন্নবদনে করণীয় ক'রে চলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরের অবস্থা দেখে হাকিম তাঁকে বিশ্রাম নিতে ব'লে কিছু সময়ের জন্য বাইরে গেলেন। খানিক পরে আবার জেরা আরম্ভ হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কষ্ট হ'চ্ছে দেখে হাকিম শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—শুয়ে পড়ুন। হাকিম বলা মাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর পট ক'রে শুয়ে পড়লেন। হাকিম বললেন—'পা বাড়িয়ে দেন।' শ্রীশ্রীঠাকুর তখন পা মেলে দিলেন। এই অবস্থাতেও প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ দেখে পরেশবাবু মাঝে-মাঝে বলছিলেন 'তাহ'লে আজ থাক'। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুনয়-সহকারে বলতে লাগলেন—'না! আমি

যতক্ষণ পারি বলি, আপনি প্রশ্ন ক'রে যান।' এইভাবে বেলা ৩টে থেকে রাত ৮॥ পর্য্যন্ত ৫॥ ঘণ্টা রোগযন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থায় জবানবন্দী দিলেন। এর মধ্যে হাকিম মাঝে-মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কোন-কোন অবান্তর প্রশ্নের জবাব দিতে নিষেধ করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখনকার মতো চুপচাপ বসেছিলেন।

সব শেষ হ'য়ে গেলে হাকিম বললেন—এখন কেমন বোধ করছেন? ও কিছু না, blood-pressure (রক্তের চাপ) মানে mental-pressure (মানসিক চাপ), আমি নিজেও ভুক্তভোগী। That is no disease at all (ও কোন রোগই নয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু ভাল লাগে না। হ্যাঁ, আপনি নাকি যুদ্ধে গিয়েছিলেন?

হাকিম—হ্যাঁ।

একটু পরে হাকিম বললেন—I have had two strokes (আমার দুইবার স্ট্রোক হয়েছিল), ওতে ভয় পাবার কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার nerve (স্নায়ু) কত strong (শক্ত), আপনি কামান ছোঁড়েন, আর আমরা কামানের একটা শব্দ শুনলেই ফিট হ'য়ে পড়ি।

হাকিম ক্যাপ্টেন, আর, এল, মুখার্জ্জী অত্যন্ত প্রীত হলেন।

২২শে ভাদ্র, ১৩৪৭, শনিবার (ইং ৭।৬।১৯৪০)

আজ কলকাতা থেকে তপতীদা (মুখোপাধ্যায়—জ্যোতির্ব্বিদ) এসেছেন। সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে বাইরের চৌকিতে শুয়ে আছেন। সামনে পদ্মায় বেশ জল এসেছে, আকাশ মেঘমুক্ত, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। বহু দাদা ও মায়েরা শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির সামনে ব'সে আছেন। তপতীদার সঙ্গে কথা হ'চ্ছে।

তপতীদা—আমার যখন যেটা প্রয়োজন, কেমন জানি জুটে যায়। যখন দীক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করছিলাম—জে, হাকিমের কাছে গেলাম কাজে, হঠাৎ যোগাযোগ হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষাও হয়েছে জবর জায়গায়।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের দেশে অনেক মানুষ আছে honest, moralist (সৎ, নীতিপরায়ণ) সাধু ব'লে পরিচিত, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে really dishonest (সত্যই অসাধু)—সাধুর pose (ভড়ং) নিয়ে চলে। একজন গুণ্ডা, বদমায়েস, লুচ্চা, জোচ্চোর তাদের চেয়ে ঢের ভাল—যদি কিনা বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বাড়ী-ঘর, টাকাকড়ি, নামযশ, মালমশলা, সুখ-দুঃখ—সব passion (প্রবৃত্তি) ছাড়িয়ে ইষ্টস্বার্থ-ইষ্টপ্রতিষ্ঠা তার কাছে বড় হ'য়ে ওঠে। এক মুহূর্ত্তে তার

যা' হবে—শত-শত বর্ষ জপ ক'রেও ওদের তা' হবে না। দেখেন না, হনুমান—ও-বেটা আবার বামুনের বেশে রাবণের বাড়ী পূজো করতে যায় মৃত্যুবাণ চুরি করবার জন্য—দেখে মনে হয়, কী শয়তান। কিন্তু সব-কিছু তার প্রেষ্ঠের জন্য। অমনটা আর দেখা যায় না পৃথিবীর ইতিহাসে। একেই বলে ভক্ত।

তপতীদা—প্রভু! বলুন তো এ আমার কী হ'ল—সাহেব আসুক, মুসলমান আসুক, high official (পদস্থ কর্ম্মচারী) আসুক, সবাইকে ভাল লাগে, কিন্তু average (সাধারণ) বাঙ্গালী খরিদ্দার দেখলেই যেন আমার গা জ্বালা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গা জ্বালা ক'রে তো লাভ নেই, ওতে আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হই, ওকেই সুন্দর ক'রে নিতে হবে। দেখেন, বাঙ্গালীর মতো এমন জান আপনি আর পাবেন না। গলদ ঢুকেছে দুটো জায়গায়, তাই যদি ঠিক করতে পারেন তবে হয়। প্রথম দোষ হ'চ্ছে—পূর্ব্ববর্ত্তীকে মানে না এমন লোককেও আমরা গুরু ব'লে মানি—তাই বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য, এ-মিশন, সে-মঠ, অমুক আশ্রম, তমুক সঙ্ঘ ইত্যাদি কত দলের আবির্ভাব হয়েছে—যারা কিনা এক সূত্রে সংহত নয়। সত্যিকার গুরু যিনি, তাঁর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেককেই trace (বের) করা যাবে। এ একেবারে map (মানচিত্র) দেখার মতো, যেমন—শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখলে ধরা যাবে, এই এখানে শ্রীকৃষ্ণ, এই বুদ্ধ, এই যীশু, এই মহম্মদ, এই গৌরাঙ্গ। পরিষ্কার বোঝা যাবে সবাইকে, তাঁর মধ্যে সবারই দেখা মিলবে। এই না হ'লে তিনি গুরু হবার উপযুক্ত নন। যুগপুরুষোত্তমকে কেন্দ্র ক'রে সমন্বয়ী সঙ্গতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলে হাজার মতের লোক থাকলেও কিছু এসে-যাবে না। আমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণ বা তজ্জাতীয় মহাপুরুষকে না মেনে, অস্বীকার বা অপমান ক'রেও মানুষ গুরুর আসনে বসতে পারে, এর চেয়ে দুরবস্থা আর কী হ'তে পারে। তারপর অনুলোম-অসবর্ণ বিবাহের স্থগিতিও একটা মস্ত দোষ হয়েছে। অনুলোম বিয়ে ছাড়া বর্ণগুলির মধ্যে মিল আনা দুরূহ। আর প্রতিলোম যেন-তেন-প্রকারেণ বন্ধ করা চাই। এক বর্ণের মধ্যেও বড় বংশের মেয়ে ছোট বংশের ছেলেকে দিলে তাতেও প্রতিলোম হয়। সদ্বংশজ ও অসদ্বংশজের মধ্যে কতকগুলি চরিত্রগত লক্ষণ আছে। নীচু বংশের হ'য়েও একজন সদ্বংশজ হ'তে পারে, আবার উঁচু বংশের হ'য়েও একজন অসদ্বংশজ হ'তে পারে। অসদ্বংশজের প্রধান দোষ হ'লো—তারা কাউকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। একটু খেয়াল করলেই এ-সব instinct (সংস্কার) বোঝা যায়। তাই মেয়ের বিয়ে দিতে গেলেই দেখতে হবে, ছেলে উঁচু সদ্বংশজ কিনা—এ না হ'লেই, প্রতিলোম হ'লেই সর্ব্বনাশ। প্রতিলোম এমন জিনিস যে যদি কারো সঙ্গে (সে একটা দেশই হোক বা পরিবারই হোক) শত্রুতা থাকে এবং প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা থাকে আর সেখানে যদি কোন-ভাবে প্রতিলোম ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে একেবারে নিশ্চিন্ত। এর চাইতে সর্ব্বনাশ করার সোজা পথ আর নেই।

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭, রবিবার (ইং ১৭।১১।১৯৪০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে আশ্রমে ফিলানথ্রপি অফিসে ব'সে আছেন। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি, চোখে তাঁর স্নিগ্ধ দীপ্তি, অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সুরে উপস্থিত দাদাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ছোটবেলা থেকে অভ্যাসগত ক'রে ফেলা লাগে, সবই অভ্যাসের ব্যাপার। মানুষ যে গাঁজাখোর হয়, সে কি সহজে হয়? কত কষ্ট ক'রে অভ্যাস করে। গাঁজা তো খেতে আর মধুর মতো মিঠে না, হয়তো ঘুরেই প'ড়ে যায়, তবু আবার খায়, ঐ পড়াটাই ভাল লাগে—এইভাবে অভ্যাস করে। মানুষ বদ অভ্যাস কত কষ্ট ক'রে করে আর যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির মতো সদভ্যাস আয়ত্ত করতে পারবে না? এর প্রতিপদক্ষেপেই তো সুখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে একটি ভাইকে বলছিলেন—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি একটু করেছিস, তা'ও তো ঠিকমতো করিসনি, তার ঠেলাতেই কত জিনিস খুলে গেছে। স্বস্ত্যয়নী যদি কেউ ঠিকভাবে করে, তার instinct (সহজাত সংস্কার)-এর মধ্যে যতখানি আছে ফুটে বেরুবেই।

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭, সোমবার (ইং ১৮।১১।১৯৪০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে মাতৃমন্দিরের পিছনে বেঞ্চে বসেছিলেন। একটি দাদা বললেন—অনেক টাকা থাকে, তাহ'লে ইষ্টপ্রতিষ্ঠার খুব সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' নয়। মানুষ যজন, যাজন করতে লাগলে টাকা আপনি আসে। এই যে আমাকে দেখছিস, আমার কী আছে? আমার থাকার মধ্যে আছে এই—তোদের ভালবাসি, তোরা কেউ না পড়িস তাই ভাবি, এইজন্য অস্থির হ'য়ে বেড়াই, তোদের পিছনে লেগেই আছি, যার যাতে ভাল হবে বুঝি, তাকে তা' কই, তা' যাতে করতে পারে, তার ফন্দীফিকির বাতলে দিই, একে দিয়ে এ করাই, ওকে দিয়ে তার জন্য আর-একটা করাই, প্রত্যেককে প্রত্যেকের পরিপোষণী ক'রে তুলতে চেষ্টা করি। এই আমি করি, তোরাই আমার সম্পদ। তোরা যে আমাকে টাকা দিস, ইচ্ছে ক'রেই তো দিস। তোদেরও এমনি হবে। ছেলে চিরকাল ছেলেই থাকে না, তার যখন ছেলে হয়, সে হ'য়ে দাঁড়ায় বাবা। তোরাও তাই ইষ্টকেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে এইরকম করবি, এইরকম হবি, ভাবনা কী? আর, তোরা বড় না হ'লে আমার সুখ কোথায়?

ধ্যান-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ ধ্যান-ধ্যান করে, অথচ ধ্যান ব'লতে কিছু বোঝে না, concentration (একাগ্রতা) না হ'য়ে হয় fixation (ত্রাটকগোছের)। ওতে মাথার

কর্ম্ম নিকেশ। ধ্যান মানে হ'লো অনুরাগমুখর ইষ্টচিন্তন; ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার পরিপোষক ক'রে ভিতর-বাইরের যা'-কিছুর নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের বুদ্ধি স্থিরীকরণ। ওইভাবে চিন্তা ক'রে বুদ্ধি স্থির ক'রে কাজেও তা' করা চাই। তাতেই হয় ধ্যান সার্থক, চরিত্রের ইষ্টানুগ বিন্যাসও হয় ওতে ক'রেই।

১লা পৌষ, ১৩৪৭, সোমবার (ইং ১৬। ১২। ১৯৪০)

শীতের সকাল। আশ্রম কর্ম্মমুখর। প্রেস, তপোবন, কেমিক্যাল-ওয়ার্কস, ওয়ার্কশপ, আনন্দবাজার, ডিসপেনসারী, ফিলান্থ্রপি অফিস, হোসিয়ারী, আর্ট-ষ্টুডিও—সর্ব্বত্রই কর্ম্মিগণ কর্ম্মরত। মাতৃমন্দিরের দক্ষিণ দিকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্থানীয় কয়েকজন তরকারীওয়ালা তরকারী নিয়ে বসেছে, মায়েরা সেখান থেকে তরকারী কিনছেন। আশ্রমের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে দিগন্তবিস্তৃত পদ্মার চর, তারই মাঝে অদূরে একটা বিরাট ঝিল। আকাশ নির্ম্মল, উদার, থেকে-থেকে পাখীর ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। উত্তর দিকে বাঁশঝোপের ভিতর মাঝে-মাঝে নানারকম পাখী কলরব করছে, বেশ রোদ উঠেছে, শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পাশে রোদপিঠ ক'রে একখানি বেঞ্চিতে ব'সে সহাস্য স্নেহকোমলবয়ানে কেষ্টদাকে (ভট্টাচার্য্য) বলছেন—প্রফুল্ল (দাস), বীরেন (মিত্র) এরা যদি তপোবনে successful (কৃতকার্য্য) হয়, ওদের আর কিছুতে আটকাবে না। মাল কয়টাই জুটেছে বেশ। আর, successful (কৃতকার্য্য) হওয়া মানে শুধু কয়েকখানা ঘর ক'রে ছেলে নিয়ে স্কুল ক'রে তোলা নয়। একটা University (বিশ্ববিদ্যালয়) গ'ড়ে তুলতে হবে। এমন করা চাই যাতে তপোবনের নামে সারা ভারত নতি জানায়—শুধু ভারত কেন, পৃথিবীর সব দেশ।

কেষ্টদা—শিক্ষার এই প্রথা সর্ব্বত্র চারাতে হবে, compromise (আপোস) করলে হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর— Compromise (আপোসরফা) এতটুকুও না।

কেষ্টদা—প্রফুল্ল, বীরেন যদি তেমন হয়, তাহ'লে হবে, তবে charge (দায়িত্ব ও ক্ষমতা) ওদের হাতে থাকা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো বলেছি, কাউকে সরান চলবে না, সবাইকে maintain (প্রতিপালন) করতে হবে, আর charge (দায়িত্ব ও ক্ষমতা) আগে কী? ক'রে-ক'রে আস্তে-আস্তে তা' হাতে আসে। দায়িত্ব যে নিতে জানে, ভার যে বইতে পারে, ক্ষমতা তার হাতে এমনিই এসে পড়ে।

ডাক্তার কালীদা এসে বললেন—মেডিক্যাল ডাইজেষ্টে বাতের একটা ভাল ওষুধের কথা বেরিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যারীকেও দেখাস্। নতুন যা'-কিছু পাবি, নিজেও নোট্ ক'রে রাখবি। ভাল ক'রে তৈরী হ'। মেডিক্যাল কলেজ-টলেজ যদি হয়, সব বিদ্যে কাজে লা'গে যাবি।

৩রা পৌষ, ১৩৪৭, বুধবার (ইং ১৮।১২।১৯৪০)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে পশ্চিমাস্য হ'য়ে চৌকিতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরিপদদা (সাহা), ধীরেনদা (চৌধুরী), প্রফুল্ল প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর আজ আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে কথাবার্ত্তা বলছেন, ভক্তবৃন্দ বিভোর হ'য়ে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত, কথামৃত পান করছেন। নেতা কেমন হবে সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো। প্রেমপূরিত, ললিত ভঙ্গীতে, প্রাণ-কাড়া, দরদভরা সুরে তিনি বলছেন—Leader-এর (নেতার) মুখ দিয়ে কথা বেরুবে এমন যে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, আকুল কবিল গো পরাণ' ব'লে মানুষ বোধ করবে। মুসোলিনীর কথা শুনেছি—যেমন sweet (মধুর), soft (কোমল), modest (নম্র), তেমনি uncompromising (আপোসরফাহীন)। Leader-এর (নেতার) হ'তে হবে loyal (আনুগত্যসম্পন্ন), sweet (মধুর), soft (কোমল), sincere (অকপট), active (কর্ম্মমুখর)। তার চেহারা, চাউনিই হবে এমন যে মানুষ enchanted (মুগ্ধ) হ'য়ে যাবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরেনদা সম্বন্ধে বললেন—আমি ভাবছি, ওকে জ্যাঠার ওখান থেকে এনে অন্য জায়গায় খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিই, কিন্তু আবার মনে হয় ওখানে থাকাই ভাল। যেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে opposition (বাধা), কোন ক্ষমা নেই, সহানুভূতি নেই, সেখান থেকে যদি tone ও temper (মন-মেজাজ) ঠিক রেখে, principle (আদর্শ) নিয়ে চলতে পারে, তবে তার ভিতর-দিয়ে অনেকখানি বেড়ে উঠবে। সব সাধনার এই-ই প্রকৃত স্থান। আর, difficulty-র (কষ্টের) ভিতর-দিয়ে ছাড়া কোন greatman (বড়লোক) হয়নি। উন্নতি মানেই উৎ-নতি, শ্রেয়নতি, আর তাই নিয়ে কুশল-কৌশলী নিয়ন্ত্রণে সুব্যবস্থিতির সহিত অন্তরায় অতিক্রম ক'রে আমরা যত কৃতকার্য্য হ'তে পারি—শ্রেয়-উপচয়িতায়, ততই আমরা উন্নতি লাভ করি। যাদের move for principle (আদর্শানুগ-চলন) আছে, তারা suffering-এর (দুঃখের) ভিতর প'ড়ে সেগুলি manipulate (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে experience-এর (অভিজ্ঞতার) অধিকারী হয়, বড় হয়। আর যাদের তা' নেই, তারা ওর চাপে ডুবে যায়।

প্রফুল্ল—মানুষের সহ্যের তো একটা সীমা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের fatigue layer (শ্রান্তির স্তর) break (অতিক্রম) ক'রে গেলে তখন সে যা' পারে, তাই দেখে মানুষ অবাক হ'য়ে যায়,—ভাবে অসাধারণ। কিন্তু তার কাছে সেটা স্বাভাবিক।

বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বসগোল্লা খাওয়ার লোভ জয়, উপর্য্যুপরি তিনরাত্রি স্বপ্নে পরমাসুন্দরীর আকুল প্রেমনিবেদন এবং সর্ব্বশেষে মায়ের আবির্ভাব এবং তাঁর উপদেশমতো নাম করার ফলে প্রলোভন হ'তে রেহাই পাওয়ার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ ক'রে বললেন—Clue (সঙ্কেত)-টা পেয়ে গেলাম। দেখলাম অত্যন্ত সোজা, ঝোঁকটা যখন চাপে, ততখানি speed (বেগ) নিয়ে otherwise benignly engaged (অন্যথা হিতকরভাবে ব্যাপৃত) হ'য়ে পড়লে ও-কথা আর মনেই থাকে না, আপনা থেকেই নেশা কেটে যায়।

এরপর লোকের সঙ্গে ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপন জনের মতো প্রাণস্পর্শী ব্যবহারটাই মানুষ চায়, তোমার ব্যবহার যদি বাহ্যতঃ রূঢ়ও হয়, অথচ তা'র মধ্যে ঐ জিনিসটি থাকে, তাহ'লেও মানুষ তা' পছন্দ বৈ অপছন্দ করবে না। আমি যখন ডাক্তারী করতাম, একবার একজন মুসলমানকে চিকিৎসা করছিলাম। একটু কমার পর তার বাড়ী থেকে ওষুধ নিতে আসে না, আমার তখন দিনরাত কি ভাবনা, মনটা কেবলই অস্থির-অস্থির করতো, কি জানি কী হ'লো, কেমন আছে লোকটা! তিনদিন পরে যখন ওষুধ নিতে আসলো আমি তাকে খুব বকলাম। বকা শুনে সে বলে—বাবু আপনি যে এত গালাগালি দিলেন, অন্য কেউ হ'লে আমি তাকে আস্ত রাখতাম না। কিন্তু আপনার কথাগুলি আমার এত মিষ্টি লাগছে, ইচ্ছে করছে, আপনি আরও গালাগালি করেন, আমি শুনি। আমি তখন ভাবলাম, 'ভগবান আমাকে গালাগালি করতে শিখিয়েছেন তাহ'লে।' তা' ছাড়া আমি কাউকে বেশী-কিছু কড়া কথা বলতে পারি না, এই ভয়টা যেন আমাকে ভূতের মতো পেয়ে ব'সে আছে—যা'কে আমি বকছি, পাছে সে ম'রে যায়, তাহ'লে তো আমার আর দুঃখু রাখার জায়গা থাকবে না। অবশ্য অসৎ-নিরোধের জন্য যেখানে যা' প্রয়োজন তা' করাই লাগে। তবে uncompromising (আপোসরফাহীন) হ'তে গেলে sweet (মিষ্টি) হবার অসুবিধা নেই, thrashing (বকুনি) এমনভাবে দেওয়া যায়, যা'তে মানুষ elated (উদ্দীপ্ত) হ'য়ে ওঠে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার কাছে শুনতে লাগলেন যাজন-কার্য্যাদি কোথায় কেমন হ'চ্ছে।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৪৭, বুধবার (ইং ১২।৩।১৯৪১)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর হাতমুখ ধুয়ে নিভৃত-নিবাসে এসে বসেছেন পূর্ব্বাস্য হ'য়ে, সম্মুখে দিগন্তের বিস্তার, কোন্ দূর-দূরান্তে আকাশের শেষপ্রান্তে যেন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ, মুখে তাঁর নির্ম্মল প্রশান্তি, হাব-ভাব-ভঙ্গীতে একটা সহজ বৈরাগ্য, স্বচ্ছন্দ নির্লিপ্ততা—

মহাযোগেশ্বর যেন যোগে ব'সে আছেন। একলাটি নিরালা আছেন। সত্যেনদা (সাহিত্যশাস্ত্রী) ও প্রফুল্ল এসে এককোণে চুপচাপ বসলেন। কিছু সময় এমনি কাটলো নীরব নিস্তব্ধ। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক চেয়ে খেলেন, তামাক খেতে-খেতে আলাপ সুরু হ'লো। সত্যেনদা ইষ্টভৃতি-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগভরে বলছেন—ইষ্টভৃতি করতে গেলেই যাজন ইত্যাদি সব এসে পড়ে। খেটে-পিটে যাঁকে প্রীতির সঙ্গে ভরণ করি, ভাবা-বলায় তাঁর কথা এসেই যায়, তিনি আপন হ'য়ে ওঠেন, অন্তরে বাসা বাঁধেন। ইষ্টভৃতি শুধু বামুন-পণ্ডিতের দেওয়া ব্যবস্থা নয়—মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি সকলেরই আছে। জেম্স্ও ঐ ধরণের কথা বলছেন, তবে আমাদেরটার মধ্যে তপস্যার ভাবটা বেশী আছে। 'ভবতী ভিক্ষাং দেহি' ব'লে উপনয়ন-সংস্কারের থেকে আরম্ভ ক'রে আমরণ দিনের পর দিন চলতেই থাকে। এককে কেন্দ্র ক'রে অন্য যা'-সব করা যায়, সবই integrated (সংহত) হ'য়ে ওঠে, গোড়ায় ১ থাকলে, তারপর যত শূন্যই বসাও ততই বেড়ে যায়।

বেলা গোটা নয়েকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃ-মন্দিরের বারান্দায় বসা। বাইরে দোখল প্রামাণিককে দেখে বললেন—কি পরামাণিক?

দোখল ওখানে দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তুমি অম্বা কর ক্যান? কাছে আ'সো, ব'সো, না হ'লি কি কথা ক'য়ে সুখ হয়।

দোখল হাসতে-হাসতে কাছে এসে বসলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর তার সঙ্গে পুরোনো দিনের গল্প-গুজব করতে লাগলেন।

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৭, শুক্রবার (ইং ১৪।৩।১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছনে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে দাঁড়ালেন, আরও অনেকে ছিলেন। কথা উঠলো দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্তদের কেমন ক'রে শোধরান যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাদের জন্য আলাদা রকমের স্কুল করা লাগে, তার নাম দিতে হয় Pauper Reformatory School (দারিদ্র্যব্যাধি সংশোধনী শিক্ষাগার), সেখানে তাদের বাস্তব কাজের মধ্য-দিয়ে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হয়। ধরুন, ২০০ বিঘে জমি থাকলো, সেখানে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলো, ছোট-খাট কারখানা থাকলো, শিল্পসংস্থা থাকলো, ল্যাবরেটারী থাকলো, সেখানে তারা হাতে-কলমে কাজ করলো। এমনতর স্কুলে শিক্ষক চাই খুব পাকা ধরণের—তারা হবে ইষ্টপ্রাণ, চরিত্রবান, কর্ম্মমুখর, আশা-ভরসা-উদ্দীপনাময়; তারা নিজেরা কাজ করবে, সঙ্গে-সঙ্গে ছাত্রদেরও কাজে অনুরক্ত ক'রে তুলবে elating thrash (উদ্দীপনী ধাক্কা) দিয়ে। Sham theorising-এর

(মেকী উপপত্তির) বাড়াবাড়ি থাকবে না। কাজকর্ম্ম করবে, তার সঙ্গে কিছু-কিছু literation (আক্ষরিক জ্ঞান)-এর ব্যবস্থা থাকবে, নানারকম information (সংবাদ) -ও তাদের supply (সরবরাহ) করতে হবে, তদনুপাতিক library (গ্রন্থপীঠ) থাকবে। শিক্ষক ও ছাত্র একত্রই থাকবে বোর্ডিং-এ একসঙ্গে। প্রথম অবস্থায় বাইরের অন্য pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত)-দের আবহাওয়া থেকে তাদের দূরে রাখতে হবে। তাদের এমন পরিমণ্ডলে রাখতে হবে যা'তে তাদের ভিতর self-confidence (আত্মবিশ্বাস) গজিয়ে ওঠে। পারার আনন্দটা তাদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আর, যা'-কিছুই তারা করবে, লক্ষ্য রাখতে হবে, যা'তে সাশ্রয়ে সুন্দরভাবে নিখুঁত রকমে করে। প্রত্যেকে তার কাজের full account maintain করবে (পুরো হিসেব রাখবে) তার diary-তে (রোজনামচায়)। পরস্পরের মধ্যে একটা healthy competition (জীবনীয় প্রতিযোগিতা) থাকবে। প্রত্যেককে due appreciation (যথাযোগ্য প্রশংসা) দিতে হবে। Normal economic use of time ও speed (সময় ও ক্ষিপ্রগতির সহজ সাশ্রয়ী ব্যবহার)-এ তাদের অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হবে। বৈশিষ্ট্যমাফিক labour ও output (শ্রম ও উৎপাদন)-অনুযায়ী প্রত্যেকের earning (অর্জ্জন) হবে। তাদের মধ্যে এমন একটা ঝোঁক গজিয়ে দিতে হবে যা'তে তারা নিজেদের অর্জ্জনের উপর দাঁড়িয়ে ইষ্টভরণ, আচার্য্য-ভরণ, ও আত্মপোষণ করতে পারে এবং পরিবার-পারিপার্শ্বিককেও কিছু-কিছু দিতে পারে, এটা compulsory (অবশ্য করণীয়) ক'রে তুলতে হয়। করা, পারা ও দেওয়ার আনন্দে তাদের মাতাল ক'রে তুলতে হয়। নিত্য ইষ্টকে খাওয়ান লাগবেই—এই ছিল আর্য্যপ্রথা, এই-ই সমস্ত inferiority (হীনম্মন্যতা) ও pauperism-এর (দারিদ্র্যব্যাধির) গোড়া মেরে মানুষকে attached (অনুরক্ত) , active (কর্ম্মঠ), energetic (উৎসাহোদ্দীপ্ত) ও able (যোগ্য) ক'রে তুলতো। সেইজন্য কথা আছে, গুরুকে কেবল দেবেই, গুরুর কাছ থেকে অর্থাদি নেবে না, এমন-কি নিজের অভাব-অভিযোগের কথা জানাবেও না এমনতরভাবে, যা'তে তাঁর সাহায্য করার আগ্রহ আসতে পারে। গত্যন্তরবিহীন হ'য়ে নিতান্তই যদি তাঁকে বলতে হয় তখনই বলবে যখন তুমি একান্তই অপারগ—বাস্তবভাবে। কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি চাহিদা with every effort fulfil (সর্ব্বপ্রচেষ্টায় পরিপূরণ) করতে চেষ্টা করবে;—pauperism (দারিদ্র্যব্যাধি), inferiority (হীনম্মন্যতা), psychical and physical idleness (মানসিক এবং শারীরিক আলস্য) যা'তে মানব-চরিত্রের কানাচেও ঢুকতে না পারে, তার জন্য এটা একটা cruel safe-guard (কঠোর রক্ষাকবচ)। গুরুর কাছ থেকে সুযোগ, সুবিধা, সাহায্য নেওয়ার বুদ্ধি যত বাড়ে, তাঁকে পরিপূরণের ধান্ধাটা ততটা ঢিলে হ'য়ে আসে। অথচ তৎপরিপূরণী সক্রিয় সম্বেগটাই মানুষের উন্নতি ও কৃতকার্য্যতার নিয়ামক।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের ধারে তাসুতে ব'সে আছেন। পদ্মাচরের দিগন্ত জুড়ে রাতের স্তব্ধতা থমথম করছে, আশ্রমভূমি কোলাহলশূন্য, শান্ত, দিনের কর্ম্মব্যস্ততার পর অনেকেই স্ব-স্ব ধ্যানমন্দিরে ধ্যানরত। অতিথিশালা ইত্যাদি কয়েকটি জায়গায় ২/৪ জন পাঠ, আলোচনা ও যাজনে ব্যাপৃত, মাঝে-মাঝে পল্লীর দূর ঝোপজঙ্গল থেকে শেয়ালের ডাক এসে সকলকে সচেতন ক'রে তুলছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অল্প কয়েকজন ছিলেন, এমন সময় পাবনার মোক্তার শ্রীযুত ক্ষিতীশ বিশ্বাস আসলেন। ধীরে-ধীরে আলাপ জ'মে উঠলো। জনসেবা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের কার কী সমস্যা সেটা যথাযথভাবে অনুধাবন না ক'রে আমরা যদি নিজেদের ভাবটা অন্যের উপর আরোপ ক'রে তার সমাধান করতে চাই নিজেদের রকমে, তা'তে কারো সত্যিকার উপকার করা হয় না। কুলিদের খাটুনি দেখে আমার অনেক সময় কষ্ট হ'তো, ভাবতাম, ওদের কত অসুবিধা। তাই আমি নিজে কিছুদিন ওদের সঙ্গে মিশে কুলিগিরি ক'রে দেখেছি। দেখলাম, ওরা আয় করে প্রচুর—বাবুদের থেকে বেশী করে। তা' ছাড়া ওরা বেশ সুখী; মার্জ্জিত উন্নত ধরণের জীবন-যাপনের hankering-এর (চাহিদার) বালাই ওদের নেই—খেয়ে-দেয়ে স্ফূর্ত্তি ক'রে স্থূলভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলেই খুশি। আমরা ওদের যা' problem (সমস্যা) ব'লে মনে করি, সে-সব ওদের problem (সমস্যা) নয়। অথচ আমাদের কল্পিত ধারণা নিয়ে আমরা ওদের জন্য কত হৈ-চৈ করি, আন্দোলন করি। এত আন্দোলন আমরা করি, কিন্তু মূল আন্দোলনটা করি না। আমার মনে হয়, বর্ণাশ্রমটা যদি ঠিকভাবে জাগিয়ে তোলা যায়, তবে অনেক-কিছু গোল চুকে যায়। বর্ণাশ্রমের মধ্যে unemployment (বেকার-সমস্যা) ব'লে জিনিস ছিল না, তা'তে বৃত্তিহরণ ছিল মহাপাপ, প্রত্যেকে স্ব-স্ব বর্ণোচিত কর্ম্ম করতো, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী ও পরিপূরণী হ'তো। উদরান্নের জন্য যদি বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তাদের বর্ণ-অনুচিত কাজ করতো তাহ'লে পতিত হ'তো। পয়সা না নিয়ে করলে দোষ হ'তো না। অন্যকে help (সাহায্য) করার জন্য যদি ক'রে পয়সা নেওয়া যায়, তা'ও দোষের নয়। কিন্তু পেটের দায়ের জন্য যখন মানুষ ভালমন্দ বিচার করে না, সমাজের শৃঙ্খলা মানে না, তখন তার আর কিছুই থাকে না।

১লা চৈত্র, ১৩৪৭, শনিবার (ইং ১৫।৩।১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে তাসুতে ব'সে আছেন, এক-এক ক'রে অনেকে এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। তখনও সূর্য্য ওঠেনি, স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে আশ্রমের সামনেকার বকুল গাছগুলি ঈষৎ আন্দোলিত হ'চ্ছে, বাঁশবন ও ঝাউ-ঝোপ থেকে মাঝে-মাঝে পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে প্রসন্ন-বদনে কথাবার্ত্তা বলছেন।

নিবারণদা (বাগচী) এসে প্রণাম ক'রে যাজনকাজ-সম্বন্ধে বললেন—আমি যশোহরের সর্ব্বত্র ঘুরে-ঘুরে কাজ করছি এবং দীক্ষাও সর্ব্বত্র কিছু-কিছু হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নানা জায়গায় টুঁ মারা মন্দ নয়, কিন্তু জায়গায়-জায়গায় concentrate (কেন্দ্রায়িত) ক'রে পাঁচশো কিংবা হাজার সৎসঙ্গী ক'রে consolidate (সঙ্ঘবদ্ধ) করা দবকার। স্থানীয় কর্ম্মী সৃষ্টি করতে হয়। তাদের সাহায্যে প্রত্যেকটি মানুষকে nurture (পোষণ) দিয়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি-পরায়ণ ক'রে তোলা লাগে। আর, আশ্রমে লোক খুব পাঠাতে হয়। সামগ্রিকভাবে পরিবারগুলি যা'তে দীক্ষিত হ'য়ে ওঠে এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ইষ্টীচলনে ও সদাচারে অভ্যস্ত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা লাগে। তাদিগকে সব-ভাবে উচ্ছল ক'রে তুলতে হয়। কতকগুলি সচ্ছল, সক্ষম, শান্তিময়, ইষ্টপ্রাণ পরিবার যদি গ'ড়ে তুলতে পার, তার ফলে তাদের পরিবেশ ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সেটা চারিয়ে যাবে। আর, পারস্পরিক সেবা-বিনিময়ের ব্যবস্থা এমন ক'রে করবে যা'তে একটা লোকও না খেয়ে না থাকে, একটা লোকও পড়তে না পারে। একটা যজমানও যদি জীবনের পথে হ'টে যায়, জানবে, সে তুমিই হ'টে গেলে। দিনরাত মাথা খাটান চাই—কেমন ক'রে পারস্পরিক সাহায্য ও সেবার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকটি লোককে দাঁড় করিয়ে দিতে পার। নিজের ছাওয়াল-পাওয়ালের জন্য যেমন বোধ কর, তাদের জন্যও সেইরকম active feeling (সক্রিয় বোধ) চাই, তাতে তোমাদেরও মাথা খুলে যাবে, যোগ্যতা বেড়ে যাবে। এইভাবে যদি চল, সবটা মিলে একটা শক্তি হ'য়ে দাঁড়াবে। আর, শ্রেষ্ঠযাজী হওয়া চাই!

এর খানিকটা পর অমূল্যদা (ঘোষ) প্রেস থেকে একটি জিনিস ছাপিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাতে নিয়ে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাতে নিয়ে ভাল করে দেখে বললেন—বেশ হইছে। আরো ভাল টাইপ আনা! তোমাদের প্রেসকে এদেশের সেরা প্রেস ক'রে তোলা চাই। ভাল মেসিনের খোঁজ রাখিস্।

৪ঠা চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৪৭ (ইং ২৮।৩।১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বাঁধের ধারে তাসুতে ব'সে খুশিমনে গল্পসল্প করছিলেন। বীরেনদা (মিত্র), প্যারীদা (নন্দী), অমরভাই (ঘোষ), প্রফুল্ল এবং মায়েদের মধ্যে কালিদাসীমা, কালীষষ্ঠীমা, সরোজিনীমা, গৌহাটির মা, মানদামা (প্রফুল্লর মাতা) প্রমুখ অনেকেই ছিলেন। Distorted libido (বিকৃত সুরত) সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Distorted-দের (বিকৃতদের) চাল-চলন সব-সময় হয় উল্টো। যাকে সে পছন্দ করে, বাইরে হয়তো দেখাবে, জোর গলায় ব'লে-ব'লে বেড়াবে,

তাকে সে আদৌ পছন্দ করে না, আবার যাকে হয়তো সে পছন্দ করে না সেখানে হয়তো আদরের ছড়াছড়ি করবে। সে হয়তো কাউকে চুমু খেতে চায়, কিন্তু নিজে চুমু খাবে না, অন্যকে দিয়ে খাওয়াবে, নিজে খেলে পাছে লোকে তার মনোগত ইচ্ছার বিষয় জেনে ফেলে। তারা একের অভাব অন্যকে দিয়ে পূরণ করতে চায়, পর-পর বিভিন্ন মানুষের পিছনে এইভাবে ছোটে, তাই শান্তি পায় না। Distorted (বিকৃত)-দের tackle (পরিচালনা) করতে গেলে, sexual plane-এ (যৌনস্তরে) বন্ধু হওয়া লাগে, নিজে ঊর্দ্ধে থেকে। খুব সাবধান হ'য়ে চলা লাগে, নচেৎ তার impulse carry (সাড়া বহন) ক'রে-ক'রে মানুষ নিজেও বিগড়ে যেতে পারে। অটুট ও কঠোর ইষ্টপ্রাণ যারা sex (যৌনজীবন)-এর উপর complete mastery (পূর্ণ আধিপত্য) যাদের আছে, তারাই এটা পারে। তা' ছাড়া, এ ব্যাপারে লাগে বহু subtle psychological operation (সূক্ষ্ম মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া)। তাই, যার-তার এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। আর, এক-একটা মানুষের পিছনে খাটুনিও লাগে অসম্ভব। অতখানি ধৈর্য্য, সহ্য, অধ্যবসায় কম মানুষেরই থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে স্নেহব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—দ্যাখো, তোমাদের একটা কথা বলি, ছেলেপেলেদের কোন ঝোঁক জোর ক'রে ভেঙ্গে দিতে যেও না। তাতে হয়তো নিবৃত্ত হ'তে পারে, কিন্তু distortion-এর (বিকৃতির) সূত্রপাত হয়। তাই, মন্দ ঝোঁক হ'লেও কায়দা ক'রে মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। মানুষের ঝোঁকের মধ্যে জড়িত থাকে তার সম্বেগ। তাকে ডাঙ্গশ মেরে ভেঙ্গে দিলে সে হতভম্ব হ'য়ে ওঠে, দিশেহারা হ'য়ে পড়ে কিন্তু, 'হ্যাঁ', 'না' ভালমন্দ পছন্দ-অপছন্দের একটা সহজ সুস্থ জীবনীয় বিন্যাস হয় না তার ভিতরে। 'হ্যাঁ', 'না' idea (ধারণা) দু'বছরের মধ্যেই এস্তামাল করিয়ে দিতে হবে। কোন বিষয়ে 'না' না-ব'লে, 'না' কেন তার বুঝটা তার মাথায় তার মতো ক'রে ধরিয়ে দেওয়ার কায়দায় বলতে হবে with right pose and expression (যথাযথ ভঙ্গী ও ব্যঞ্জনা-সহ)।

প্রফুল্ল—প্রত্যেকটি বিষয়ে আপনি যা'-যা' করতে বলেন, করা বড় কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন কিছু না। ভিতরে অনিচ্ছা থাকলে বা অন্যরকম ইচ্ছা থাকলে কঠিন লাগে। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা যার নেশার মতো পেয়ে বসে, তার কাছে কঠিন বোধ থাকে না। কথা তো ঐ এক কথা—তাঁর সুখই আমার সুখ, তাঁর স্বার্থই আমার স্বার্থ। মানুষ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বার্থের জন্য যেমন করে, ইষ্টের জন্য সেইটুকু করা—এ তো হাতী-ঘোড়া কিছু না; আর, এর মধ্যে তত্ত্বের ব্যাপারও কিছু নেই। ঐ ঝোঁকটা এসে গেলে তখন মানুষ সব পারে, আর, তাতে কষ্টের বোধ থাকে না। আমি যে কতখানি সুখী, trouble (কষ্ট)-গুলি trouble-ই (কষ্টই) মনে হয় না। করতে হবে—এই নেশা।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কথার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেনদা প্রমুখের কাছে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি শব্দগুলির মানে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা এক-এক ক'রে শব্দগুলির মানে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহ'লেই দাঁড়ালো, দমন, পীড়ন ও কথন-বিন্যাসে মানুষকে সঞ্চালিত করতঃ স্থৈর্য্যের সহিত প্রাপ্তিকে যিনি সংঘটিত করান, তিনিই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।

এইসব কথাবার্ত্তা চলছে, এমন সময় কিশোরীদার ঘরের বারান্দায় একটি দাদা খঞ্জুরী বাজিয়ে আকুলভাবে গাইছেন—

তুমি হে দীনবন্ধু, পার কর ভবসিন্ধু
অকূলে ফেলো না আমারে।

গান শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন আনমনা হ'য়ে গেলেন। দৃষ্টিতে তাঁর রহস্যঘন অতলস্পর্শ তন্ময়তা, মুখে এক অপূর্ব্ব দিব্য ভাবাবেশ।

৬ই চৈত্র, ১৩৪৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২০।৩।৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-নিবাসে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য), নিবারণদা (বাগচী) প্রমুখের সঙ্গে আনন্দ-উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে কথাবার্ত্তা বলছেন। কণ্ঠস্বরে ও চাউনিতে তাঁর কী যেন যাদু—তার ভিতর-দিয়ে তাঁর অপার বিশ্বাস ও আশাবাদিতা মুহূর্ত্তে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে যায়।

যুদ্ধবিগ্রহ ও তজ্জনিত নানা অসুবিধার বিষয়ে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যুদ্ধবিগ্রহ যা' হ'চ্ছে তাতে যে-কোন result-ই (ফলাফলই) হোক না, পরমপিতার দয়ায় আপনাদের সুবিধাই হবে। আপনাদের কিছুতেই আটকাতে পারবে না। আপনাদের মানুষ যোগাড়ের কথা বলি, উপযুক্ত কর্ম্মী-সংগ্রহের কথা বলি, আরো ভাল কর্ম্মী পেলে আপনারা আরো কতখানি করতে পারতেন। ভাল-ভাল কর্ম্মী জোগাড় করা ছাড়া পথও নেই। আপনারা ক'টা মানুষ, কোন্ দিক ঠেকাবেন? যেমনতর দিন আসছে তাতে সারা দুনিয়ার মানুষের আর কোন পথই থাকবে না। পরমপিতার এ মহা-অবদানের জন্য সবাই তৃষিত হ'য়ে উঠবে। দেখবেন আপনাদের অপ্রস্তুতির জন্য সেদিন যেন কেউ বঞ্চিত না হয়।

কোন একজনের অসাক্ষাতে তার চলনার অসঙ্গতি-সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে তীব্র আলোচনা হচ্ছিল। সেই আলোচনা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বাধা দিয়ে বললেন—অমনতর আলোচনা করলে মনের অবস্থা এমন হবে যে, ওকে আর tolerate (সহ্য) করতে পারবি না, toleration (সহ্যশক্তি) না থাকলে tackle করতে (নিয়ে চলতে)

পারবি না, ওর কেবল দোষই দেখবি, morale (নীতিবোধ) খারাপ হ'য়ে যাবে। তাই ব'লে এ মনে করিস না যে, আমি ওর বাস্তব দোষটা সংশোধন করতে বারণ করছি। তা' ঢের করবি। তা' না করলে তো ওর সঙ্গে শত্রুতা করা হবে। তবে কারও সম্বন্ধে এমনতরভাবে সমালোচনা করা বা মনোভাব পোষণ করা ভাল না, যা'তে তার প্রতি মন বিরূপ হ'য়ে ওঠে, সহানুভূতি লোপ পায়। দোষটাকে ঘৃণা কর, কিন্তু, দোষীকে ঘৃণা করলে তাকে শোধরাতে পারবে না। দোষদীর্ণ যারা, তোমাদের ভালবাসার প্রয়োজন তাদেরই সব চাইতে বেশী, কারণ, সেই ভালবাসা পেয়ে তারা তোমাদের যত ভালবাসতে শিখবে, শ্রদ্ধা করতে শিখবে, ততই তাদের কল্যাণ—অবশ্য তোমরা যদি ইষ্টানুগ চলনে চল।

ক্ষেত্রমা আসলেন কলকাতা থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে দেখে খুব খুশি হ'য়ে সহাস্যে সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—কি রে, কখন আলি? তোর শরীর তো খুব ভাল হইছে। কত বড় টিউমার হইছিল, দেখি?

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে তামাক খাচ্ছেন এবং প্রসন্ন হাসিতে সকলের মুখপানে চেয়ে তাদের অন্তর যেন পরিপ্লাবিত ক'রে দিচ্ছেন। এরপর ectoplasmic body (লিঙ্গশরীর)-সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হ'লো।

প্রফুল্ল—একটা মানুষের যখন জন্ম হয়, তখন তার পূর্ব্বজন্মের ectoplasmic body (লিঙ্গশরীর)-টার অবস্থা কী হয়? শুনেছি, সেটা যেখানে সঙ্গতি পায় সেখানে এসে রূপায়িত হয়। সে তো একটা শরীর, আর পিতামাতা থেকে আমরা পাই আর-একটা শরীর। এই দুই শরীরের সামঞ্জস্য খুঁজে পাই না। আবার, সে-শরীরটা এই শরীর বা পিতামাতার শরীরে ঢোকে কখন কী-ভাবে—এও তো এক সমস্যা, আর ঢোকেই বা কী ক'রে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে ভাব বা ভাব-দেহ (ectoplasmic body) নিয়ে off (বিগত) হই, সেই ভাব বা ভাব-দেহের tuning (সঙ্গতি) যে-দম্পতির উপগতিকালে সৃষ্টি হয়, সেইখানেই আমাদের অর্থাৎ সেই ভাব বা ভাব-দেহের পুনরাবির্ভাব হয়। ভাব-দেহটা এতই সূক্ষ্ম যে সে যে-কোন স্থানে যে-কোন মুহূর্ত্তে প্রবেশ করতে পারে, তা'তে তার আটকায় না। আর প্রকৃত প্রস্তাবে ভাব-দেহ ও পিতামাতা থেকে প্রাপ্ত দেহ যে আলাদা তা' নয়, ঐ ভাবদেহেরই জৈবী রূপায়ণই যেন এইটে। তুমি ও তোমার ফটো যেমন আলাদা দুটো মানুষ নয়, এও তেমনি। ভাবদেহ তথা পিতা-মাতার gene (জনি)-তে আমরা যেন বীজাকারে থাকি, আর সেইটেই যেন বৈধী বিধানের ভিতর-দিয়ে ফুটে ওঠে। ...... যাই বল, মানুষের অমৃতত্ব লাভ না হ'লে কিছুই হ'লো না। অমৃতত্ব অমৃতত্ব কই, তারও মূল কথা হ'লো স্মৃতিবাহী চেতনা। আমার জানাটা যদি environment-এ (পারিপার্শ্বিকে) conscious identification

(চেতন সনাক্তকরণ) না পায়, তবে তার সার্থকতা কী? তবে একলার স্মৃতিবাহী-চেতনা হ'য়ে সুখ নেই, অনেকের হয়, তবে 'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্' হ'য়ে আনন্দ করা যায়। ......

এক-একটা জন্তুকে দেখে কোন মানুষের কথা, আবার কোন-কোন মানুষকে দেখে এক-একটা জন্তুর কথা পট ক'রে মনে পড়ে। আমি ভাবি, এ-সব কী, তবে আমি তো পাগলও না।

শরৎদা destiny (ভাগ্য), দৈব ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অভিধান থেকে destiny-র ধাতুগত অর্থ দেখতে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে বা যা' নিয়ে আমার স্থিতি, অবস্থান বা দাঁড়ানটা দাঁড়িয়ে আছে তাই-ই আমার ভাগ্যের নিয়ামক। অর্থাৎ, আমার ভজনা যেমন, ভাগ্যও তেমন। মানুষের অনুরাগ ও সেবা যাকে ধ'রে যে-পথ বেয়ে যেমন চলবে, তার ভাগ্যও হ'য়ে উঠবে তেমনি।

আর, দৈব কথাটাও এসেছে দিব্-ধাতু থেকে, তার মানে প্রকাশ। যে চরিত্র, চলন ও বুদ্ধি আমার মধ্যে প্রকাশিত, প্রকট ও দীপ্ত, আমার কর্ম্মও হয় তেমন, ব্যবহাবও হয় তেমন, আর প্রাপ্তিও হয় তেমনতর, বিধির বিধানে, পারিপার্শ্বিকের ভিতর-দিয়ে। মানুষ এই সহজ কথাগুলি বোঝে না, না-ক'রে পাওয়ার বুদ্ধিতে কত mal-psychology (বিকৃত মনোবিজ্ঞান) ঝাড়ে।

৮ই চৈত্র, ১৩৪৭, শনিবার (ইং ২২।৩।১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে নিভৃত-নিবাসে বসেছেন। নিভৃত-নিবাসটি যেন ঘরের মধ্যে ঘর, তিনদিক আঁটা-সাঁটা দেওয়াল দেওয়া, সামনে দক্ষিণ দিকটা খোলা। ঘরখানির উপরে কুঞ্জলতাদির বেষ্টন, ঘরের মাঝখানে একটি তাসু, তাতে বিছানা পাতা, পাশে র‍্যাকে ক'রে কতকগুলি বইপত্র, তার পাশে ঘড়ি, কলম, খাতা ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসেন। সামনে বিরাট মাঠ ও চর, ৮/১০ মাইল অর্থাৎ কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত ফাঁকা, অদূরেই মাঠের মধ্যে হ্রদেব মত একটা বিরাট জলাশয়, নিভৃত-নিবাসের ৫০/৬০ হাত দূরে কাছাকাছি কযেকটা বন-ঝাউ গাছ, ঝাঁকে-ঝাঁকে কতরকমের পাখী সেখানে উড়ে এসে বসে, আবার আচম্বিতে কলরব ক'রে উড়ে যায়। মাঠে কৃষকরা চাষবাষ করে, সেখান থেকে আনন্দে গান গেয়ে সোনার শস্য ঘরে তোলে। আকাশের আলোছায়া, রোদ-বাদল, জ্যোৎস্না-অন্ধকার, দিগ্‌বলয়ের নানা রঙীন লীলা এখান থেকে পুরোমাত্রায় উপভোগ করা যায়। বর্ষাকালে পদ্মা যখন

ফেঁপে-ফুলে আশ্রমের পাদদেশ পর্য্যন্ত ধেয়ে আসে তাকে ধৌত করতে, তখন এ-ঘরের আকর্ষণ হয় আরো সুনিবিড়। চারিদিক জলে জলাকার, মাঝি-মাল্লারা পাল তুলে সারিগান গেয়ে দলে-দলে নৌকা বেয়ে যায়, জেলেরা ডিঙ্গী নৌকায় মাছ ধরে, আর ক্রমাগত জলের ঢেউগুলি বাঁধের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে, আর সেই শব্দ যেন মনকে সবকিছু থেকে টেনে নিয়ে যায় দূরে—অতিদূরে, অন্তরের অন্তঃপুরে—প্রিয়তমের সোহাগ-সিক্ত মণিমন্দিরে। এই নিভৃত-নিবাসে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে (ভট্টাচার্য্য) বলছেন—যেখানে যার প্রয়োজন, সেখানে তাকে দিয়েই কাজ করাবেন। এক জায়গায় প্রফুল্ল, বীরেনের দরকার হ'লো, আর এক-জায়গায় হয়তো ব্রজেনদার দরকার হ'লো—যখন যেখানে যাকে দিয়ে হয়। মানুষগুলি ঠিক-ঠিক লাগাতে পারলে, অল্প মানুষ দিয়েও ঢের কাজ হয়। প্রত্যেককে যথাস্থানে লাগান, যোগ্যতায় উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা এবং পারস্পরিক যোগসূত্র সৃষ্টি ক'রে পরস্পরকে পরস্পরের সহায়ক ক'রে তোলা এই-ই organisation (সংগঠন)। আমি যে এত কাণ্ড করেছিলাম—আমার hand (কর্ম্মী) ছিল মাত্র কিশোরী আর মহারাজ, পরে আসলো গোঁসাই। এদের সব শিখিয়ে দিতাম, তাই এরা গল্প করত। কোথায় কী করতে হবে, কী বলতে হবে ব'লে দিতাম, সেইমত ওরা চলতে-বলতে চেষ্টা করতো, এর ফলে ব্যাপার তো নেহাৎ কম হয়নি তখন। এরা যে খুব পণ্ডিত বা বিদ্বান তা'ও তো নয়। তবে ওদের টান ছিল তরতরে—ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই থাক না কেন। ওরা তখন নেশাখোরের মতো চলতো, এই নিয়ে মাতাল হ'য়ে থাকতো। অমনটা না হ'লে কাজও হয় না। সে কী দিনই গেছে! আবার ঐ রকমটা জাগিয়ে তুলুন। একটা ছোট্ট nucleus (কেন্দ্র) হ'লে সেইটেই দেখবেন চারিয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-নিবাস থেকে বেরিয়ে তাসুতে এসে বসলেন। ধীরে-ধীরে লোকজন আসতে লাগলো, পর পর তিনটি দাদা আসলেন, একজনের অসুখ, একজনের অভাব, আর একজনের সহকর্ম্মীর সঙ্গে অসঙ্গতি। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেককে যথাযোগ্য সমাধান ও ব্যবস্থা দানে উদ্দীপ্ত ক'রে তুললেন। সহকর্ম্মীর সম্বন্ধে যিনি অনুযোগ করছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—প্রত্যেকের একটা ধরণ আছে, এই ধরণটা বুঝে যে-যে জায়গায় তার সঙ্গে লাগে সেই সব জায়গায় একটু পাশ কাটিয়ে গেলেই হয়।

এরপর কেষ্টদা সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ-সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সর্বজ্ঞত্ববীজ মানে এ নয় যে Materia Medica (মেটিরিয়া মেডিকা)-খানা তার মুখস্থ। সর্ব্বজ্ঞত্ববীজের তাৎপর্য্য হ'লো—তা' থাকলে মানুষ যে-কোন situation (অবস্থা) বা affair (ব্যাপার)-এ পড়ুক না কেন, সেখানে বিহিত

সমাধান বা বৈধী করণীয় কী তা' সে বুঝতে পারে, বলতে পারে। একটি সত্যই নানারূপে লীলায়িত হ'য়ে উঠেছে নানা বৈশিষ্ট্যে, এর মূল mechanism (মরকোচ) যে উপলব্ধি করে, তার মধ্যেই সর্ব্বজ্ঞত্বের সম্ভাবনা ফুটে ওঠে। তাই সর্ব্বজ্ঞত্ব বলেনি, সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ বলেছে। বীজ কথাটার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে।

পাতঞ্জলে আর-একটা শ্লোক আছে—'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ'। তার মানে এ নয় যে তিনি অর্থাৎ অবতার-কল্প পুরুষ ক্লেশ বোধ করেন না। তিনি বোধ করেন সব, কিন্তু তাতে অভিভূত হন না, unbalanced (সাম্যহারা) হন না। অনেকে বলে, তিনি সুখে সুখী হন না, দুঃখেও কষ্ট পান না, সব তাঁর কাছে অভিনয়—এ কিন্তু একটা অস্বাভাবিক ধারণা। অনেকে এই ধারণায় তাঁর প্রতি cruel indifference (নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য) নিয়ে চলে, এটা যে কতখানি সর্ব্বনেশে ব্যাপার তা' ব'লে শেষ করা যায় না। কথা হ'লো, তিনি আমাদের মতো সুখ-দুঃখ বোধ করেন, তাঁর মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম তীক্ষ্ণ ও তাজা ব'লে তিনি বোধহয় আমাদের থেকে একটু বেশী ক'রেই বোধ করেন। তিনি খান, দান, বেড়ান। তাঁর অসুখ-বিসুখও করে, মনও খারাপ হয়। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও তিনি এ ছাড়া অনেক কিছু; আর, স্বীয় সত্তার চেতনা হারিয়ে তিনি কখনো আত্মহারা হন না। আমি হাসি, কাঁদি, যাই করি—আমি যে শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ছেলে এটা ভুলিয়ে দিতে পারে না।

এরপর sexology (যৌন-বিজ্ঞান)-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতহাস্যে বললেন—Sexology-সম্বন্ধে আমি যত কথা বলেছি, তা' বাৎস্যায়নের মতো না হ'লেও তার বাচ্চার মতো।

কেষ্টদা চাণক্যের মাতৃভক্তির প্রসঙ্গে বললেন—গল্প আছে, একদিন একজন দৈবজ্ঞ এসে চাণক্যের মাকে বলেছিলেন যে, চাণক্যের সামনের দাঁতগুলি যেমন উঁচু, এটা একটা পবম সুলক্ষণ, ও একদিন রাজা হবে। চাণক্য তখন বাড়ীতে ছিল না, পরে যখন বাড়ীতে ফিরে আসল, সেই সময় মা কৃত্রিম অভিমানভরে বললেন—দৈবজ্ঞ বলছে, তোমার যেমন দাঁত উঁচু, একদিন তুমি রাজা হবে, রাজা হ'লে তো আমাকে ভুলে যাবে, তখন কি আর আমার কথা মনে থাকবে? চাণক্য সেই কথা শুনে তাড়াতাড়ি গিয়ে নোড়া দিয়ে তাজা দাঁতগুলি ভেঙ্গে ফেললেন। তাঁর কথা হ'লো, দাঁত থাকলে যদি রাজা হ'তে হয়, এবং রাজা হবার ফলে যদি মাকে ভুলে যেতে হয়, সে দাঁত রেখে লাভ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই হ'লো আদত মাল। তোমার এমন কোন প্রবৃত্তি বা পছন্দ থাকবে না, যা' প্রেষ্ঠকে ছাপিয়ে ওঠে, যা' তুমি quickly (ত্বরিতভাবে), easily (সহজভাবে) ও willingly sacrifice (স্বেচ্ছায় ত্যাগ) করতে পার না প্রেষ্ঠের জন্য। ঐ ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্নতা—সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা, ও-ছাড়া আর কথা নেই। গীতায় যে এত কথা তারও সার এই।

শ্রীশ্রীঠাকুর চক্রপাণিদাকে (দাস) তাড়াতাড়ি চ'লে এসে তপোবনকে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে চেষ্টা করতে বললেন। নিবারণদাকে (দত্ত) বললেন—নিবারণদা! আপনি with every urge and energy (আবেগ ও উৎসাহ-সহকারে) ক্ষিতীশদাকে (সান্যাল) assist (সাহায্য) করুন।

নিবারণদা—আমি কি পারব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! কেন পারবেন না? খুব পারবেন, আপনি টাকা collection (সংগ্রহ) করুন, দালানগুলি তুলে ফেলুন।

নিবারণদা—আপনার আশীর্ব্বাদ থাকলে পারব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ কী? এই-ই তো আমার প্রাণের ক্ষুধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর আহেদকে বললেন—আমাকে কয়েকটা ভাল কলার চারা জোগাড় ক'রে দিতে পারিস্?

আহেদ—তা' পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে দিস্। আমি কয়েকজনকে বাড়ীতে কলাগাছ লাগাবার কথা কইছি। তারা নিজেরা জোগাড় করবে কিনা ঠিক কি? অন্ততঃ জোগাড় ক'রে দিলি যদি লাগায়।

১১ই চৈত্র, ১৩৪৭, মঙ্গলবার (ইং ২৫।৩।১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-নিবাসে (পাবনা কেন্দ্র-সৎসঙ্গ) কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) সত্যেনদা (সাহিত্যশাস্ত্রী) প্রমুখের সঙ্গে নানা কথা আলোচনা করছিলেন। আহার-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মা যে আপনাদের ভাত মেখে হাতে-হাতে দলা ক'রে দিতেন, অত কম খেয়েও আপনারা বেশ ছিলেন, কত কাজ করতে পারতেন। আগেকার মতো কাজ এখন তো আর হয়ই না। তখন রাতেই যেন কাজের জোর বাঁধতো। সন্ধ্যার আগেই সব আলো জ্বালান হ'তো। আলো জ্বেলে সারারাত কাজ চলতো। তখন আপনাদের দিন-রাত জ্ঞান ছিল না, ভূতের মতো খাটতেন, খাওয়া তো ছিল ঐ। তাই মনে হয়, মনে যদি ইষ্টের জন্য নেশা থাকে, সম্বেগ থাকে, তবে অতি অল্প আহারেই মানুষের চলতে পারে, আর তা'তে সে সুস্থ ও কর্ম্মঠ থাকে। আর, ঐ নেশার কমতি যদি হয়, ভোগের দিকে মন যদি যায়, তখন ঐ ভোগের উপকরণ যতই বাড়ুক কোনটাই আর গায়ে লাগে না, প্রকৃত পুষ্টি সরবরাহ করে না, বরং আলস্য, অবসাদ, রোগ-বালাই-ই বাড়তে থাকে। যারা যত প্রত্যাশাহীন, সুনিষ্ঠ ও কর্ম্মমাতাল, তারাই তত সুখী হয়। যাদের প্রত্যাশা নেই, তারা সামান্য পেলেও তাতে মহাখুশি হ'য়ে ওঠে, না পেলেও তাদের আপসোস থাকে না। কিন্তু

প্রত্যাশাপীড়িত যারা, তারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হ'তে পারে না, তাই তাদের সুখ আর হয় না।

পাওয়ার প্রত্যাশা রাখার থেকে, দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখা বরং ভাল। তাতে মানুষের যোগ্যতা বাড়ে, পাওয়াটা বরং সহজ হ'য়ে আসে। আগে পরস্পর পরস্পরকে সেবা দেবার আগ্রহে ঘুরতো। একজনের কাপড়খানা ময়লা হ'লে কোন্ ফাঁকে যে আর-একজন তার অগোচরে সেটা কেচে দিয়ে আসতো তা' যার কাপড় সে ঠিকই পেতো না। আশ্রমের যাত্রী ষ্টীমার-ঘাটে কেউ এসে নামলে, তাব মাল ব'য়ে আনার জন্য সৎসঙ্গীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যেত। কারো অসুখ করলে এত লোক খবর নিতে আসতো যে ভিড় ঠেকাবার জন্য নোটিশ দেওয়া লাগতো। আমি তখন কারো সেবা নিতাম না, বরং নিজ হাতে সকলের জন্য যতটুকু পারি করতাম। কিন্তু অনেকে সেবা করবার আগ্রহ নিয়ে ঘুরতো, তারা কোন সুযোগ না পেলে ক্ষুণ্ণ হ'তো, কান্নাকাটি করতো, তাতে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কোন-কোন ক্ষেত্রে সায় দিতে হয়েছে, পরে আবার অসুখ হ'লো, অন্যের সেবা নিতে বাধ্য হলাম, সেই থেকে কেমন হ'য়ে গেল। আমি তো আগে বুঝতেই পারতাম না, অন্যের সেবা নেবার আমার প্রয়োজন কী!

শ্রীশ্রীঠাকুর দীপ্ত আবেগে বলতে লাগলেন—ফলকথা, তোমরা কয়েকজন ঠিক হলেই হ'য়ে যায়। Conviction (প্রত্যয়)-ই বড় জিনিস, আর এটা শক্ত কিছু নয়। এই মুহূর্ত্তেই morality-র (নৈতিকতার) মোড় ফিরিয়ে দেওয়া, বলা yes (হ্যাঁ), আর চাল-চলন, কথা-কায়দা তদনুযায়ী করা, suffering-এর (দুঃখকষ্টের) জন্য প্রস্তুত হওয়া, —এতেই হ'য়ে যায়। এমন conviction (প্রত্যয়) থাকা চাই যে শরীরটাকে খণ্ড-খণ্ড ক'রে কেটে ফেললেও টুকরোগুলি বলতে থাকবে, 'আয়নল হক, আয়নল হক'।

তাঁর চোখ দুটি জ্বলছিল। মুখে আনন্দের দিব্য জ্যোতি, কণ্ঠস্বরে তীব্র প্রেরণার তড়িৎ-দীপনা। তিনি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ব'লে চলেছেন—অবতার কথা-টথা আমার ভাল লাগে না। আমাকে অবতার বলা সেইদিনই সাজবে যেদিন তোমরা প্রত্যেকে অবতার হ'য়ে উঠবে—একেবারে চুলের ডগা থেকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল পর্য্যন্ত আমান। রামকৃষ্ণ-ঠাকুর, চৈতন্যদেব প্রভৃতিকে যে লোকে অবতার বলে, আমার মনে হয় যেন taunt (ঠাট্টা) করে। নিজেরা তাঁদের স্বার্থ-প্রতিষ্ঠার কিছু না ক'রে, তাঁদের ঈঙ্গিত পথে না চ'লে বরং উল্টো পথে চ'লে মুখে-মুখে শুধু অবতার বলা। অবতার কথাটা যেন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আজকালকের রসগোল্লার মতো, মর্য্যাদা ক'মে গেছে। আগের রসগোল্লা তো খাস্‌নি। সেইজন্য আমি 'অবতার' কথা use (ব্যবহার) না ক'রে বলেছি প্রিয়পরম। ওতে যেন আত্মীয়তার বোধ রয়েছে। কেউ যদি

meeting-এ (সভায়) দাঁড়িয়ে ইষ্ট-সম্বন্ধে তেমন ক'রে বলে—"তুমি আমার! তুমি আমার! তুমি আমার!" সে হাজার-হাজার লোকের প্রাণকে স্পর্শ ক'রে আকুল ক'রে তুলতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যে যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হো'ক না কেন, তার বংশে যদি প্রতিলোম-সংমিশ্রণ না হ'য়ে থাকে, তবে তার বংশানুক্রমিক জীবিকা, অভ্যাস, আচার, ব্যবহার অনুপাতিক তার বর্ণ-নিরূপণ ক'রে বর্ণাশ্রমের বিধি অনুযায়ী তাকে পরিচালিত করা যেতে পারে। বর্ণাশ্রম একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার; এটা সার্ব্বজনীন। সহজাত সংস্কার-অনুপাতিক সমাজের বৃত্তি-নির্ব্বাচন, শ্রেণী-বিন্যাস এবং বৈধী বিবাহের ভিতর-দিয়ে বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধারাবাহিকতায় অক্ষুণ্ণ রেখে বংশপরম্পরায় প্রগতিপন্ন ক'রে তোলাই হ'চ্ছে এর মূল কথা। পৃথিবীর প্রত্যেকটি সমাজকে যদি এমন বিধিবদ্ধভাবে সাজিয়ে তোলা যায়—তাদের বৈশিষ্ট্যের আপূরণী ক'রে, তবে বিহিত অনুলোমক্রমে পারস্পরিক পরিণয়-নিবন্ধও সৃষ্টি করা যেতে পারে। পূরয়মাণ এক আদর্শ ও অনুলোম বিবাহ যেমন একটা জাতকে একগাট্টা ক'রে তোলে, তেমনি ক'রে তা' সমগ্র বিশ্বকেও সংহত ও ঐক্যবদ্ধ ক'রে তুলতে পারে—পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যানুগ সংহতি নিয়ে। পরমপিতার দয়ায় বিশ্বশান্তির এই যা' এৎফাঁক বের হয়েছে, এ একেবারে চরম এৎফাঁক, এখন তোরা মাথায় নিয়ে করলেই হয়।

১২ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৪৭ (ইং ২৬।৩।১৯৪১)

প্রফুল্লর (দাস) বাড়ীতে বাইরে থেকে একজন সৎসঙ্গী ভাই এসে উঠেছেন পরিবারবর্গসহ। যিনি এসেছেন তিনি টি, বি, রোগী। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে প্রফুল্লকে বাড়ীব ভিতর ডাকিয়ে নিয়ে বললেন—তোদের জন্যই আমার যত ভাবনা। তোরা যদি সাবধান না হ'স, আমার উদ্বেগের অন্ত থাকে না, আতঙ্কে দিন কাটে। সদাচার সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার হ'তে হয়, নচেৎ কোথা থেকে কোন্ infection (সংক্রমণ) ঢোকে, তার কি ঠিক আছে? ওকে (রুগ্ন ভাইটিকে)-ও বুঝিয়ে বলিস যাতে ও সবার সঙ্গে না মেশে—বৌ, ছেলে-পেলে থেকে দূরে থাকে। বলবি—তুমি তো সেরে উঠবে, ওষুধ খাচ্ছ, কিন্তু অন্য কেউ যদি পরে affected (আক্রান্ত) হয়, তাহ'লে সকলেরই সর্ব্বনাশ। যেন মনে ব্যথা না পায়, বুঝিয়ে বলিস।

শ্রীশ্রীবড়মা সেখানে ছিলেন, তিনিও ভাল ক'রে বুঝিয়ে বললেন—কেমনভাবে বলতে হবে।

১৩ই চৈত্র, ১৩৪৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২৭।৩।১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সকালে নিভৃত-নিবাসে বলছিলেন—অর্জ্জন-পটুত্ব, সাশ্রয়ী-স্বভাব ও সর্ব্বব্যাপারে সৌন্দর্য্যবোধ যাদের আয়ত্তের মধ্যে নেই, তারা যে শুধু অকৃতকার্য্য হয় তা' নয়, তাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বও স্ফুরিত হ'তে পারে না। অর্জ্জন-পটুত্ব মানে, কাজ হাসিল করার বুদ্ধি, যারা এই উদ্দেশ্যে একটা কাজে হাত দিয়ে মাঝ-পথেই বিভ্রান্ত হ'য়ে বিরত হয় বা লক্ষ্যবস্তু লাভ না ক'রে অন্যদিকে মন দেয়, তাদের distortion-এর (বিকৃতির) সম্ভাবনা থাকে। সাশ্রয়ী যারা নয়, তাদের pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) হবার সম্ভাবনা খুব থাকে, অযথা ব্যয়বাহুল্য ও অপচয় তাদের স্বভাবগত হ'য়ে দাঁড়ায়; উপচয়ী পরিচালনা তারা ভুলে যায়। এই লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের ফলে মানসিক ও সম্পদগত দৈন্য তাদের ঘিরে ধরে। সাশ্রয়ী হ'তে গেলে অতোখানি মাথা, বুদ্ধি, বিবেচনা ও নিয়ন্ত্রণ-কৌশল খাটাতে হয়, তাতে মানুষ বেড়ে ওঠে, কিন্তু যারা হেলাফেলায় অনেক-কিছু নষ্ট করে, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি, শক্তি-সামর্থ্যও অতোখানি ঢিলে ও খাটো হ'য়ে পড়ে। আর, সুন্দরের sense (বোধ) যাদের নেই, তাদের clumsy ও disintegrated (এলোমেলো ও অসংহত) হবার সম্ভাবনা থাকে। সুন্দরের মধ্যে আছে একটা সমতা ও সঙ্গতিবোধ, তাই তা' সত্তার কাছে আদরণীয়। যা'ই করি, যা'ই ভাবি, যা'ই বলি—তা' যদি সত্তার কাছে আদরণীয় না হয়, অর্থাৎ তার দ্বারা আমার এবং অপরের সত্তা তৃপ্ত ও নন্দিত না হয়—করায়, বলায়, চলায় যদি বিশৃঙ্খলা, অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য অভ্যাসগত হ'য়ে ওঠে, তবে তার ফলে ব্যক্তিত্বও ক্রমশঃ বিশৃঙ্খল ও বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, সবটার মধ্যে সঙ্গতি নিয়ে শক্তিমান্ অখণ্ড ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে উঠতে পারে না।

কেষ্টদার একটা প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর একটা লেখা দিলেন। পরে বললেন—সত্যেনকে যা' দিয়েছিলাম, সে ভাষা থেকে এটা একেবারে তফাৎ। তাই দেখে মনে হয়, এ-সব কি বস্তুসাপেক্ষ! (অর্থাৎ, প্রশ্নকর্ত্তার ব্যক্তিত্বের বিকিরণ যেমনতর, তার দ্বারা তাঁর উত্তরের ভাষা ও ভঙ্গীটা হয়তো প্রভাবিত হয়)।

১৬ই চৈত্র. ১৩৪৭, শনিবার (ইং ৩০।৩।১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা আন্দাজ ন'টার সময় বাঁধের ধারে তাসুতে বিছানায় ব'সে সকলের সঙ্গে সহাস্যবদনে আলাপ-আলোচনা করছেন। তখন বেশ রোদ উঠেছে, কিন্তু ঝির-ঝিরে হাওয়া দিচ্ছে ব'লে গরম তেমন লাগছে না। প্রেস, তপোবন, মাতৃবিদ্যালয়, কেমিক্যাল ওয়ার্ক্স, কারখানা, ছুতোর মিস্ত্রীর আড্ডা, হোসিয়ারী, কার্ডবোর্ড কনসার্ণ, ডিস্‌পেনসারী, ফিলান্‌থ্রপি অফিস, অতিথিশালা, ঋত্বিগাচার্য্য-

ভবন, কলাকেন্দ্র, কৃষিক্ষেত্র, কুটীর-শিল্প-কেন্দ্র ইত্যাদি সর্ব্বত্রই তখন পুরোদমে কাজকর্ম্ম চলেছে। বাইরে থেকে এক ভদ্রলোক তখন আশ্রমে বেড়াতে আসলেন। তাঁকে আশ্রমের বিভিন্ন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলি দেখান হ'লো। তিনি সেগুলি দেখেশুনে পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গেলেন। ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যেতেই তিনি স্নেহ-সম্ভাষণে তাঁকে বসতে বললেন। তিনি প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন। প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ধরুন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমার খুব ভাল লাগে, আজ তিনি নেই, এখন তাঁকে কেমন ক'রে পাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরবর্ত্তীকে বাদ দিয়ে পূর্ব্বতনকে ধরা যায় না। শ্রীরামচন্দ্রকে যদি কেউ ভক্তি করে, আর সে যদি শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক হয়, তবে তাকে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রকে পেতে হবে. নচেৎ পাওয়া হবে না। পরবর্ত্তী পূরয়মাণ মহাপুরুষের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূর্ব্বতনে অনুরাগী আচার্য্যের শরণাপন্ন হ'তে হয়।

তিনি নিজের চাকরী-সম্বন্ধে বললেন—আমি খোশামোদ করতে পারি না, তাই আমার চাকরীর উন্নতি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাঁকে দরদভাবে বুঝিয়ে বললেন—খোশামোদ করতে যাবে কেন? তবে স্তুতি করতে হয়। প্রত্যেকের বাস্তব গুণগুলি দেখতে হয়, সেগুলির তারিফ করতে হয়, তাতে নিজেরও উন্নতি হয়। আর, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য বুঝে মনোজ্ঞ ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ ক'রে তাদের হৃদয় জয় করতে হয়। তখন প্রয়োজনমত তাদের তুমি সংশোধনও করতে পার। আর, এইভাবে যদি চল, মানুষকে তুমি তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে পারবে। এতে মানুষ সহজেই তোমাতে স্বার্থান্বিত হ'য়ে তোমার শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হবে। তুমি সম্মান ও খ্যাতিলাভ করবে, সুখী হবে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্প্রীতি বেড়ে যাবে তোমার।

ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি শুনে খুবই উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলেন, তাঁব চোখ-মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো, তিনি যেন একটা পথ পেয়ে গেলেন।

এই সব কথাবার্ত্তাব পর সত্যেনদা তাঁর সদ্যলিখিত একটি কবিতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যে কতবড় প্রেমিক এবং মানুষ যে কেন তাঁর চারপাশ ঘিরে থাকে—সেই কথাই কবিতাটির মধ্যে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কবিতাটি শুনে বললেন—দ্যাখ! মানুষের নিজের তরফ থেকে কারো প্রতি করা থাকলে, তখনই তাকে সত্যি মিষ্টি লাগে। নচেৎ ভালবাসা নদী বা কোন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যকে ভালবাসার মতো হয়, তার জন্য কিছু করতে হয় না, তাই ভালবাসার প্রকৃত sensation (বোধ) গজায় না, আর জীবনের দুঃখরাতে সে-ভালবাসার চেতনা তাকে কোন উৎসাহ বা প্রেরণা যোগায় না, তখন তা' কর্পূরের

মতো উবে যায়। অথচ বৌকে ভালবাসার ব্যাপারে দেখ, তুমি দিনরাত আঁকুপাঁকু ক'রে এটা জোগাড় করছ, ওটা এনে দিচ্ছ, তার জন্য একটা constable (কনষ্ট্যাব্‌ল)-ই না হয় হ'লে, কত ভাবছ, খাটছ, তাই সেটা feel (বোধ) করা যায়, real (বাস্তব) হয়।

যশোহরের একটি দাদা স্থানীয় কয়েকজন মুসলমানের দুর্ব্ব্যবহারের কথা বলেন। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেন—ইসলামের অপ্রতিষ্ঠা যাতে হয়, তেমন কিছু করার সুযোগ মানুষকে দেওয়া তোমাদের উচিত নয়।

১৯শে চৈত্র, ১৩৪৭, বুধবার (ইং ২। ৪। ১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে সুধাংশুদাকে (মৈত্র) বললেন—Physical chemistry-টা ভাল ক'রে পড়, basic principle (মূলনীতি)-টা ঠিক-ঠিক বোঝা চাই। আর, শুধু বই প'ড়ে কেউ original research (মৌলিক গবেষণা) করতে পারে না, inquisitive urge চাই to fulfil purpose to the principle (আদর্শানুগ উদ্দেশ্য পূরণে সন্ধিৎসু সম্বেগ চাই), সেইটের উপর দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, হাতে-কলমে করতে হয়, তার ভিতর-দিয়ে সূত্র হাতে এসে যায়।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—শাস্ত্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, পূর্ব্বতন মহাপুরুষদের গ্রন্থাদি যাবতীয় যা'-কিছু ভাল ক'রে পড়বি, আর সবটা থেকে নিজেদের ভাবধারার সমর্থনী যা'-কিছু পাবি, সেগুলি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবি। নিজের একটা দাঁড়া ঠিক থাকলে, তখনই ঠিক-ঠিক পড়া ও বোঝাটা হয়, এবং সেই পড়াটা কাজে লাগান যায়। নচেৎ লাখ পড়লেও হজম হয় না।

২০শে চৈত্র, ১৩৪৭, বৃহস্পতিবার (ইং ৩। ৪। ১৯৪১)

সামনে ঋত্বিক্-অধিবেশন আসছে। ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি-সঙ্গীতাদি হবে। বিকালে আশ্রমে তারই খুব জোর মহড়া চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃ-মন্দিরের পিছনে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চে বসেছেন। আশ্রমের দাদা ও মায়েরা বিনতি-প্রার্থনার পর সেখানে এসে সমবেত হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন বদনে ললিতমধুর ভঙ্গিতে সকলের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন, যার যে প্রশ্ন তার জবাব দিচ্ছেন। কথায়-কথায় স্বস্ত্যয়নীর কথা উঠলো—মনুসংহিতায় 'ইদং স্বস্ত্যয়নং' ব'লে একটা কথা আছে, শ্রীশ্রীঠাকুর সেইটে বের করতে বললেন। বের ক'রে দেখাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সমস্ত মনুসংহিতার মধ্যে বারটি অধ্যায়ে যা' আছে, স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটা নীতির মধ্যে তা' আছে।

তারপর নিবারণদা (দত্ত) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে মনুসংহিতা ও James-এর Habit-এর chapter (অধ্যায়) থেকে স্বস্ত্যয়নীয় সংশ্লিষ্ট কথাগুলি প'ড়ে শোনাতে বললেন। প'ড়ে শোনান হ'লো। শুনে তিনি বললেন—এখন বুঝলাম, কেন নিত্য করা প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—আপনি যত বছর চাকরী করছেন, এত বছর যদি ঠিক-ঠিক ভাবে স্বস্ত্যয়নী করতেন, তাহ'লে একটা জমিদারী ক'রে ফেলতে পারতেন। স্বস্ত্যয়নী বলতে শুধু অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে রাখা নয়, স্বস্ত্যয়নীর যে পাঁচটা নীতির কথা বলেছি, ওর সবই নিষ্ঠা-সহকারে পালন করা লাগে। তাহ'লেই স্বস্ত্যয়নী পূর্ণাঙ্গ হয়। যে যেমনই হোক, এই স্বস্ত্যয়নীব্রত যদি কেউ ভালমতো পালন করে, সে বড় হবেই। যত ব্যাপকভাবে, যত বেশী লোকের মধ্যে একটা চারিয়ে দিতে পারেন, ততই জাতির মঙ্গল। অর্থনৈতিক মুক্তি, জাতির উন্নতি, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যা'ই চান, আগে লক্ষ-লক্ষ ব্যষ্টিজীবনে এই স্বস্ত্যয়নী অভ্যাসগত ক'রে তুলুন। তখন তাদের ধ'রে সারা জাতটা খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারবে।

* * * *

আগে এখানকার প্রয়োজনে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিতে হ'তো, পরে ভাবলাম, কী করলে টাকা দেওয়াটাই তাদের বাড়ার পথ হ'য়ে ওঠে, তখন স্বস্ত্যয়নীব্রত যেন appear করলো (আবির্ভূত হ'লো) সবটা নিয়ে। এ যেন পরমপিতার পরম অবদান।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটা ছড়া দিলেন।

২১শে চৈত্র, ১৩৪৭, শুক্রবার (ইং ৪। ৪। ১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-নিবাসে। হরিপদদা (সাহা), প্রফুল্ল প্রমুখ ছিলেন।

প্রফুল্ল—আমার মা বলেন, ইষ্টকাজ বড় সুখের কাজ, অবশ্য যদি নিজের টাকা থাকে, পেটের ভাবনা ভাবতে না হয়, কারও কাছে হাত পাততে না হয়, বরং নিজের থেকে ইষ্টকে ও অন্যকে দেওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' থাকলে যে ভাল হ'তো তা' মনে হয় না। এই যে daily effort (নিত্য চেষ্টা) করতে হ'চ্ছে, এই-ই ভাল, এতে মানুষ তরতরে থাকে। অতন্দ্র প্রচেষ্টার উপর না থাকলে মানুষ মরচে ধ'রে যায়। এই যে যোগাড়-যন্ত্র ক'রে চালিয়ে নিতে চেষ্টা করছ, এতে তোমার কর্ম্মশক্তি অনেকখানি বেড়ে যাচ্ছে, মানুষের সঙ্গে অনেকখানি সক্রিয় প্রীতি ও সেবার সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হ'চ্ছে—এতে তোমারই কল্যাণ।

এরপর সত্যেনদা (সাহিত্যশাস্ত্রী) আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি ওকে বলেছি—তুই টাকা ছুঁবিও না, অফিস থেকে তোর বাড়ীতে যা' পাঠাবার তা' পাঠিয়ে দেবে, আর আমি একপয়সাও দেবো না। তা' বলা সত্ত্বেও পাঁচ টাকা সেদিন নিল। ওতে যে হাত তুলে বিষ খাওয়া হয়, সেইটেই বোঝে না।

সত্যেনদা—বিভ্রাটে প'ড়ে গেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দু'দিন না খেয়ে থাকা কিংবা ছেঁড়া কাপড় পরা, বা বিছানা কুটকুট করাটা এবং এই-জাতীয় অভাব-অভিযোগ মোটেই বিভ্রাট নয়। বিভ্রাট হ'লো—আমি অমন ক'রে বলা সত্ত্বেও এই নেওয়াটা।

১৩ই বৈশাখ, ১৩৪৮, শনিবার (ইং ২৬। ৪। ১৯৪১)

আজ বিকালে ঝড়ের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে বেরিয়েছেন, সঙ্গে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), উমাদা (বাগচী), সতীশদা (দাস) প্রমুখ কয়েকজন আছেন। একটু অগ্রসর হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর দেখতে পেলেন, বড়দার বাড়ীতে একটা বেলগাছ প'ড়ে গেছে। তা' দেখে ব্যথিত হ'য়ে বললেন—এই বেলগাছের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়ান আছে। আগে দুর্গাপূজা হ'তো, তার বোধন হ'তো এর তলায়, আমার আজি-মা গাছটা পুঁতেছিলেন।

কেষ্টদার দিকে চেয়ে করুণ দৃষ্টিতে বললেন—আমার মমতার সঙ্গে আমি পেরে উঠি না। মনে হয়, আমি জড়িয়ে আছি সব-কিছুর সঙ্গে।

ব'লেই একটু থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে-মুখে একটা তীব্র আর্ত্তি ও ব্যাকুলতার ভাব ফুটে উঠলো। সে-দৃশ্য দেখে সবাই অভিভূত হ'য়ে পড়লেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮, বুধবার (ইং ৪। ৬। ১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র) প্রমুখকে বললেন—অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, বাইওলজি, জিওলজি, ইকনমিক্স, হিষ্ট্রী, পলিটিক্স, ফিলসফি, শাস্ত্রগ্রন্থ—ইত্যাদি প'ড়ে ফেল্। হাতেকলমেও নানারকম কাজ করতে শেখ্। কোন দিক দিয়ে যেন খাঁকতি না থাকে। তখন দেখবি, মানুষের কত উপকারে লাগতে পারবি।

৬ই আষাঢ়, ১৩৪৮, শুক্রবার (ইং ২০। ৬। ১৯৪১)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের ধারে চৌকীতে ব'সে আনন্দে গল্পগুজব করছেন। মায়েদের সঙ্গে রান্নাবাড়া, খাওয়াদাওয়া ও ছেলেপেলে মানুষ করা ইত্যাদি সম্বন্ধে

গল্পচ্ছলে নানাকথা বললেন। তারপর রাজেনদা (মজুমদার), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র) প্রমুখকে কর্ম্মীর লক্ষণ সম্বন্ধে বললেন—শুধু qualification (গুণ) থাকলে হবে না, adjusted (নিয়ন্ত্রিত) কিনা দেখতে হবে। সাশ্রয়ী, সুন্দর, অর্জ্জনপটু যদি না হয়, তবে সে underman (অপমানব)। আর, দেখতে হবে, মানুষ principle (আদর্শ)-এর জন্য তার যে-কোন বৃত্তিকে sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে কিনা, এবং পারলেও মানসিক কষ্ট হয় কিনা। ক'থা দেখলে চলবে না, দেখতে হবে চরিত্র—বিচরণ, activity (কর্ম্ম)। রতনে রতন চেনে, গেঁজেলকে ব'লে দিতে হয় না কে গেঁজেল—গাঁজা খাওয়া যার habit (অভ্যাস) ও character-এ (চরিত্র) set করে (বসে)-নি, সে কিন্তু পারে না। একটা লোকের তামাক সাজা দেখে ঠিক পাওয়া যায় সে কেমন লোক। অর্জ্জনপটুত্ব একটা মস্ত test (পরীক্ষা), গাঁটের থেকে যে-সে দিতে পারে, সংগ্রহ ক'রে দিলে কিম্মত বোঝা যায়—কত সময়ের মধ্যে দিল, কেমনভাবে আনল, ধাপ্পা দিল কিনা, যে দিল সে খুশি হ'য়ে দিল কিনা—এতে যোগ্যতা ধরা পড়ে। মানুষের কাছ থেকে এমনভাবে নিতে হবে, যাতে সে দিয়ে তৃপ্ত হয়—মনটা কিনে নিতে হবে। আমি যদি কারও উপর প্রতিশোধও নিতে চাই, তবে ভাবি, কেমন ক'রে তাকে জয় করব। আমার একজন খেলার সাথী আমার প্রতি অযথা বিদ্বেষপরায়ণ হ'য়ে উঠেছিল, সে সর্ব্বত্রই আমার বিরুদ্ধে নিন্দা করতো। কিন্তু সব জানা সত্ত্বেও আমি সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে তার প্রশংসা করতাম, তার সঙ্গে দেখা হ'লে সশ্রদ্ধ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতাম, সত্যিই তার প্রতি আমার কোন বিরূপভাব ছিল না, কিন্তু মনে-মনে রোখ ছিল, যেমন ক'রে হোক তাকে আপন ক'রে তুলবই। বারো বছর ধ'রে তাকে এইভাবে pursue (অনুসরণ) কবেছিলাম, পরে সে নিজেই অনুতপ্ত হ'য়ে একদিন আমার কাছে এসে কেঁদে পড়লো, বললো—'ভাই! তুমি যে কত মহৎ, আর আমি যে কত হীন তা' এতদিনে বুঝতে পেরেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' আমি তখন আর ও-সব কথা পাড়তে দিই না।

২৩শে আষাঢ়, ১৩৪৮, সোমবার (ইং ৭।৭।১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বাঁধের ধারে তাসুতে। ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে আছেন। তাঁর সান্নিধ্যে একটা গভীর স্বস্তি ও তৃপ্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার মুখে। শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটা ছড়া পড়তে বললেন। একটা ছড়া পড়ার পর বুঝিয়ে বললেন—মন খারাপ হ'লে চিন্তার কোন কাবণ নাই, মন যেদিকেই থাক, করা-বলা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে-সঙ্গে মনের অবস্থা বদলে যেতে বাধ্য, এক-নিমিষেই করা যায়, এটা আমাদের হাতের মধ্যে। তারপর আর একটা ছড়া পড়া হ'লো—

'কাম-আবেশে স্ত্রী-পুরুষে
যেমন করে উপভোগ,
ইষ্টকাজে বাস্তবতায়
তেমনি হ'লে তবেই যোগ।'

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টের কাজ করতে গিয়ে যদি কষ্ট বোধ হয়, বুঝতে হবে কোন passion (প্রবৃত্তি) unwilling (অনিচ্ছুক) আছে, uninterested (অনন্বিত) আছে—প্রকৃত যোগ হয়নি; আর সত্যই কামের নেশার মতো লাগে, কামচক্ষু গজায়। ইঞ্জিনটা, একটা বিশিষ্ট স্থানের একটা গাছ—চারিদিকের সব যেন লোলুপ দৃষ্টিতে উপভোগ করতাম। মা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সব যেন ঝম ক'রে নিভে গেল। আগে কত ভাল লাগতো, এখন সব আনন্দের মধ্যেও মা'র ব্যথা ভুলতে পারি না। জীবনে এক বৈষ্ণবী দেখেছি, আর দেখেছি এক সাধু, অমনটা আর দেখলাম না। বৈষ্ণবী 'সে' 'সে' বলতো, আমাকে অত্যন্ত আদর করতো, মাঝে-মাঝে ভাবাবেশ হ'তো, যাত্রা-থিয়েটারের কায়দা নয়, একেবারে, সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক। ভক্তি, বিরহ, ব্যাকুলতার একটা অনুপম অভিব্যক্তি দেখেছি তার মধ্যে। সে মুখে কাউকে কোন উপদেশ দিত না, কিন্তু তার চলাটাই ছিল উপদেশ। লোকসমক্ষে প্রকাশ্যে সে গল্পচ্ছলে এমন ক'রে আত্মবিশ্লেষণ করতো যে তার থেকে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করা যেতো। সে যখন কাঁদতো, একশো লোক সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদতো, সে হাসতো, সঙ্গে-সঙ্গে সবাই হাসতো, সে ছুটলে সবাই পিছু-পিছু ছুটতো, হয়তো একটা গাছের কাছে গিয়ে লুকোচুরি খেলতো, যাঁকে সে খুঁজছে যেন তাঁকে দেখতে পেয়েছে, চোখে-মুখে কেমন একটা চকিত আগ্রহ-আবেগ। কোন দিন আমার খাবার আগে খেতে বসলে জানতে পেলেই খাওয়া ফেলে উঠে যেত। সাধু আমাকে না খাইয়ে নিজে কিছু খেত না, কাউকে কিছু খেতে দিত না। মানুষ পয়সা দিলে প্রয়োজন-মাফিক দুই-এক পয়সা নিত আর সব ফেলে রেখে যেত, ছেলেপেলেরা কুড়িয়ে নিয়ে যেত। যাবার দিন এমন চাউনি চেয়ে গেল যে, আমার বুকখান। যেন ভিজিয়ে দিয়ে গেল, বলল—বাচ্চা! আবার দেখা হবে।

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৪৮, সোমবার (ইং ১০।১১।১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মার বাঁধের পাড়ে মোড়ায় ব'সে আছেন। বেলা আন্দাজ ন'টা। কাছে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রফুল্ল—শুনছি, আপনি বাইরে চ'লে যাবেন, সবাই তো চিন্তিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেতে পারি, এখন বঙ্কিম (রায়) সব ঠিক ক'রে দিলে হয়।

প্রফুল্ল—আপনার কি এ-স্থান ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চারিদিকের মানুষ যে-রকম তা' দেখে-শুনে মনে হয়, অন্যত্র চ'লে যাই, নচেৎ এমনি ইচ্ছা করে না।

প্রফুল্ল—আপনি যেখানেই যাবেন সেইখানেই তো মানুষের ভিড় জমবে, মানুষ ছেড়ে আপনি যাবেন কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু মনে হয়, সাঁওতালরা বোধহয় আর একটু normal (সহজ), তাদের মধ্যে থাকব। বাংলার যে অবস্থা তাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করা দরকার। তিনশো whole-time worker (নিয়তকর্ম্মী) ও চারটে touring batch (ভ্রাম্যমাণ দল) যদি খুব খাটে বহুদিন ধ'রে, তবে integrated (যুক্ত) হ'তে পারে, consolidation (সংহতি) তো পরের কথা।

* * * *

বৈকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে বেরুলেন। সঙ্গে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বিমলদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—আশ্রমের চেহারা এমন ক'রে ফেলা লাগে, যা'তে মানুষ charmed (মুগ্ধ) হ'য়ে যায় সব দেখেশুনে, কাত না হ'য়ে উপায় থাকে না। আর আপনারা পারবেনও, আপনাদের করা আছে কিনা অনেকখানি।

বিমলদা—আমাদের way-তেই (রকমেই) সব পারি, কিন্তু অন্যের way-তে (রকমে) যেতে হ'লেই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আপনাদের way-তেই (রকমেই) হবে তবে with every solution of all other ways (অন্যান্য সব রকমগুলি সমাধানের সাথে), সেই solution (সমাধান) দিতে গিয়েই আপনাদের সৎসঙ্গ-আন্দোলনের সৃষ্টি—তাই ওটা আপনাদের জন্মগত অধিকার। চোর হোক, বদমায়েস হোক, লুচ্চা হোক, জোচ্চোর হোক, কিছুতেই আটকায় না যদি কিনা সব দিয়ে 'আমার' interest (স্বার্থ) fulfil (পরিপূরণ) করে—একমাত্র fascination (আকর্ষণ) হ'য়ে উঠি 'আমি'। তখন আপনার-আমার মধ্যে barrier (অন্তরাল) ব'লে কিছু থাকবে না, আমি এখানে, আপনি দিল্লীতে থাকলেও যে-কথা কবেন, সে আমারই কথা, যদিও language (ভাষা) আলাদা হ'তে পারে। ব্যাপার তো এতটুকু—শাস্ত্রে-টাস্ত্রে যেখানে যা' কয়েছে, দুনিয়ায় যেখানে মানুষ বড় হয়েছে, ফেনান যত কথাই থাক, সবটুকু চুঁইয়ে তো ঐ স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি principle (নীতি)। অর্থাৎ (১) শ্রীবিগ্রহের মন্দির ভেবে শরীরটাকে সুস্থ ও সহনপটু ক'রে তুলতে হবে। (২) সচ্চিন্তাগুলিকে বিহিত-ক্রমে কাজে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে হবে। (৩) প্রবৃত্তির ঝোঁকগুলিকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। (৪) পাড়াপড়শীর বাঁচা-বাড়াকে নিজেরই স্বার্থজ্ঞানে যাজন-

সেবায় তাকে পুষ্ট ক'রে তুলতে হবে। (৫) নিজের অর্জ্জনপটুতা বাড়িয়ে নিত্য যথাশক্তি ইষ্টার্ঘ্য নিবেদন ক'রে চলতে হবে। এ-সম্বন্ধে অন্যান্য করণীয় তো আপনাদের জানাই আছে। মনুতেও আছে—'ইদং স্বস্ত্যয়নং' ব'লে। গীতায় আছে—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু—মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।' নীতি-ক'টি অভ্যাসে গেঁথে ফেলতে পারলে তখন আর পায় কে? পদ্মপাদের মতো পায়-পায় পদ্ম ফুটতে থাকবে—দেখে-দেখে ছেলেপিলে শিখবে।

কথায়-কথায় বললেন—এক-একটা মানুষকে সমর্থ ক'রে তোলার জন্য কত খাটা লাগে। একজনকে খেতে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, ধর্ম্মদান শ্রেষ্ঠ দান; তাকে এমন ক'রে তুলতে হবে যা'তে সে নিজে খেতে পায়, সঙ্গে-সঙ্গে আর দশজনকে খাওয়াতে পারে। হয়তো তাকে ২ টাকা দিলে—সে তাই দিয়ে কপি কিনে বাজারে বিক্রি করল, বিক্রির পরই সবটা নিয়ে তোমাকে দিল, বার আনা লাভ হ'লো, তুমি চার আনা তার থেকে রেখে দিলে, সে সংসারের জন্য বাকী লভ্যাংশ খরচ করলো—এইভাবে কয়েকদিনে আর ২ টাকা জমলো, ৪ টাকা দিয়ে ব্যবসা চললো—এমনিভাবে বাড়তে লাগল। কয়েক দিনের পর ১ টাকা দিয়ে একদিন হয়তো ছেড়ে দিয়ে দেখতে হয়—সে ফিরিয়ে আনে কিনা। তখন বোঝা যায়, মানুষটা কেমন। সাধারণতঃ পিছনে-পিছনে থাকা দরকার। যদি ফাঁকি দেয়—তার পেট তো আছে, ক্ষিদে তো আছে, ওরই তাড়ায় অভাবে প'ড়ে পরে একদিন হাজির হবেই, তখন সমঝে দিতে হয়, বুঝিয়ে দিতে হয়—ক'রে পাওয়াটা কত সহজ ও স্বাভাবিক, সে যা' করেছে তার চাইতে সুবিধাজনক। পাইয়ে দিয়ে পাওয়ার পথ ধরিয়ে দিতে হয়। না করলে বোঝে না, এতেও যাদের না হয়, তাদের বুঝতে হবে, জন্মগত ন্যূনতা আছে। অনেক মানুষ হয়তো বরবাদ যাবে।

রাস্তায় যাদের সঙ্গে দেখা হ'লো, শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের কাছ থেকে নানা খবর-বার্ত্তা নিলেন। কথা বলতে-বলতে কাশীপুরের রাস্তায় হাঁটতে লাগলেন।

প্রফুল্ল—অন্ততঃ পেট চালাবার জন্যই তো মানুষকে কতকগুলি নীতি মেনে চলতে হয়, কিন্তু কত মানুষ তো আজীবন ধাপ্পাবাজি ক'রে কাটায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিপার্শ্বিকই তাকে শিক্ষা দেয়, ফাঁকি দেবার পথও রুদ্ধ হ'তে থাকে, ভিতরে weakness-এর (দুর্ব্বলতার) দরুন ভয় থাকে।

আমার ইচ্ছা ছিল, তপোবনে practical (হাতে-কলমে) কাজের উপর দাঁড়িয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। হয়তো কৃষি করলো, সেই সম্পর্কিত যা'-যা' শিখলো, theory (পরিকল্পনা) বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবে, একটার সঙ্গে আর-একটার সম্পর্ক দেখাবে, তবে ঐ practice (হাতে-কলমে শিক্ষা)-এর উপর দাঁড়িয়েই এগুতে হবে। আরম্ভও হয়েছিল সেইভাবে—আর যতটুকু হয়েছিল, ততটুকু বাস্তব।

প্রফুল্ল—কিন্তু disappear করলো (নষ্ট হ'য়ে গেল) কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাতকে পুষ্ট থাকতে হ'লে মুখ দিয়ে খেতে হয়, মুখে খাবার তোলা বন্ধ ক'রে যদি হাতে শুধু তেল মাখা যায়, হাত কিন্তু তাতে ঠিক থাকে না। একটা শরীর থেকে vital current off (জীবনী-শক্তি অপসৃত) হ'লেই তাকে বলে মৃতদেহ—দেহ আছে কিন্তু জীবন নেই। Ideal (আদর্শ) হ'লেন সেই life (জীবন) যাঁর উপর দাঁড়িয়ে থাকে সব, তিনি ছাড়া অন্য-কিছু prominent (প্রধান) হ'লে কিছুই ক'রে ওঠা যায় না। তাছাড়া, আমাদের এখানে করণেওয়ালা যে-সব মানুষ, তারা মতলববাজ লোকের চাপে ousted (উচ্ছেদ) হ'তে লাগল। তাতেও কম ক্ষতি হয়নি।

প্রফুল্ল—যে ousted হ'লো, তারই তো disqualification (অযোগ্যতা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু তো তারা নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখেছে—body cell (দেহকোষ) আর bacteria (বীজাণু) হ'য়ে যায়নি।

প্রফুল্ল—India-র (ভারতের) অন্যান্য province (প্রদেশ)-এর চাইতে বাংলার degeneration (অবনতি) কি সব চেয়ে বেশী হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাংলায় আছি তাই বাংলারটা আমরা দেখছি—আর degeneration (অবনতি) মানে, এরা disintegrated (বিচ্ছিন্ন), এদের ideal or principle (আদর্শ ও নীতি) ব'লে কিছু নেই, ego (অহং)-ই সব। Integration ও consolidation (আদর্শনিষ্ঠা ও সংহতি) আনতে পারলেই হয়, আর সবই তো আছে।

অন্যান্য কথা উঠল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজে আচরণ না ক'রে ছেলেপেলেদের উপদেশ দেবার মতো দুর্ব্বুদ্ধি আর নেই। মা হয়তো ছেলের সামনে বাপকে অসম্মানসূচক কথা বলছে, বাপ মাকে মারছে—সেখানে ছেলে যে খারাপ হবেই, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই! বাপ ছেলেকে বলছে সত্য কথা বলতে, নিজে স্ত্রীর কাছে মিথ্যা কথা বলছে, ছেলে এটা adjust (বিনায়ন) করতে পারে না, মাথায় একটা fissure (ফাটল)-এর মতো হয়। তুমি কেমন মানুষ বোঝা যাবে, তোমার ছেলেপেলে দেখে। Defect ও merit (দোষ ও গুণ) সব পাবে। Sexual intercourse (যৌন-মিলন) হয়তো করতে চাও কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে হ'লে তার risk (বিপদ) কতখানি তা' কি চিন্তা কর? তোমার সন্তান হয়তো like a street dog (রাস্তার কুকুরের মতো) ঘুরবে। ও কিন্তু তুমিই, তুমি কি চাও তোমার ঐ পরিণতি? নিজে আচরণসিদ্ধ হওয়া ছাড়া মানুষকে ভাল করবার পথ নেই—শাশুড়ী যদি বউকে মানুষ করতে চায়, তারও ক'রে দেখাতে হবে। মা হওয়ার আগে কোন মেয়ে যদি স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর, ননদ, জা ইত্যাদির চোখ-মুখ দেখে প্রয়োজন অনুধাবন ক'রে তদনুপাতিক কথাবার্ত্তা, সেবা-ব্যবহার প্রয়োগ করে, তবেই আস্তে-

আস্তে তার এমন intuition develop (স্বতঃবোধ বৃদ্ধি) করবে যা'তে সে ছোট শিশুর nurture (পোষণ) যখন যেমন প্রয়োজন দিতে পারবে। আঁচ করতে-করতে intuition (সহজ জ্ঞান) grow করে (জন্মায়)। তখন একটা লোক দেখলেই হয়তো তুমি বুঝলে, সে অকাম ক'রে এসেছে। তখন তা'কে কোন্ কথা কোন্ সময় কেমনভাবে বললে কী effect (ফল) হবে এবং সে effect (ফল) কত সময় থাকবে, সব বোঝা যায়।

২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৪৮, বুধবার (ইং ১২। ১১। ১৯৪১)

স্নিগ্ধ-শান্ত, উজ্জ্বল হেমন্তের প্রভাত। একটু-একটু শীতের ভাব পড়েছে ইদানিং, বেশ রোদ উঠেছে—রোদটি বেশ মিষ্টি লাগছে। বেলা প্রায় গোটা নয়েক, শ্রীশ্রীঠাকুর তাসুতে প্রসন্নচিত্তে ব'সে আছেন। কাছে যারা আছেন, সস্নেহে তাদের সাথে আলাপ-সালাপ করছেন, খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। একজনের বাড়ীতে ম্যালেরিয়া-জ্বরের সংবাদ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে তৎক্ষণাৎ প্যারীদাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন—ভাল ক'রে দেখেশুনে দরকার হ'লে ইন্‌জেকশন দিয়ে দিও, টাকার দরকার হ'লে আমাকে ব'লো, আর চারিদিকে যেমন ম্যালেরিয়া হ'চ্ছে তা'তে বেশ কিছু ভাল কুইনাইন ও এ্যাটেব্রিন জোগাড় করা দরকার। এখন ঘুরে আস, দেখি কী করা যায়।

যারা উপস্থিত ছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের প্রত্যেককে পই-পই ক'রে ব'লে দিলেন ঠিকমতো মশারি টানাতে, মশারি ভাল করে গুঁজে দিতে যা'তে মশা ঢুকতে না পারে, মশারি ফেলার সময় সাবধানে ফেলতে, সপ্তাহে এক-আধটা কুইনাইন খেতে আর বাড়ীর আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং আর-সকলকে দিয়েও এটা করাবার ব্যবস্থা করতে।

এরপর প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করলো—কর্ম্মহীন সচ্চিন্তা নরক কেন? সচ্চিন্তাটুকুও তো লাভ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নরক মানে কী তা' জানিস তো?

প্রফুল্ল—'বৃদ্ধিতে যা' গ্লানি আনে, টেনে নেয় তা নরক পানে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ওতে সচ্চিন্তার একটা বিলাস পেয়ে বসে যা' জীবনের কোন কাজে লাগে না, আর তাই-ই নরক।

প্রফুল্ল—ঠিক যেন মাথায় ঢুকছে না, নরক কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Habit-এ set করেনি (অভ্যাসে আয়ত্ত হয়নি) তাই অসুবিধা হ'চ্ছে বুঝতে। ব্যাপারটা হয় কি, যে-সরষেকে দিয়ে ভূত ছাড়াব সেই সরষেকে যেন ভূতে

পায়। যে-সচ্চিন্তা মানুষকে কল্যাণকর্ম্মে নিযুক্ত করে, তাই তার কাছে একটা pose (ভাঁওতা) হ'য়ে দাঁড়ায়। বাইরে সাধুতার ভান ধ'রে মিষ্টি-মিষ্টি ভাল কথা কয়—ভিতরে থাকে active (সক্রিয়) দুষ্টবুদ্ধি, সেই purpose-এ (মতলবে) ওটা utilise (ব্যবহার) করে, একটা cheat (জোচ্চোর) হ'য়ে ওঠে। এমন মানুষ দেখিস্‌নি?

প্রফুল্ল—তাহ'লে এটা তো একটা বিকৃতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, রীতিমতো বিকৃতি।

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৪৮, বৃহস্পতিবার (ইং ১৩।১১।১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে তাসুতে বিছানায় ব'সে, ঈষদা-দা (বিশ্বাস), বিমলদা (মুখোপাধ্যায়), ইন্দুদার (বসু) দিকে চেয়ে বলছেন—ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার দিকে interest (অনুরাগ) আসলে দুইজন দেখা হ'লেই কথা উঠবে—কেমন ক'রে consolidation (সংহতি) আনা যায়, কোথায় কী করা যায় ইত্যাদি। কোন বৃত্তিই তখন prominent (প্রধান) হ'য়ে উঠতে পারে না। আপনি যদি বোঝেন, কোন জায়গায় sexually inclined (যৌন আনতি) হ'লে আপনার ছেলেটা শুকিয়ে যাবে তখন আপনি যেমন কিছুতেই সেখানে সায় দিতে পারেন না, এও তেমনি হয়। এমন নয় যে প্রবৃত্তিটা নেই, ওটা পুরোমাত্রায় থাকে, কিন্তু আপনি তার অধীন ন'ন—বরং আপনার principle ও purpose (আদর্শ ও উদ্দেশ্য) fulfil (পরিপূরণ) করার জন্য নানাভাবে কাজে লাগান তাকে।

প্রফুল্লকে কয়েকটা ছড়া পড়তে বললেন। পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই প্রসঙ্গে কথা চলতে লাগল—অনেকে হয়তো বলে, আমি ধর্ম্ম, কৃষ্টি ওসব কিছু বুঝি না, আমি বুঝি people in general-এর interest (জন-স্বার্থ), এই সব লোক এমনিভাবে suffer (কষ্টভোগ) করছে ইত্যাদি ব'লে উদারতার ভান দেখিয়ে লোক-বাগানর চেষ্টা করে। এরা ভারি dangerous (সাংঘাতিক)—নানা কায়দায় ইষ্টস্বার্থ হনন করে। আবার, একদল হয়তো কেষ্ট-ঠাকুরের কথা উঠতে বলবে, তিনি 'অযোনিসম্ভব', তিনি সব পারেন, আমরা দীন-হীন জীব, আমাদের কিছু করবার শক্তি কোথায়? ভগবান আমাদের দিয়ে করিয়ে নেন না—তাই হয় না। অথচ ভক্ত ব'লে পরিচয় দেয়। এমনি ক'রে মানুষের কোমর ভেঙ্গে দেয়, মানুষের normal evolution (স্বাভাবিক উৎকর্ষ)-এর পথ এইভাবে যারা ঘায়েল করে, তাদের চেয়ে গুণ্ডা-বদমায়েস ঢের ভাল। এরা সমাজের যে সর্ব্বনাশ করে তার তুলনা নেই। চৈতন্য-চরিতামৃতে তাই আছে—'আমাকে ঈশ্বর ভাবে আপনাকে হীন, তার প্রেমে কভু আমি না হই অধীন'।

বিমলদা—তবে দাস্য-ভাবটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাস্য কথাটা এসেছে দাস্‌-ধাতু থেকে, আর দাস্‌-ধাতু মানে দান। একজনকে তোমার সব-কিছু দিলে অথচ তার রং তোমার মধ্যে কি একটুও ফুটবে না? তোমার ছাত্র তোমাকে খুব ভালবাসে, গাড়ু-গামছা এগিয়ে দেয় অথচ পড়াশুনা করে না, একি হয়? তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে—তার মূল অর্থাৎ টান অন্যস্থানে, তা' না ক'রে ওখানেই যদি মার সুরু ক'রে দাও—কোন কাজ হবে না। ছেলেপেলে যে বিড়ি-তামাক খাওয়া শেখে, তা'ও বিশেষ এক অবস্থায় প'ড়ে। Sex-topics-এর (যৌন-আলোচনার) আড্ডায় প'ড়ে ঐ ঘোরে প্রায়শঃই এ-সব হয়। Cinema (সিনেমা) দেখার নেশাও অনেক সময় ঐ থেকে আসে।

ইন্দুদা—অতো ছোট বয়সে কী বোঝে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বোঝে না মানে! ওর উপর দাঁড়িয়েই যে জন্ম। দুই বছরের শিশু হয়তো শুয়ে আছে, মা-বাবা চুমু খাচ্ছে, ছেলে মিটমিট ক'রে চেয়ে দেখছে, ওর কাম হ'য়ে গেল ওখানে। তাই ছেলেপেলে বড় হ'তে-না-হ'তেই নিজেদের আলাদা থাকা লাগে। ওদের libido (সুরত)-কে right channel-এ direct (ঠিক পথে পরিচালিত) করা লাগে। টর্চলাইটে যদি পাঁচ রকম কাঁচ থাকে, তবে ভেতরের একই light (আলো) যে-কাঁচের ভিতর-দিয়ে pass (চালিত) করাবে সেই রং দেখাবে। Libido (সুরত)-ও ওই রকম। যে রং-এ রাঙ্গান যায়, সেই রঙ্গ-এ রঙ্গীন হ'য়ে ওঠে। দরদভরা বুকের টান হ'লো আদত জিনিস—যার উপর তা' থাকবে, মানুষ তেমনি হবে। দামাল ছেলে শিবাজী রামদাসকে পেয়ে হ'য়ে ওঠে emperor (সম্রাট)।

বিমলদা—Libido (সুরত)-টা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে cohesive force-এর (সংযোজনী শক্তির) দরুন sperm ও ovum (শুক্র ও ডিম্ব) fertilised (মিলিত) হ'য়ে zygote form (জীবনকোষ গঠন) ক'রে cell-division (কোষ-বিভাজন) হ'তে-হ'তে মানুষ হ'য়ে ওঠে—তার underlying magnetic current (অন্তর্নিহিত চৌম্বক তরঙ্গ)-ই হ'লো libido—একে বলা যায় tendency towards unification (মিলনের ঝোঁক), এটা অভ্যাস, ব্যবহার, ঝোঁকের ভিতর-দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, আর এই libido চায় integration (যোগ)।

হিটলার, মুসোলিনী, অশোক ইত্যাদিব কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অশোকের মতো কেউ নয়। বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তি তাকে অতো বড় ক'রে তুলেছে।

একজন প্রশ্ন করলেন—বুদ্ধদেবকে জীবিত অবস্থায় তিনি তো পাননি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপগুপ্তের ভিতর-দিয়েই তিনি বুদ্ধদেবকে বোধ করেছেন। যেমন, রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সময় কেষ্ট ঠাকুরকে বুঝতে গেলে রামকৃষ্ণ-ঠাকুরের ভিতর-দিয়ে ছাড়া বোঝার উপায় নাই।

ইন্দুদা—অনেকে তো শুধু বিবেকানন্দকে মানে, রামকৃষ্ণদেবকে মানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে বিবেকানন্দকেও মানে না, সে মানে নিজের প্রবৃত্তিকে; নিজের কোন প্রবৃত্তির support-এ (সমর্থনে) বিবেকানন্দকে utilise (ব্যবহার) করে।

*　　*　　*　　*

প্রফুল্ল—সাধুসঙ্গে নাকি সব হয়? সাধুসঙ্গ বলতে কী বোঝায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম কথা, সাধু মানে practical man (ব্যবহারিক-বোধসিদ্ধ মানুষ), আর সঙ্গ আসছে সন্‌জ্‌-ধাতু থেকে, সন্‌জ্‌-ধাতুর মানে আসক্ত হওয়া। সাধুতে আসক্ত হ'তে গেলে যা'-যা' করতে হয় তা'-তা' করাই সাধুসঙ্গ করা। তুমি আমার কাছে ব'সে কথা শুনতে ভালবাস, অথচ পঞ্চাশটা টাকা চাইলে বা পাঁচ হাজার মানুষ আনতে বললে সে-কাজ ভাল লাগে না—তা' কিন্তু সাধুসঙ্গ নয়, বরং তখন ঐ কাজ করাই সঙ্গ করা।

এক দাদা আর-একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বলছিলেন—Reference (পূর্ব্বাপর) না জেনে মাঝখান থেকে একটা কথা টেনে নিয়ে অমুক খুব fanaticism (নিষ্ঠার গোঁড়ামি) দেখান, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবার মধ্যে ঘুলি (গাঁট) আছে—বিশেষ-বিশেষ সংঘাতে এক-একভাবে জেগে ওঠে, আত্মপ্রকাশ করে—ভেতরের ঘুলি আবার এইভাবে কাটে। দ্বন্দ্ব বাধে, বিচার আসে, কেউ হয়তো ছিটকে যেতে চায়, কিন্তু টান থাকলে ফিরে আসতেই হয়, আস্তে-আস্তে adjust (সামঞ্জস্য) ক'রে নেয়।

ধূর্জ্জটিদা—শোনা নেই, বোঝা নেই, কথায়-কথায় কেবল আছে—ঠাকুরের নিন্দা করেছে—মাথা নেব, জুতিয়ে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো আলাদা কথা, ঠাকুরের একটা চুল নড়লে সত্যি-সত্যিই যদি অতোখানি হ'তো তবে তো একটা বিরাট শক্তির অভ্যুদয় হ'য়ে যেত, তার তো একটা অন্য দিক আছে।

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪৮, শুক্রবার (ইং ১৪। ১১। ১৯৪১)

আজকাল তপোবনের শিক্ষকগণ অনেক সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসেন, বিকালে সবাই এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃ-মন্দিরের পিছনে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বকুলগাছের তলে বেঞ্চের উপর ব'সে সহাস্য বদনে বলছেন—আমরা যেভাবে আরম্ভ করেছিলাম, continuity (ক্রমাগতি) থাকলে এতদিনে University (বিশ্ববিদ্যালয়) গ'ড়ে উঠতো।

বিমলদা (মুখোপাধ্যায়)—আমরা দো-টানার মধ্যে পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দো-টানা কেন হবে? আপনাবা তো University-কে fulfil (পরিপূবণ) করছেন। আর, practical education (কার্য্যকরী শিক্ষা) দিতে গিয়ে বহ্বারম্ভে যেন লঘুক্রিয়া না হয়। Smithy (কামাবেব কাজ) শেখাতে গিয়ে ২০০ টাকার anvil (নেহাই) না-হ'লে হবে না, এমন যেন না হয়। ওতে তথাকথিত বিলেতে training (শিক্ষা) নেওয়া লোকের মতো অকর্ম্মা হয়। সব সময় অনুযোগ—এটা নেই, ওটা নেই, কাজ করি কী ক'রে ইত্যাদি। বিশেষ কিছু নেই, তার মধ্য-দিয়েই হয়তো খেটেপিটে মাথা খাটিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। Teacher (শিক্ষক)-এর মধ্যে fanatically attached to the Ideal (অচ্যুত আদর্শনিষ্ঠ) নয় এমন একজনও যদি থাকে—তাহ'লে কাজ পণ্ড হবে।

নরেশদা ব'লে একজন এসেছেন। তিনি ভাল গাইতে পারেন। সন্ধ্যায় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে কয়েকখানা গান গেয়ে শোনালেন।

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, রবিবার (ইং ১৬।১১।১৯৪১)

সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত পদ্মার চর, তারই পাশে বাঁধের ধারে তাসুতে শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে শোন। ঘুম থেকে উঠতে-না-উঠতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আজকাল ভোরে সাধারণতঃ ইন্দুদা (বসু), বিমলদা (মুখোপাধ্যায়), ঈষদা-দা (বিশ্বাস), পঞ্চাননদা (মিত্র), সুবোধদা (সাহা), ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী), ক্ষিতীশদা (সান্যাল), রাজেনদা (মজুমদাব), যতীনদা (দাস), প্রফুল্ল এবং আরো অনেক দাদা এবং মায়েদের মধ্যে সরোজিনীমা, কালিদাসীমা, মানদামা (প্রফুল্লর মা) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত হন। প্যারীদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে মাঝে-মাঝে তামাক সেজে দেন, ৪-৩০ মিঃ কিংবা ৫টা থেকে ৭টার পর পর্য্যন্ত আলোচনা চলে। আজ ভোরে তপোবনের শিক্ষকবৃন্দ জড় হয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যা'-কিছু করে তার centre-এ (কেন্দ্রে) থাকে কিন্তু একজন। একটা বাড়ী করেছে, বাইরের লোকের কাছে হয়তো বলছে—এইটে ঠাকুরঘর, এইটে অমুক, কিন্তু plan (পরিকল্পনা)-টা হয়তো এমনভাবে করেছে যা'তে সব ঘর থেকে নিজের প্রিয় পত্নীকে দেখতে পাওয়া যায়। টেড়ীটা কাটে, কাপড়টা পরে—সবই তাকে দেখাবার জন্য, ভাল কাজ করে যা'তে দশজনে গিয়ে তার কাছে সুখ্যাতি করে, যা'তে সে ভাবে, আমার পুরুষটা কম মানুষ নয়, সাবাস্ ব'লে বাহাদুরি দেয়। মানুষেব

existence-ই (সত্তাই) থাকে না, যদি ভালবাসার পাত্র কেউ না থাকে; তবে 'স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাত্র-বিশেষে ফল'।

* * * *

Concentration (একাগ্রতা)-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Concentration (একাগ্রতা) কিন্তু fixation (ত্রাটক) নয়। Con মানে with (সহ) আর centration মানে centre (কেন্দ্র), concentration মানে with the centre (কেন্দ্রসহ)। "ইষ্ট আর ইষ্টস্বার্থে মনের আনাগোনা, এমনি ক'রেই ধ্যানে আসে চিত্ত-সংযোজনা।" Third (তৃতীয়) তিল-এ বা আজ্ঞাচক্রে মনঃসংযোগ করার কথা বলা হয়, মানুষ গভীর চিন্তা করতে গেলেই কিন্তু অজ্ঞাতসারে ওখানে হাত দেয়—process (নিয়ম)-অনুযায়ী ওগুলি করতে লাগলে base of the brain excited (মস্তিষ্কের তলদেশ উদ্দীপ্ত) হয়, pineal gland-এ (আজ্ঞাচক্রে) সেই cxcitement (উদ্দীপনা) চারিয়ে যায়। Suppressed (নিরুদ্ধ) অনেক কিছু বেরিয়ে পড়ে, বোধ করা যায়, কাজের ভিতর-দিয়ে আবার সেগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়।

প্রফুল্ল—নাম-ধ্যান না ক'রে যদি motor activity (কাজকর্ম্ম) বেশী ক'রে চালাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'তে subconscious or unconscious mind-এ (অবচেতন বা অচেতন মনে) unsolved (সমাধানহারা) যা' থাকে তা' জানা যায় না, adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা যায় না। জ্ঞা-ধাতু মানে জ্ঞান, বোধ—ওখানে ধ্যান করলে জ্ঞান ও বোধ হয় ব'লেই ওকে আজ্ঞাচক্র বলে। আর, pressure (চাপ)-টাই আদত জিনিস, ইষ্টভৃতি সেই pressure (চাপ)। হাতের exercise (কসরত) যতই কর, muscle-এর (পেশীর) দিকে attention (নজর) না দিলে কিন্তু কাজ হয় না। কথামৃতের গল্পের মতো—নষ্টা মেয়ে যাকে ভালবাসে, সব কাজের মধ্যে তার কথা মনে পড়ে—ভাবে, কখন তার কাছে যাবে, তাকে দেখলে আনন্দ হয়, তাড়াতাড়ি ভাল ক'রে কাজ সেরে সেখানেই ছুটে যায়। অনুরাগোদ্দীপ্ত নাম-ধ্যান চাই, তাঁর প্রতিষ্ঠা ও ভরণের আকুল ধান্ধা চাই—ভালবাসলে যেমনটি করে; তাই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি স্বতঃই আসে।

রামকৃষ্ণদেবের কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বিগলিতকণ্ঠে মুগ্ধ-মদির আগ্রহে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে হাতখানি নেড়ে আবেগভরে বললেন—মুখ্যু বামুন যা' ব'লে গেছেন, অমন আর কারও বলবার যো নেই, অমন পরিবেষণ কেউ করতে পারবে না।

সামান্য ক'টি কথা, কিন্তু মুহূর্ত্তেই আমাদের সকলের মন যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণময় হ'য়ে উঠলো।

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, সোমবার (ইং ১৭।১১।১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে তাসুতে ব'সে শিক্ষকবৃন্দকে বলছেন—টান থাকলেই দেবার বুদ্ধি হয়, attachment-এর (টানের) ধরণই এই—ইষ্টভৃতি তখন আর ব'লে বোঝাতে হয় না—যে বুদ্ধি, যে interest (স্বার্থ) বাধা দেয়, ইষ্টভৃতি করতে থাকলে তার গোড়ায় ঘা পড়ে, আস্তে-আস্তে ঐ করার পথে তা' adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। একটা বড় magnet-এর (চুম্বকের) সামনেই যদি আর একটা ছোট magnet (চুম্বক) থাকে—এবং দূরে একটা needle (সূঁচ) থাকে, needle-টা (সূচটা) সহজে বড় magnet-এ (চুম্বকে) গিয়ে লাগতে পারে না। ছোটখাট বৃত্তিও ইষ্টের পথে ঐ রকম বাধা জন্মায়। আর, টান হ'লে দোষদর্শন থাকে না। অনন্যচেতা হয়, সবটার purpose (উদ্দেশ্য) বোঝে, meaning (অর্থ) খুঁজে পায়, strong common sense grow করে (প্রবল বোধশক্তিসম্পন্ন হয়)।

ধূর্জ্জটিদা—আপনার প্রতি সেই attitude (মনোভাব) রাখা চলে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ-সম্বন্ধে সে-কথা তো খাটে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ অমন একটা জায়গায় ঠিক থাকলে তখন তাকে কেউ শালা বললেও চটে না, considerate (বিবেচক) হয়, বুঝতে চেষ্টা করে কেন এমন সে বলে। ডাক্তারের সাথে রোগী যদি দুর্ব্ব্যবহার করে, ডাক্তার কি তা'তে রোগী ছাড়ে? ডাক্তার বোঝে, রোগে এ-সব করাচ্ছে। ভাল ব্যবসা যারা করে তারা যে-কোন খরিদ্দারের সঙ্গে কেমন সুন্দর ব্যবহার করে। ওটা তারা স্বভাব ক'রে নেয়। যারা যত selfcentred (আত্মকেন্দ্রিক), তাদের foresight (পরিণামদর্শিতা) তত কম, ignorance (অজ্ঞতা) তত বেশী।

আর-একটা জিনিস, ভাল কথা যখন যা' শুনবি তখন-তখন সেই অনুযায়ী কাজ কবা লাগে, পাঁচজনের মধ্যে চারিয়ে দেওয়া লাগে, নচেৎ জেমস্ যা' বলেছে chance lost (সুযোগ হারান)। এ না-করলে চরিত্রে বা মাথায় তা' থাকে না।

* * * *

প্রফুল্ল—Fanatic (নিষ্ঠাবান) ও uncompromising way-তে (আপোষহীন পথে) চলতেই হবে, কিন্তু তা'তে অনেক মানুষের সঙ্গে বিরোধ না বাধিয়ে উপায় নেই, তাদের অত্যন্ত রূঢ়ভাবে প্রতিরোধ করা দরকার হয়, ওতে কিন্তু মনটায় কেমন লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fanatic ও uncompromising-এর (নিষ্ঠাবান ও আপোষহীনতার) সঙ্গে sweet (মধুর) কথাটা যোগ ক'রে নাও। 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ'—অবশ্য সময়-সময় অন্যরকম প্রয়োজন হয়। কেষ্টঠাকুর যে এত কুরুক্ষেত্রের কাণ্ড করলেন, শিশুপাল বধ করলেন—সবাই কিন্তু তাঁর favour-এ (অনুকূলে)। প্রীতিপূর্ণ নিরোধে আপাততঃ যত বিরোধই বাধুক, ওতে পরিণামে পরস্পরের মধ্যে টান বেড়ে যায়।

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, মঙ্গলবার (ইং ১৮।১১।১৯৪১)

তপোবনের শিক্ষকেরা ভোরেই সবাই উপস্থিত হয়েছেন, আরো অনেকে আছেন। ইদানীং বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাসুতে বিছানায় ব'সে চাদর গায়ে দিয়ে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। আমরা এক-একটা আসন পেতে তাসুর মধ্যে চৌকির চারিদিক ঘিবে ব'সে সেই অপূর্ব্ব কথামৃত পানে তৃপ্তিতে ভরপুর হ'য়ে উঠলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃত্তির ভিতর-দিয়ে চ'লে-চ'লে মানুষ প্রতিরকমে ঠকে, জগতের কাছ থেকে ঘা খায়—অথচ ইষ্টের পথে চললে সব-কিছুরই সামঞ্জস্য হয়, এই সোজা কথাটুকু মানুষ বোঝে না। বৌকে মানুষ কত রকমে খুশি করতে চেষ্টা করে, তবু সে খুশি হয় না। আবার, যে-স্বামী ইষ্টকে নিয়ে আপ্রাণ, তার বৌ হয়তো গর্ব্বভরে বলছে—শিবের মতো স্বামী পেয়েছি।

প্রফুল্ল—বৃত্তির পথে চললে মানুষ ঘা খায় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ সেই ভাবে coloured (রঞ্জিত) হ'য়ে থাকে, সেই angle (কোণ)-এ জগৎটাকে দেখে, জগৎটা তার কাছে সংকীর্ণই হ'য়ে উঠতে থাকে, কোনটাই কোনটাকে fulfil (পরিপূরণ) করে না। বৃত্তিকেই সত্তা ব'লে নিয়ে at the cost of সত্তা (সত্তার মূল্যে) বৃত্তির পুষ্টি চায়, তাই যা' হবার তাই হয়। যত বৃত্তিই বল, মূলে থাকে sex (যৌন-আকৃতি), মেয়েমানুষ—তার থেকে নানা ফ্যাকড়া বেরোয়। Sickly sexuality (দুর্ব্বল যৌনক্ষুধা) থেকে ego-কে (অহংকে) establish (প্রতিষ্ঠা) করার বুদ্ধি হয়, সকলকে down (খাটো) ক'রে সব affair-এ (ব্যাপারে) credit (বাহবা) নিয়ে নিজেকে সবার চাইতে superior prove (শ্রেষ্ঠ প্রমাণ) করতে চায়, হয়তো কারও failure-এ (অকৃতকার্য্যতায়) বলবে—'আমি ওকে খুব স্নেহ করতাম, আগেই বলেছি, এই-এই কর, তা' তো শুনলে না'। অযথা sympathy (সহানুভূতি) দেখিয়ে নানা রকমে subtle suggestion (সূক্ষ্ম ইঙ্গিত) দিয়ে মানুষকে ধীরে-ধীরে ইষ্ট থেকে নিজের দিকে টানতে থাকে, লক্ষ্য থাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মেয়েমানুষ। বৃত্তির নেশায় মানুষ নিজেই অনেক সময় ঠিক পায় না, কি-জন্য সে কী করছে। জহুরী যে, সে কিন্তু এক কথাতেই টের পায়, হয়তো বলে, "এতলোক

রয়েছে, আমার প্রতি আপনার এত দয়া?" সে তখন ভাবে, কোন জারিজুরী খাটবে না এখানে, স'রে পড়ে। অনেক সময় মেয়েদের sympathy (সহানুভূতি) দেখায়, যে দুঃখবোধ তাদের নেই, তা'ই জাগিয়ে দেয়। অনেকে এখানে আছে, যারা weakness-এর (দুর্ব্বলতার) দরুন দোষ করে, আবার আমার কাছে এসে স্বীকার করে, তাদের পথ অনেকটা খোলা। আবার আছে, আমি ডাকলেও হয়তো কানে শোনে না, পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতে চায়, আবার বাজে অজুহাত দেয়। কিন্তু কথায় মানুষ বোঝা যায়—language (ভাষা) হ'লো মানুষের মনের ছবি, slip of tongue (হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল) ব'লে কিছু নেই। (কথাপ্রসঙ্গে বললেন)—একপেশে মানুষ অর্থাৎ genius (প্রতিভাবান)-কে দেখতে আছে, কিন্তু অনুসরণ করতে নেই।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—তার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এত worth (ক্ষমতা) থাকা সত্ত্বেও কেন যে normal (স্বাভাবিক) নয়, তাই দেখতে হয়, normal (স্বাভাবিক) না হ'লে অনুসরণ করা চলে না।

মহাপুরুষ-সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে পরে বললেন—পরবর্ত্তী পূর্ব্ববর্ত্তীকেই তুলে ধরেন, পরবর্ত্তী দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী এমনভাবে explained (ব্যাখ্যাত) হন যে, তাঁর ভক্তেরাও—মানে যারা ভাবে যে তাঁকে ভালবাসে, তারাও তাঁকে অতখানি ভাবতে জানে না। তাঁদের কথা এমন ক'রে কন যে তাঁদের প্রতি মানুষের ভাব, ভক্তি, ভালবাসা উথলে ওঠে, পূর্ব্ববর্ত্তীর নিজস্ব সময়েও অনেকের অতটা হয় না।

প্রফুল্ল—শৈশবকাল থেকে আপনাকে না পাওয়ায় অসুবিধা হয়েছে আমাদের, অনেক ছাপ মাথায় পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু না, রামকেষ্ট ঠাকুর বলতেন, "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা' খুশি তাই কর।" ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা হ'লো ঐ অদ্বৈত জ্ঞান। গোড়া থেকেই 'সোঽহং' বললেই মুশকিল।

প্রফুল্ল—ইষ্টভৃতির pressure-এ (চাপে) কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব সময় সব কাজের মধ্যে ঐ ধান্ধা যদি থাকে, ইষ্টভৃতির যোগাড় করতেই হবে, তখন জীবনের সবখানির মধ্যে ইষ্ট ওতপ্রোতভাবে গেঁথে যান।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, বুধবার (ইং ১৯।১১।১৯৪১)

আজ খুব বৃষ্টি হ'চ্ছে। মাঠ-ঘাট জলে ভেসে যাচ্ছে—আশ্রমের সামনে বিরাট চরের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল, সব যেন ধোয়া হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাসুতে ব'সে। বিশেষ লোকজন নেই। মায়েদের মধ্যে ২/৩ জন ছিলেন।

সুধাদি—আপনি চাইলে কেমন যোগাড় হ'য়ে যায়, অন্য কারও বেলায় তা' হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেমন করি তেমন করলেই হয়।

সুধাদি—সে কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর— "আমারে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন
তার প্রেমে কভু আমি না হই অধীন।"

এক-একটা মানুষের জন্য তোমার এতখানি করা থাকা চাই যে, আজীবন তুমি যদি তার উপর ব'সেও খাও, তবু সে যেন বেশী করেছে ব'লে বোধ করতে না পারে। প্যারী যে আমার জন্য এত যোগাড় করে, ওকে কিন্তু মানুষ খুশি হ'য়ে দেয়, ওর কথা যে মিষ্টি তা' তো নয়, তবে করাটা আছে মিষ্টি।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২০। ১১। ১৯৪১)

আজ সকালে তাসুর মধ্যে পরিবেশটি বড়ই আনন্দদায়ক মনে হচ্ছিল। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে ভক্তগণের সমাবেশে পদ্মাপারে যেন এক জীবন্ত অমৃতপরিমণ্ডল রচিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—তুকের 'পর দিয়ে language-এর (ভাষার) সঙ্গে grammar (ব্যাকরণ) শেখাবার জন্য নূতন ধরণের বই লিখতে হয়—যা'তে ছেলেরা সহজেই সব শিখতে পারে।

একটু বাদেই পঞ্চাননদা (সরকার) এসে তাঁর ডায়েরী প'ড়ে শোনাতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে নানাকথা বলতে লাগলেন—একটা মেয়ে হয়তো একটা পুরুষকে পান দিতে গেল, পানটা নেবার সময় সে তার আঙ্গুলটা টিপে ধরলো, মেয়েটা equal temper-এর (সমান ধাতের) হ'লে পট ক'রে বুঝে ফেলে, তাকে অনুসরণ করে। Initiation (দীক্ষা) দিতে গেলে তেমনি যে যে-temper-এর (ভাবের)-ই হোক, তাকে ইষ্টপ্রাণতা-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে equitemper (সমভাবাপন্ন) ক'রে তুলে initiation (দীক্ষা) দিতে হয়। সব জায়গায় খুব rational way-তে (বিচারসম্মত পন্থায়) proceed করলে (অগ্রসর হলে) কাজ হয় না, mystic pose (ভাবুকের ভঙ্গী) নেওয়া দরকার হয়, ওর ভিতর-দিয়ে মূল জিনিসটা ধরিয়ে দিতে হয়। নূতন জায়গায় গেলে key (প্রধান)-দের individually (ব্যক্তিগতভাবে) approach (নিকটে গমন) করতে হয়। তর্কে corner (কোণঠাসা) করা, আর sympathetically personal knots and problems discover ক'রে solution দেওয়া (সহানুভূতির সহিত ব্যক্তিগত সমস্যা বা গ্রন্থিগুলি আবিষ্কার ক'রে সমাধান দেওয়া) আলাদা জিনিস। তর্কে convinced (ছিন্নসংশয়) হয় না, এতে হয়।

কোন জায়গায় গিয়ে লোকের কাছ থেকে কিছু নিলে তারা interested (অন্তরাসী) হ'য়ে থাকে, অন্যে নিন্দা করতে থাকলে, তারাই তখন oppose করে (বাধা দেয়)। শুধু নিলে হয় না, কিছু দিতে হয়। তুমি হয়তো শুনে আসলে, একজনের কৃষ্ণ-আদা দরকার, সেখান থেকে কলকাতা গেলে, কলকাতা থেকে কৃষ্ণ-আদা পাঠিয়ে দিলে, লিখে দিলে—ভাই, তোমার অসুখের জন্য কৃষ্ণ-আদা দরকার, তাই পাঠালাম। এতটুকু loving inquisitive service (প্রীতি-সন্ধিৎসু-সেবা) লাখ ডজন তত্ত্বকথার চাইতে ঢের কার্য্যকরী। আবার, পরের বার যাবার বেলায় ছেলেপেলেদের জন্য হয়তো কিছু হাতে ক'রে নিয়ে গেলে। কারও হয়তো দেখছ ছেঁড়া কাপড়, কারও বাড়ী চাল নেই, খোঁজ-খবর নিয়ে একজনকে দিয়ে আর-একজনের অভাব পরিপূরণ করছ, এমনি ক'রে পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি interested ক'রে তুলছ। একেই বলে consolidation (সংহতি), আর যতই তুমি এমনি করতে থাকবে, প্রতিপ্রত্যেকে তোমাতে ততটা—integrated (সংগ্রথিত) হ'তে থাকবে। যাদের কাছ থেকে নিচ্ছ, with loving urge (প্রীতি-উদ্দীপনার সাথে) তাদের যদি কিছু না দাও, তোমার পাওয়ার পথ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে যাবে, তারা তোমায় দেখে সঙ্কুচিত হবে।

ইন্দুদা—অনেক সময় আপনি আমাদের কাছে চাইলে, আপনার নাম ক'রে মানুষের কাছে ভিক্ষা করি, সেটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'তে তুমি আমার activity-র (কর্ম্মের) উপর দাঁড়ালে, তোমার activity-র উপর দাঁড়ালে না। ঠাকুর-ভাঙ্গানো হ'লো, ঐ ফুটো র'য়ে গেল—তোমার worth (ক্ষমতা) বাড়ালো না। মানুষকে যত বেশী fulfil (পরিপূরণ) করতে পারবে, ততই তোমার personality established (ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা) হবে, মানুষ তোমার asset (সম্পদ্) হ'য়ে থাকবে, প্রত্যেকটা মানুষ যেন তোমার এক-একটা ব্যাঙ্ক, তুমি গিয়ে দাঁড়াবামাত্র ভিক্ষার meter (মাত্রা) চ'ড়ে যাবে। কারও প্রতি মানুষের করা ব্যর্থ যায় না, সে ungrateful (অকৃতজ্ঞ) হ'লে disinterested third person (নিঃসম্পর্কীয় তৃতীয় পক্ষ), যে সব জানে সে হয়তো বেশী sympathetic (সহানুভূতিসম্পন্ন) হবে।

আত্মকেন্দ্রিক হওয়া যে মানুষের নিজের পক্ষেই ক্ষতিকর সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—মানুষ self-centric (আত্মকেন্দ্রিক) হ'লে সাড়াবাহী ও সাড়াগ্রাহী হয় না, rubber-এর (রবারের) opposite (বিপরীত প্রান্তগুলি) কুঁচকে থাকলে যেমন হয়। Superior-এর (শ্রেষ্ঠের) জন্য মাথায় নিরবচ্ছিন্ন টান ও উদগ্রতা থাকলেই মানুষের sensitiveness (সাড়াপ্রবণতা), observation (পর্য্যবেক্ষণ), intelligence (বুদ্ধিমত্তা), common sense (সাধারণ বোধ) grow করে (জন্মায়)।

টানের লক্ষণ সম্বন্ধে বলছিলেন—চাইলে দেওয়াটাই বড় কথা নয়, এরা যে আমার পরিকল্পনা অনুধাবন ক'রে ১৩০ টাকার signatory (স্বাক্ষর) যোগাড় করতে লেগেছে, আমি কিছু না বলতেই স্বতঃদায়িত্বে নিজেরাই আরম্ভ করেছে, এইটেই normal (স্বাভাবিক)।

যাজন-সম্বন্ধে বললেন—গোড়াতেই ঠাকুরের কথা বললে মানুষ ঘাবড়ে যায়, কিন্তু with every sympathy (পূর্ণ সহানুভূতির সাথে), ভাবে ব্যাঘাত না ক'রে ধীরে-ধীরে তার knot (গ্রন্থি) সব resolve (মীমাংসা) ক'রে দিয়ে যদি বলা যায়, this is what Thakur says (এই কথাই তো ঠাকুর বলেন), তা'তে অমোঘভাবে ক্রিয়া করে।

*　　*　　*　　*

ঈষদা-দা—'Resist no evil' (অন্যায়কে প্রতিরোধ ক'রো না) মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'Resist no evil' -এর মানে আমি বুঝি, বিচলিত ও বিক্ষিপ্ত না হ'য়ে সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, পরাক্রম ও কৌশল নিয়ে evil-এর (পাপের) মাথার উপর এমন ক'রে দাঁড়ান যা'তে সে surrender (আত্মসমর্পণ) করে। চলার পথে difficulty (অসুবিধা) আছেই, তাকে ধীরভাবে manage (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে manipulate (সামঞ্জস্য) ক'রে successful (কৃতকার্য্য) হওয়াতেই যত কৃতিত্ব। যাজনের ক্ষেত্রেও একটা মানুষের ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্যায় যাই থাক, গোড়াতেই তা' সোজাসুজি প্রতিরোধ করতে চেষ্টা না ক'রে কুশল-কৌশলে তাঁকে উৎক্রমণী ক'রে তোলার চেষ্টা করাই ভাল।

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, শুক্রবার (ইং ২১। ১১। ১৯৪১)

অতি প্রত্যুষে ইন্দুদা (বসু), বিমলদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসলেন। দিগন্তবিসারী মাঠের উপর দিয়ে একটা হিমেল হাওয়া ভেসে আসছে, আশেপাশের বাঁশঝাড়ে পাখীগুলি আনন্দে কলরব করছে, আশ্রম-প্রাঙ্গণ নিরালা—নিস্তব্ধ। সবাই প্রণাম ক'রে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমের পূর্ব্বকাহিনী বলতে লাগলেন। Commerce and Culture (কমার্স এ্যাণ্ড কালচার), বিশ্ববিজ্ঞান, Mechanical Works (মেকানিক্যাল ওয়ার্কস্), Chemical Works (কেমিকেল ওয়ার্কস্), Registered Body (রেজিষ্টার্ড বডি) করার বৃত্তান্ত, মহারাজের নামে জমি কেনা, কত লোক কতভাবে ঠকিয়েছে ইত্যাদি কত কথা। তারপর শিক্ষাপ্রসঙ্গে বলতে লাগলেন—আজকাল training (শিক্ষা) এমন হয়েছে যে একখানা দা গড়াতে

পঞ্চাশজনের মিলিত পরিশ্রমের দরকার হয়। কোন একটা মানুষ কাজের সব দিকটা জানে না। All-round training (সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা) দেব ব'লে কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান করলাম, এগুলির সত্তা খুব শক্ত, তা' না হ'লে যেরকম foolish experiment (বেকুবী পরীক্ষা) সবটার উপর করা হয়েছে, এতদিন এগুলি টিকতো না।

প্রফুল্ল—সে experiment (পরীক্ষা) আপনি allow (অনুমোদন) করলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না ক'রে করি কী? সবাই এসে বলে, suggestion (মত) দেয়। এখন অনেকের শিক্ষা হয়েছে। এই সব পরমেশ্বর ধাঁচের মানুষ নিয়েই মুশকিল। সবাই ঈশ্বর সাজতে চায়। যারা ঠাকুরের দ্বারা কতটা fulfilled (পরিপূরিত)—সে কথা না ব'লে ঠাকুরকে তারা কতটা fulfil (পরিপূরণ) করছে সেইটেই বেশী ক'রে বলে, তাদের সন্দেহ করতে হয়।

কতিপয় লোক-সম্বন্ধে কথা উঠতে বললেন—এদের দোষই বা কী, সব খেয়ালানন্দের দল আর কি?

অনেক কথার পর বললেন—যা' হয়েছে তা'তেও কিছু না, তোরা কয়েকজন যদি আবার ফিঙ্গে হ'য়ে লাগিস—সব হবে। এই ভাব চাই—ইষ্টই আমার সব, তাঁর জন্যই বেঁচে আছি, আমার উন্নতি বলতে বুঝি তাঁর উন্নতি, তাঁর স্বার্থ, তাঁর প্রতিষ্ঠা, এই যতটা করতে পারলাম ততটাই আমার জীবনের সার্থকতা। জীবন, বৃদ্ধি কিংবা আত্মোন্নতি ইত্যাদি ধুয়ো ধরলে তেমন লোক বুদ্ধি ঘুলিয়ে দিতে পারে। বাইরের লোকের কাছে সে-সব কথা থাকতে পারে, কিন্তু তোমাদের তা' থাকলে চলবে না। সোজা কথা—সেই মানুষটি, তিনি ভগবান কিনা, বুদ্ধ কিনা, কেষ্টঠাকুর কিনা, চৈতন্যদেব কিনা, অতশত দিয়ে আমার কাজ কী? 'এহো বাহ্য আগে কহ আর', তিনি যদি তা' হন, তা' পরে evolve করবে (আমার বোধে উদ্ভিন্ন হবে)। আমারই মা কালী হ'তে পারেন, কিন্তু মা-কালী হ'য়েও তিনি প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ আমার মা। মা মা-ই—এ রূপ বাদ দিয়ে তাঁর চিন্ময়ীরূপ আমার কাছে বড় নয়। তাই চণ্ডীদাস বলেছে—'মরম না জানে ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যারা, কাজ নাই সখি তাদের লইয়া, বাহিরে থাকুক তারা।' তেমন ভালবাসা যদি থাকে, তখন তিনি ছাড়া, তাঁর ভাল-মন্দ ছাড়া, তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আলাদা কোন বোধই থাকে না। আর সাধু মানে সে-ই, যে সব circumstances-কে (অবস্থাকে) manage (ব্যবস্থা) ক'রে, disburse (পরিবেষণ) ক'রে, adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে rule (আয়ত্ত) করতে পারে—কাজ সুন্দরে সমাপন করতে পারে।

গীতার কয়েকটা শ্লোক নিয়ে আলোচনা হ'লো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, গীতার 'বাসুদেব' কথাটা আমার খুব ভাল লাগে। আত্মা, পরমাত্মা, ব'লে কথা নয়, বসুদেবের ছেলে বাসুদেবই আমার সব—এই হ'লো মোক্ষম কথা।

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, শনিবার (ইং ২২। ১১। ১৯৪১)

অন্যান্য দিনের মতো আজও যথাসময়ে ঈষদা-দা (বিশ্বাস), বিমলদা (মুখোপাধ্যায়), ইন্দুদা (বসু) প্রমুখ পৌঁছে গেছেন। কথাবার্ত্তা সুরু হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তথাকথিত University education (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা) ছেলেদের normal motor-sensory co-ordination (স্বাভাবিক চিন্তা ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য) অনেক কষ্টে ভেঙ্গে তাকে একটা graduated (ডিগ্রীধারী) ঠ্যাং ভাঙ্গা 'দ' ক'রে তোলে। University থেকে যখন বেরোয়, তখন চারিদিকে সরষের ফুল দেখতে থাকে, কী করবে কিছুই বুঝতে পায় না, decision (সিদ্ধান্ত) ব'লে কিছু থাকে না। Principle or Ideal (নীতি বা আদর্শ) ব'লে কিছু না থাকলেই এমনি হয়। Principle or Ideal (নীতি বা আদর্শ) কিন্তু একটা idea (ভাব) না, একজন person (মানুষ)। 'চরিত্র', 'চরিত্র' বলে, কিন্তু একটা চরিত্রবান মানুষ সামনে না থাকলে চলা বা বিবেচনা ঠিক হয় না, তাই চরিত্রই form (গঠন) করে না। মেরী ম্যাগ্‌ডলিনের কথা ভাব তো দেখি, তার আগের জীবন কেমন ছিল। কিন্তু ক্রাইষ্টকে যখন সবাই deny (অস্বীকার) করল তখন কিন্তু সে একলাই তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিল। পরে যখন শিষ্যেরা দেখল—আসর জমে উঠেছে, গা ঢাকা দিয়ে থাকলে পস্তাতে হবে, তখন এক-একজন খাতা, গামছা বগলে নিয়ে অমুক saint, তমুক saint (সাধু) নাম নিয়ে বের হ'লো। সব সত্ত্বেও মেরী ম্যাগ্‌ডলিনের বলতে হবে চরিত্র।

ইন্দুদা—আপনি হয়তো সবার যা' করণীয় তা' ব'লে দিয়েছেন, কিন্তু একজন হয়তো বলছে—শ্রীশ্রীঠাকুর তো individually (ব্যক্তিগতভাবে) আমাকে কিছু বলেননি, সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কারণ ঐ ego (অহং)। 'নরক কা মূল অভিমান'। এক ছেলে হয়তো বাপের জন্য আম নিয়ে গেছে, তখন বাপ ব্যস্ততাবশতঃ নজর দিতে পারেনি। আর-একজনের কাছ থেকে হয়তো জামরুল নিয়ে খেয়েছে, সে শুনে অভিমান ক'রে বলল—'আমি আর দেবই না, বাবা আমায় ভালবাসে না।' Complex-এর (বৃত্তির) জন্যই ঐ রকম হয়, normal mood (স্বাভাবিক মেজাজ)-এ সে তা' ভাবতেও পছন্দ করে না। গোড়ার কথা কিন্তু মা-বাপ বা গুরুর প্রতি আমার ভালবাসা, তাঁদের জন্য আমার করা, তার উপরই আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। মা-বাবা আমাকে লাখ ভালবাসলেও আমার কিছু হবে না, আমি সে-ভালবাসা realise (অনুভব) করতেও পারব না। টান থাকলে গুরু মারলেও বলতে থাকে—'মেরা গুরু বড় দয়াল'।

নাম ও নামী-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম-নামী অভেদ, যে নাম সেই কৃষ্ণ। নাম নামীর সবটাকেই নির্দ্দেশ করে। Realised man (সিদ্ধপুরুষ) সদ্‌গুরু না হ'লে এবং সেই সদ্‌গুরুর প্রতি টান না থাকলে নাম ফলবতী হয় না, তাই আছে—'কোটী জন্ম করে যদি নাম সংকীর্ত্তন, তথাপি না পায় কেহ ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

সংসৃজন ও সংগঠন-কর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠলো—শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—Consolidation (সংহতি) যে হয় না, তার দুটো কারণ আছে। প্রথম complex-এর (বৃত্তির) nurture (পোষণ)-এর জন্য ঠাকুরকে utilise (ব্যবহার) করে, 'আমি ঠাকুরের' এ বুদ্ধি থাকে না। আর mutual interest (পারস্পরিক স্বার্থ) না দেখে পরস্পরকে ঠকিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। একজন হয়তো কুক্রিয়াসক্ত, কিন্তু সে ফিরবার পথে ইন্দুদার মা'র একাদশী—এই ভেবে একটা তরমুজ রাস্তা থেকে কিনে নিয়ে এল। যে যেমনই হোক, পরস্পরের প্রতি এই টান আসলেই consolidation (সংহতি) আসে। রাধারমণ! তুমি হয়তো ইন্দুর একটা বাড়ী তৈরী করার ভার নিলে—তুমি ভাবলে, 'আমি তো শতকরা এত পাব, যা' লাগে লাগুক,' তুমি খাটলেও খুব, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইন্দু ভাবলো—ঠকে গেছে। তুমি যদি ভার নিয়ে গোড়া থেকেই ভাবতে, কেমন ক'রে পাঁচশত টাকার-টা আড়াইশত টাকায় করা যায়, পায়খানায় গিয়ে ব'সেও দাগ কাটছ, পরিকল্পনা করছ, মাথায় ওই চিন্তা পেয়ে বসেছে—এইভাবে একটা উপায় তখন বেরিয়ে গেল, সেইমতো ক'রে ফেললে, ইন্দু খুশি হ'য়ে তোমায় তখন কত দেবে, আর সে-পাওয়া কত মিষ্টি। তা'তো না। মাথায় থাকে অন্য ধান্ধা—তা'তে তুমি ঠকো। প্রত্যেকের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বিবেচনা ক'রে চললে আমার স্বার্থই ভালভাবে বজায় থাকে। Charity begins at home—নিজের বাড়ী থেকেই এ-সব আরম্ভ করতে হয়। বাড়ীতে ও সদ্‌গুরুর স্থানে সবাইকে নিয়ে চলতে গেলে অনেক সইতে হয়, ধৈর্য্যের পরীক্ষা চলে, তাই বলে, কাশীতে কালভৈরব আছে। যাহোক, পরস্পর প্রীতিপূর্ণ এই সওয়া-বওয়া ছাড়া কিন্তু সংহতি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইন্দুদাকে বললেন—তোরা যদি বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে পারিস তবে কালিদাসী, সরোজিনী এরা cottage industry (কুটীরশিল্প), knitting product (সূচীশিল্প) ভাল ক'রে করতে পারে।

রোগ-ব্যাধি এবং চিকিৎসা-সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নাম ক'রে রোগ সারান আগে বহু হয়েছে। এর একটা record (লিখিত বিবরণ) নেওয়া ভাল। নিজের বা immediate (নিতান্ত) কাছে যারা আছে তাদের মধ্যে doubtful (সন্দেহপূর্ণ) or sarcast (বিদ্রূপাত্মক) attitude (মনোভাব) থাকলে হয় না। পারা না-পারার কোন প্রশ্ন না নিয়ে বিভোর হ'য়ে রোগীকে স্পর্শ ক'রে নাম করতে থাকলে

একটা effulging shower of vital force (প্রাণশক্তির প্রোজ্জ্বল বর্ষণ) হ'তে থাকে, তা'তে curative force (আরোগ্যকারিণী শক্তি) বৃদ্ধি পাওয়ায় রোগ নিরাময় হয়। এতে কারও কোনরকম infection (সংক্রমণ) হয়েছে ব'লে শোনা যায়নি। Observe (পর্য্যবেক্ষণ) ক'রে দেখতে হয়।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে চরে বেড়াতে-বেড়াতে কেষ্টদা জোয়াডের গাইড টু মডার্ণ পলিটিক্যাল থিয়োরিস্-সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-পূরণের স্থান নেই যেখানে, সেখানে গোল আছে জানবেন।

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, রবিবার (ইং ২৩। ১১। ১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর অতি প্রত্যুষে কেবলমাত্র ঘুম থেকে উঠে তাসুতে বিছানায় ব'সে তামাক খাচ্ছেন। তখনও ঘোর-ঘোর অবস্থা, বাঁশঝাড় থেকে দু'চারটি পাখী সবাইকে সজাগ ক'রে দেবার জন্য ভোরের জাগরণী গান গাইছে, কয়েকটি কুকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে, আর সামনের বিরাট চরে এক বিশাল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। এমন সময় বিমলদা (মুখোপাধ্যায়), ইন্দুদা (বসু), ঈষদা-দা (বিশ্বাস), পঞ্চাননদা (সরকার), প্রফুল্ল প্রমুখ তাসুতে এসে নীচেয় বসলেন। ব'সে তাঁকে দেখছেন, দেখছেন তাঁর স্মিতগম্ভীর অপূর্ব্ব দিব্যকান্তি; স্নেহকরুণা-প্রেম-সমুজ্জ্বল সেই নিখিল-আনন্দ-বিগ্রহকে দেখতে-দেখতে সকলের মন এক অপার্থিব ভাবরসে ভরপুর হ'য়ে উঠছে। এমনতর অবস্থায় কিছু সময় নির্ব্বাকভাবে কাটলো। তারপর শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হ'লো।

প্রফুল্ল—ছাত্রজীবনে যে-সব বই আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, সে-সব পড়ার যে কোন প্রয়োজন আছে, তা' আমরা বোধ করি না, তাই সেগুলি পড়তে ভালও লাগে না, তার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খেলাধূলো ও কাজের ভিতর-দিয়ে যদি শিক্ষা হয়, তবে অমন হয় না। পাঠ্য বিষয়গুলির উপযোগী ক'রে নানারকমের খেলাধূলো ও জীবনচলনার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজের সৃষ্টি করা লাগে। তুমি হয়তো ছেলেদের নিয়ে একটা গাড়ী তৈরী করলে, বললে, whistle দিলে (বাঁশী বাজালে) blue flag (নীল নিশান) দেখালে, train (গাড়ী) start দিয়ে (চালিয়ে) দেবে। এই খেলার ভিতর-দিয়ে কত কী সে অজ্ঞাতসারে শিখে যাবে। এই সঙ্গে-সঙ্গে এমনভাবে ইঙ্গিত দিতে হয়, যা'তে তার অনুসন্ধিৎসু উদ্ভাবনী বুদ্ধি তরতরে ও তুখোড় হ'য়ে ওঠে। তখন কোন-কিছু করবার কায়দা-করণ জানবার জন্য প্রয়োজনবশেই সে হয়তো বইপত্র ঘেঁটে পট ক'রে অনেক-কিছু এস্তামাল ক'রে নেবে, মনে রাখবার জন্য তাকে কোন কসরতই করতে হবে

না। কোন্ ফাঁকে যে সে কী শিখলো তা' নিজেই ঠাওর পাবে না। ছেলেরা novel (উপন্যাস) প'ড়ে একটা কথাও ভোলে না, অথচ Battle of Trafalgar-এর (ট্রাফালগারের যুদ্ধের) একটা কথাও মনে থাকে না, তার মানে কী? তার মানে, ঐ interest-এর (ভাললাগার) খাঁকতি, interest awaken করাই (অনুরাগ জন্মানটাই) শিক্ষকের প্রধান কাজ, আর সেটা একটা art (শিল্প)-বিশেষ। শিক্ষকের চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গী, কথাবার্ত্তা খুব মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই। কথার ভিতর-দিয়ে তাঁরা ছবি এঁকে দেবেন, ব্যাপারটা বাস্তব ও জীবন্ত ক'রে তুলবেন, আর তাঁদের নিত্য-নূতন নানারকম activity (কর্ম্ম) ও game (খেলা) invent (উদ্ভাবন) করতে হয়, ছাত্রদেরও তখন মাদকতার মতো এসে যায়। ফল কথা, practical (বাস্তব) কাজের উপর দাঁড়িয়ে হবে যত-কিছু theoretical (উপপত্তিমূলক) পড়াশুনা। এইভাবে করলে খুব কম ছেলেই অকৃতকার্য্য হয়। ছাত্র যদি অকৃতকার্য্য হয়. তার জন্য প্রধানতঃ শিক্ষকই দায়ী। একটা ছেলে পারে না, তার মানে তার interest-এর (ভাললাগার) দরজা দিয়ে আমি ঢুকতে পারিনি। Field-work (কর্ম্মক্ষেত্র)-এর ভিতর লক্ষ্য ক'রে প্রত্যেকের বিশিষ্ট interest (অনুরাগের বিষয়)-টা ধরতে হয়, কে কী করতে, কোন্ ধরণের গল্প শুনতে ভালবাসে, দেখতে হয়। তার ভিতর-দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়, তাহ'লেই পারে।

গেষ্ট-হাউসে একটি দাদার কয়েকবার পায়খানা হয়েছে শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়াতাড়ি প্যারীদাকে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে।

পঞ্চাননদা পূর্ব্বপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন—তবে কি merit-এর (মেধার) কোন প্রশ্ন নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Merit (মেধা)-ferit সব নির্ভর করে মা ও শিক্ষকের প্রতি ছেলের টানের উপর। Original (মূল) টানটারই furtherance (ক্রমোন্নতি) ঘটিয়ে দিতে হয়। আর, সেটাও অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষকের সক্রিয় ইষ্টানুরাগের উপর। অবশ্য, পিতা-মাতার মধ্যেও এ-জিনিসটা থাকা চাই, কিন্তু তাঁরা যদি আদর্শবান্ নাও হন, শিক্ষক আদর্শবান্ হ'লে ছেলেদের চরিত্রকে প্রভূত পরিমাণে আদর্শানুগ ক'রে তুলতে পারেন।

আচার্য্য-প্রতিনিধি হয়তো ছাত্রদের বলছেন—'পঞ্চাননদা তোদের কত ভালবাসেন, কেমনভাবে মেশেন, যখন পড়ান ঐ কালো চামড়ার ভিতর-দিয়ে যেন আলো ঠিক্‌রে বেরোয়। আমি ভাবি অমন পড়ান কেমন ক'রে, মানুষ না দেবতা! আমি যে বুড়ো মানুষ, আমারও ইচ্ছে করে তোদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে ব'সে পড়ি। *** মাষ্টারমশায় তোমাদের জন্য এত করেন, তোমরা কিন্তু রোজ তাঁকে কিছু দিয়ে খেও।' শ্রেয়কে দেওয়ার auto-initiative urge (স্বতঃস্বেচ্ছ আকূতি) গজিয়ে দেওয়া শ্রদ্ধাকে পুষ্ট

ক'রে তোলবার একটা বাস্তব পন্থা। যাহোক, শিক্ষককে ছাত্র যখন কোন জিনিস দিতে আসলো, তিনি হয়তো বললেন, 'তোমার যেমন আমাকে দিতে ইচ্ছে করে, আমারও তো অমনি একজন আছেন, তাঁকে দিতে না পারলে আমারও ভাল লাগে না, চল যাই ঠাকুরকে দিয়ে আসিগে।' ছাত্র হয়তো বললো, 'আপনি কিছু রেখে দেন।' শিক্ষক বললেন—'না, চলো। তাঁকে খাইয়ে আমার তৃপ্তি। আর, তোমার ভালবাসার দান তাঁর সেবায় লাগলেই তুমিও সার্থক, আমিও সার্থক, আর সেই আমার পরম পাওয়া। আর, ঐ পথে চল যাই, আচার্য্য-প্রতিনিধিকেও কিছু দিয়ে আসব।' ছেলের তখন কী আকূতি! তখনই দৃষ্টি গেল ঠাকুরের দিকে।

তাছাড়া, শিক্ষকেরা পরস্পরের সুখ্যাতি করবেন, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করবেন। শিক্ষকদের ছাত্রদের প্রতি homely, intimate, loving attitude (সহজ, অন্তরঙ্গ, প্রীতিময় ভাব) থাকবে, অথচ honourable distance (সম্ভ্রমাত্মক ব্যবধান) থাকবে। সব চেয়ে ক্ষতি করে নিজে পালন না ক'রে উপদেশ দিতে যাওয়ায়। ওতে ছাত্রেরা অশ্রদ্ধাপূর্ণ সমালোচনা করার সুযোগ পায়। নিজে আচরণের ভিতর-দিয়ে সহজ কল্যাণকর অভ্যাস, ব্যবহার, ঝোঁক এস্তামাল করিয়ে দিতে পারলেই কাজ হ'য়ে গেল। সেইজন্য শিক্ষকদের প্রথমতঃ চাই আচারবান্, চরিত্রবান্ হওয়া। তাঁদের জীবনে, তাঁদের চরিত্রে, তাঁদের চলনায় যা' জীবন্ত হ'য়ে থাকবে, প্রকট হ'য়ে থাকবে, অজ্ঞাতসারে তাই-ই সঞ্চারিত হ'তে থাকবে ছাত্রদের মধ্যে, আর তাই-ই তাদের উত্তর-জীবনকে প্রভাবিত ক'রে তাদের উন্নতি-অবনতির নিয়ামক হ'য়ে দাঁড়াব। জাতিও চলবে সেই পথে। তাই ভেবে দেখ, শিক্ষকের দায়িত্ব কতখানি।

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, সোমবার (ইং ২৪।১১।১৯৪১)

অন্যান্য দিনের মতো আজও ভোরে অনেকে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাসুতে সমবেত হলেন। ভগবৎ-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবানের মধ্যে আছে ঐশ্বর্য্য, আধিপত্য (mastery), যাঁকে সার্থক করতে গিয়ে কারও দুনিয়ার প্রত্যেকটা জানা প্রত্যেকটা জানাকে সার্থক ক'রে মহাসার্থকতা লাভ ক'রে meaningful (সার্থক) হ'য়ে ওঠে, প্রবৃত্তিগুলি বিন্যস্ত ও সংহত হ'য়ে ওঠে, জীবনের যাবতীয় যা'-কিছু সঙ্গতিশীল সমাধানী একীকরণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—সংশ্লেষণী, বিশ্লেষণী তাৎপর্য্যে,—তিনিই তার ভগবান। মানুষ বাস্তব মানুষের মধ্যে এইভাবে ভগবানকে পায়—যেমন অর্জ্জুন পেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে, হনুমান রামচন্দ্রের মধ্যে, বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের মধ্যে—বাঞ্ছিতের আগ্রহে তাঁকেই উপলক্ষ্য ক'রে সব সার্থকতায় সংগ্রথিত হয়, প্রত্যেকটা প্রত্যেকটাকে fulfil (পরিপূরণ) ক'রে integrated

(সংহত) হয়, consolidated (সংবদ্ধ) হয়, প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সঙ্গে wedded (পরিণয়-নিবদ্ধ), welded (মিলিত) হ'য়ে যায়। যেমন, কাম তখন ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্যকে fulfil (পরিপূরণ) ক'রে, ক্রোধ—কাম, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্যকে fulfil (পরিপূরণ) করে ইত্যাদি। এটা হয় যখন সব-কিছুকে একমাত্র ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নিয়োজিত করা যায়—এই করাই সব বৃত্তিকে converge (একমুখী) ক'রে explain (অর্থপূর্ণ) ক'রে, adjust (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে chaos (বিশৃঙ্খলা)-এর মধ্যে cosmos (সুশৃঙ্খল-বিধান) গ'ড়ে তোলে। নিশ্চয়াত্মিকা প্রত্যয় ও জ্ঞানের ভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষ স্বতঃই তখন ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠিত হয়, সর্ব্বার্থসিদ্ধির কৌশল তখন তার আয়ত্ত হয়। তখন 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' হ'য়ে ওঠেন তার কাছে। তখন সে বলে—'ব্রহ্ম আমার বাঞ্ছিতের অঙ্গজ্যোতিঃ,' প্রেষ্ঠকে বাদ দিয়ে তখন তা'র চাওয়া ও পাওয়ার আর কিছুই থাকে না। এতে যে কী সুখ, কেমন ক'রে বলব, কিভাবে বোঝাব? মিছেই মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধিতে নিজেকে বঞ্চিত করে, মানুষের এই বেকুবী দেখে আমার বড় ব্যথা লাগে।

প্রফুল্ল—মা-বাবাকে অনুসরণ করলে কি অমন অনুভূতি হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাতৃভক্ত ছেলে ইষ্টানুরক্ত হয়ই। তবে যাঁকে অনুসরণ করব, তিনি যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আচরণ-প্রতিষ্ঠ আচার্য্য না হন, তাঁর জীবনে জীবন্ত demonstration বা দৃষ্টান্ত যদি না দেখি, তাঁর কাছ থেকে impulse (প্রেরণা) যদি না পাই, তাহ'লে হয় না। দুটো দিকের সামঞ্জস্য চাই, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যপালী পূবয়মাণ আচার্য্য ইষ্ট বা গুরুপুরুষোত্তম চাই এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি চাই প্রবৃত্তিপরভেদী অচ্যুত সক্রিয় অনুরাগ। এই মণিকাঞ্চন-সংযোগ যখন হয়, তখনই মানুষ সার্থক হয়। অমনতর সদ্‌গুরুকে শুধু দেখলেই হয় না বা নিষ্ক্রিয়ভাবে তাঁর উপদেশ শুনলেও হয় না। করা চাই, করা ছাড়া কিছুই আমাদের করতলে আসে না, অর্থাৎ তা' আমাদের আয়ত্ত হয় না। শুধু গুইসাপ দেখা আর শোনা যে গুইসাপের চামড়ায় খঞ্জুরী হয়, আর গুইসাপের চামড়া দিয়ে খঞ্জুরী ক'রে মোচে তাও দিয়ে মনের আনন্দে আপন হাতে তা' বাজান, এই দুইয়ে ঢের তফাৎ। সন্ধান পাওয়া ও আধিপত্য থাকা পৃথক জিনিস। এই আধিপত্যলাভ—এও কিন্তু ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য, নিজের হীনত্ববুদ্ধি বা কামকামনার পরিপোষণের জন্য নয়। আর কিছু না, ছেলেবেলা থেকে বৃত্তিস্বার্থ ও বৃত্তিপ্রতিষ্ঠা বড় না হ'য়ে যদি মা-বাপের স্বার্থপ্রতিষ্ঠা বড় হয়, তবে ঘরে-ঘরে দুর্গোৎসব লেগে যায়। অবশ্য, মা-বাপেরও ইষ্টপ্রাণ হওয়া দরকার। ইষ্টপ্রাণতাই বস্তু, আর কিছুরই দাম নেই। ইষ্টকে যে অনুসরণ করব তাও দেখব তিনি কতখানি ইষ্টপ্রাণ।

পঞ্চাননদা—ইষ্ট বা গুরুহীন বহু লোক আজ সমাজে গুরুর আসন অধিকার ক'রে ব'সে আছেন। তাঁদেরই বেশী লোক মানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ললিত-মধুর কণ্ঠে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে বললেন—

'যার যাকে লাগে ভাল, তারে ভজুক তারা গো
আমার কিন্তু লাগে ভাল শচীর দুলাল গোরা গো।'

ইষ্ট না থাকলে মানুষের কী অবস্থা হয় সেই-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগভরে বলতে লাগলেন—Ideal (ইষ্ট) না থাকলে, ego (অহং) passion-এ (প্রবৃত্তিতে) rest করে (অনুশায়ী হ'য়ে থাকে), (অহং) প্রবৃত্তিঝোঁকা হ'লে মানুষ whimsical (খামখেয়ালী) হয়, সে যে কখন কোন্ দিকে যাবে, কাকে কী করবে আর নিজেকেও বা কোন্ অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই, কিন্তু মানুষ Ideal-এ (ইষ্টে) যুক্ত হ'লে wise (প্রজ্ঞাবান), sweet (মধুর), grave (গম্ভীর) ও strong (শক্তিমান) হয়, তার passion (প্রবৃত্তি)-গুলিও ঐ ইষ্টেরই সেবা করে। ইষ্ট হলেন চিরমঙ্গলময়, তাই প্রবৃত্তিগুলিও তখন নিজের ও পরের মঙ্গল আবাহন করে, ওগুলি তখন হয় ধর্ম্মের বাহন, রিপু অর্থাৎ শত্রু হয়ে থাকে না, আর তাকে দমন করার জন্য কসরতও করতে হয় না। ফল কথা, প্রবৃত্তিগুলি খারাপ কিছু নয়, ওগুলি libido-রই (সুরতের) manifestation (অভিব্যক্তি)। ওগুলি খারাপ হয় তখন, যখন ইষ্টের সেবায় লাগে না তখন ওরা আর আমার থাকে না, ওদের আমি হ'য়ে যাই অর্থাৎ শয়তানই হয় তখন আমার ও আমার প্রবৃত্তির চালক। তবে শুধু নামকো ওয়াস্তে ইষ্টস্বার্থ, ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করলে চলবে না। মানুষ ইষ্টস্বার্থ, ইষ্টপ্রতিষ্ঠা নিয়ে ঘোরে, তার পিছনেও অনেক সময় হয়তো উদ্দেশ্য থাকে কোন মেয়েমানুষের বাহবা পাওয়া, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা, বা নাম-কেনা, তা'তে যে বেশী-কিছু ফল হয় তা' হয় না। এই বুদ্ধি থাকা চাই যে, আমার সব-কিছু দিয়ে তাঁকেই উপচয়ী ক'রে তুলব, তাঁর জন্যই তাঁকে চাইব। একটু যার মন আছে, ইচ্ছা আছে, সেই পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করা হ'লো—'শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি, তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ'—কথার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরুন, আমি হয়তো নেই, আমার অবর্ত্তমানে আমার ছেলেদের মধ্যে আমার সাদৃশ্য লক্ষ্য করবেন, তাদের ভালবাসবেন আমার থেকে এসেছে ব'লে, কিন্তু তাদের ইষ্ট ব'লে ভাবতে পারবেন না, তেমনি।

ঈষদা-দা একটি পেন্সিল ফেলে উঠে যাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়াতাড়ি ডেকে পেন্সিল তুলে নিতে বললেন। আরো বললেন, সব দিকে খেয়াল রেখে চলবেন। বে-খেয়াল মানেই জানবেন imbalance (সাম্যহারা ভাব)।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, মঙ্গলবার (ইং ২৫।১১।১৯৪১)

রাত্রির শেষযাম, পদ্মাচরের আশ্রমভূমি এখনও নিদ্রিত, বকুলগাছ ও বাবলাগাছগুলি নির্ব্বাক প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। সারা রাত্রির শিশিরস্নাত ধরিত্রী মৌন যোগাসনে

ব'সে কার ধ্যান করছে কে জানে? তাঁরই কাছে তো সবাই ছোটে, সবাই তাঁর পায়ের তলায় এসে জোটে, এর কোন দিন-ক্ষণ নেই, অবিরত অবিশ্রান্ত চলেছে মানবাত্মার এই চিরন্তন অভিসার, দরদীর কাছে, মরমীর কাছে, প্রজ্ঞানঘন প্রেমময়ের কাছে তাই মানুষের ভিড় লেগেই থাকে, তিনি চির-অতন্দ্র, আর নিরন্তর চলে তাঁর অজস্র সুধাবর্ষণ।

আজ তপোবনের শিক্ষকবৃন্দ এসেছেন জিজ্ঞাসু মন নিয়ে। শিক্ষা-সম্বন্ধে সুরু হলো তাঁর অমৃত বাণী—আদর্শকে ধ'রে instinct (সহজাত সংস্কার)-গুলিকে বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে তোলাই শিক্ষা।

নগেনদা—ছেলেপেলের instinct (সহজাত সংস্কার) বোঝা যাবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেপেলের instinct (সহজাত সংস্কার) বোঝা কঠিন কিছু নয়, heredity (বংশগতি) consider (বিবেচনা) করতে হয়, খেলাধূলোর মধ্য-দিয়ে লক্ষ্য করতে হয়, কার কোন্দিকে ঝোঁক দেখতে হয়, খেলার সাথীর সঙ্গে unguarded moment-এ (অসতর্ক মুহূর্ত্তে) ব্যবহার কেমন করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়, এই সবের মধ্য-দিয়ে ধরা যায়, আর সেই অনুযায়ী nurture (পোষণ) দিতে হয়, stimulate (উদ্দীপ্ত) করতে হয়, active (সক্রিয়) করতে হয়। জেলের ছেলের কাছে জালের উপমা দিতে হয়, কুমোরের ছেলের কাছে হাঁড়ি-পাতিলের কথা বলতে হয়। ক্লাসে অনেক ছেলে থাকে, তাদের বংশানুক্রমিকতা ও পরিবেশ বুঝে, এমন একটা common (সাধারণ) ধরণ বের করতে হয়, যেটা সকলেরই মনে ও মাথায় ধরে। তাছাড়া আবার রকমারি ধরণে বলা লাগে, যা'তে বিভিন্ন group (দল)-এর ছাত্ররা specific nurture (বিশিষ্ট পোষণ) পায়। আর, যদি demonstrative delivery (প্রদর্শনযোগ্য পরিবেশন)-এর রকম ক'রে, অর্থাৎ একটা theatrical performance (নাট্যাভিনয়)-এর মতো ক'রে তাদের কাছে appear (প্রত্যক্ষ) করিয়ে দিতে পার, আরো ভাল। Instinct (সহজাত সংস্কার)-গুলিকে nurture (পোষণ) দিয়ে acquisition (অধিগমন)-এ interested (অনুরাগী) ক'রে, প্রত্যেকটি জানা প্রত্যেকটি জানাকে meaningful (সার্থক) ক'রে তোলে, ছাত্রের ভিতর এমনতর active adjustment (সক্রিয় সঙ্গতি) এনে দেওয়াই শিক্ষকের প্রকৃত কাজ। সমস্ত life-affair (জীবন-চলনা)-কে কতকগুলি activity (কর্ম্ম)-র group-এ (শ্রেণীতে) ভাগ ক'রে নিতে হয়, syllabus (পাঠ্যপুস্তক)-ও সেই অনুযায়ী activity-র (কর্ম্মের) ভিতর-দিয়ে পড়িয়ে দিতে হয়, ঐ purpose (উদ্দেশ্য) fulfilled (পূরণ) হয় এমনতর ক'রে নূতন ধরণের বই লিখতে হয়।

ছেলেপেলেরা কোন সময় পড়াশুনায় willing (ইচ্ছুক) থাক আর না থাক, practical activity (বাস্তব কর্ম্ম) থাকলে মুহূর্ত্তে তাদের mood (মনোভাব) ready

(প্রস্তুত) ক'রে নেওয়া যায়। ছেলে যে পারে না এমনভাবে কিছুতে ঢোকাতে নেই—teacher (শিক্ষক)-এর একটা careless remark (অসতর্ক উক্তি) ছেলের মাথা খেয়ে দিতে পারে। কাজে, কর্ম্মে, ব্যবহারে, পড়াশুনায় ছাত্রের একটু উন্নতি দেখলেই তা' publicly (সাধারণ্যে) appreciate (তারিফ) করা লাগে, ওতে encouraged (উৎসাহিত) হ'য়ে বাহবার লোভে আরো লেগে যায়।

Greatest disqualification of a teacher (শিক্ষকের প্রধান দোষ) হলো, আর-একজন teacher (শিক্ষক)-কে down (খাটো) করা। Ideal-কে মাঝখানে রেখে প্রত্যেক teacher (শিক্ষক) প্রত্যেক teacher-এ এমনভাবে interested (অন্তবাসী) হবে, যে ১৫ জন teacher (শিক্ষক) যেন আলাদা-আলাদা নয়,—সবাই মিলে যেন একজন teacher (শিক্ষক)। ছাত্ররা যতজনের কাছেই পড়ুক, মনে হবে একজনের কাছেই পড়ছে। একটি ছাত্র কোন একজন teacher (শিক্ষক)-এ interested (অন্তরাসী) হ'তে গেলে সব teacher-এ (শিক্ষকে) interested (অন্তরাসী) না হ'য়ে পারবে না। শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে যে, indomitable active urge to fulfil the Ideal Beloved-ই (প্রিয়পরমকে পরিপূরণের অদম্য সক্রিয় আকূতিই) হ'চ্ছে fundamental nucleus of man-building, nation-building (মানুষগঠন ও জাতিগঠনের মূল প্রাণকেন্দ্র)। আরো স্মরণ রাখতে হবে যে, করা-মুখর পড়া হবে, কিন্তু পড়া-মুখর করা নয়।

বিমলদা—কী-কী কর্ম্মের আয়োজন করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, agriculture (কৃষি)-কেই করতে হয় মূল ভিত, সেই সঙ্গে থাকবে carpentry (ছুতোরের কাজ), smithy (কামারশালের কাজ), wicker-works (বাঁশ ও বেতের কাজ), tailoring (দর্জ্জির কাজ), weaving (বয়ন-শিল্প), drawing (অঙ্কন), masonry (রাজমিস্ত্রীর কাজ) ইত্যাদি with a view to demonstrate physics and chemistry with mathematical accuracy and artistic skill (গাণিতিক অভ্রান্ততা ও শিল্প ও সৌন্দর্য্যবোধজাত কুশলতা নিয়ে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রকে বোধায়িত করবার জন্য)। সমস্ত কাজের ভিতর-দিয়ে দেখতে হয় efficiency (দক্ষতা) grow করছে (বৃদ্ধি পাচ্ছে) কিনা, কত কম সময়ে কত beautifully and profitably output (সুন্দর ও লাভজনকভাবে উৎপাদন) করছে।

অর্জ্জনে পটু সাশ্রয়ী কাজে
সুন্দরে সমাপন,
এই দেখে তুই বুঝবি লোকের
দক্ষতা কেমন।

গতানুগতিকভাবে কতকগুলি কাজের প্রবর্ত্তন করলেই যে হবে তা' নয়, teacher-এর (শিক্ষকের) যদি inquisitive (অনুসন্ধিৎসু), researchful (গবেষণামুখর), active attitude (সক্রিয় মনোবৃত্তি) থাকে, তবেই monotony (একঘেয়েমি) break করে (ভেঙ্গে যায়), ছাত্রের শেখার urge (আকূতি)-ও বাড়ে।

আলোচনার স্রোত চলেছে। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথাগুলি শুনছেন। মাঝে-মাঝে এক-আধটা প্রশ্ন করা হ'চ্ছে। পূর্ব্ব-আলোচনার সূত্র ধ'রে প্রশ্ন করা হ'লো—আপনি শিক্ষার মধ্যে কৃষি, কাঠের কাজ, কামারশালার কাজ, বয়ন, রাজমিস্ত্রীর কাজ, বেত ও বাঁশের কাজ, নানাপ্রকার কুটিরশিল্প ইত্যাদি অবশ্য শিক্ষণীয় হিসাবে প্রবর্ত্তন করতে চেয়েছেন, জীবিকা-হিসাবে এ-সব যদি গ্রহণ না করি, এত শিখে লাভ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই fundamental activities at ease with electric speed (মৌলিক কাজগুলি সহজে বিদ্যুৎগতিতে) করার অভ্যাস থাকলে, তোমার আর বেকার হ'তে হবে না, allied (সংশ্লিষ্ট) যে-কোন কাজ আরম্ভ করতে পারবে। তোমাকে এ-সব কাজে কেউ ঠকাতে পারবে না। আর, এতগুলি কাজ যদি তোমার জানা থাকে, তুমি ওকালতি কর, আর যাই কর, finely (সূক্ষ্মভাবে) ও successfully (কৃতকার্য্যতা-সহকারে) করতে পারবে। কারণ, ঐসব কাজের অভিজ্ঞতা তোমার বোধকেও অতখানি পুষ্ট ক'রে তুলবে, তোমার ভিতর confidence (আত্মপ্রত্যয়) গজিয়ে দেবে। ওগুলি জানতে গিয়ে motor-sensory co-ordination (বোধপ্রবাহী ও কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ুর সঙ্গতি) ও অর্জ্জনপটুতার training (শিক্ষা) ছেলেবেলা থেকে হ'য়ে থাকবে, —তাই তোমাকে উতরে দেবে। সব কাজ জানা ও পারার মধ্যে থাকলে, যে-কোন situation (অবস্থা)-কে face করতে (সম্মুখীন হ'তে) ঘাবড়াবে না। আজ আমাদের দেশে চৌকষ মানুষের বড় অভাব হ'য়ে গেছে, স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব সর্ব্বতোমুখী শক্তি ও প্রতিভার স্ফুরণ যদি ক'রে তুলতে পার, মানুষগুলি গোটা মানুষ হ'য়ে উঠবে, জাতিও শক্তিমান হবে। দীর্ঘদিন motor nerve use (কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ুর ব্যবহার) না ক'রে-ক'রে তথাকথিত শিক্ষিত অনেক অনেক দিক থেকে পঙ্গু হ'য়ে রয়েছে। তাদের ঐ-সব fine nerve (সূক্ষ্ম স্নায়ু)-গুলি অবশ হ'য়ে গেছে। ওগুলিকে বাস্তব কাজের ভিতর-দিয়ে যদি পোষণ না দেওয়া যায়, জীবনের উল্লাসই তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে না, আবার future generation (পরবর্ত্তী বংশধর)-ও এর দ্বারা affected (আক্রান্ত) হবে। তাই, শিক্ষায় practical work (বাস্তব কাজ)-এর কথা আমি অতো ক'রে বলি। Motor-sensory co-ordination (বোধপ্রবাহী ও কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ুর সঙ্গতি) -কে যদি ignore (উপেক্ষা) কর, সে-শিক্ষা ফলবতী হবে না।

প্রফুল্ল—তাহ'লে motor-sensory co-ordination (বোধপ্রবাহী ও কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ুর সঙ্গতি) জাগানোর তুক কী? আর, পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও বা তা' ব্যাপকভাবে চারান যায় কেমনভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর দৃপ্ত-কণ্ঠে আবেগভরে বলতে লাগলেন। ভাবের আতিশয্যে তাঁর চোখদুটি বিস্ফারিত হ'য়ে জ্বল-জ্বল করতে লাগল, বদনমণ্ডল এক অপূর্ব্ব-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো—স্বস্ত্যয়নীর ক'টি factor (নীতি) পালন কর, ঐ ক'টি ছাড়া পথ নেই। ওতে সব হবে, নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয় বলছি,—কোন সন্দেহ নেই। একজন স্বস্ত্যয়নী করতে থাকলে, সে তো বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে যাবেই, তার চলনায়, তার impulse-এ (প্রেরণায়) তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও factor (নীতি)-গুলি ঢুকতে থাকবে। স্বস্ত্যয়নী হ'লো একটা সপারিপার্শ্বিক run (গতি)—evolution (বিবর্ত্তন)-এর দিকে, becoming (বিবর্দ্ধন)-এর দিকে। এতে physical (শারীর), complex (বৃত্তি)-র দিক, psychical (মানস), environmental (পারিবেশিক), material (জাগতিক)—সব দিক সমান্তরালভাবে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'তে থাকবে। সবগুলিই কিন্তু পালন করতে হবে, কোন-একটি নীতি পালনে ত্রুটি হ'লে বুঝতে হবে আমার এই পুণ্যব্রত ক্ষুণ্ণ হ'লো, নিষ্ঠার সঙ্গে সর্ব্বদা সজাগ হ'য়ে এদিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে, নিত্য নিরখ-পরখ ক'রে দেখতে হবে, আমার ঐ ব্রত উদ্‌যাপনে কোথায় ব্যত্যয় হ'লো, সেটা আবার জাগ্রত প্রচেষ্টায় বাস্তব আচরণের বেলায় শোধরান লাগবে। এইভাবে দেখতে-দেখতে একটা মানুষ নিশ্ছিদ্র আমান দেবতা হ'য়ে ওঠে। তার পারিপার্শ্বিকও রাঙ্গিয়ে ওঠে নূতন রং-এ। স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতির কথা আবার বলছি—(১) ইষ্টপূজার যন্ত্র বিবেচনা ক'রে শরীরটাকে সুস্থ ও সহনপটু ক'রে তুলবে। (২) যে-কাজে যা' ভাল ব'লে মনে হবে তাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মে ফুটিয়ে তুলবে। (৩) প্রবৃত্তি যখন যেদিকেই উঁকি মারুক না কেন, সে-ঝোঁকটাকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার দিকে ঘুরিয়ে দেবে। (৪) পারিপার্শ্বিকের বাঁচা-বাড়াকে নিজেরই বাঁচা-বাড়ার স্বার্থজ্ঞানে ইষ্টানুগ সেবা ও যাজনে তাদের উচ্ছল ও উদ্বর্দ্ধিত ক'রে শ্রেয়প্রাণ ক'রে তুলবে। (৫) আর নিত্য নব-নব উদ্‌ভাবনী প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে নিজের আহরণ বাড়িয়ে ইষ্টার্থে যত বেশী পার নিবেদন ক'রবে, এবং ত্রিশ দিনের দিন তিনটি টাকা ইষ্ট-সকাশে নিবেদন ক'রে বাদ বাকী স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত তহবিলে মজুত রাখবে। তা' দিয়ে স্থাবর ইষ্টোত্তর সম্পত্তি করবে, তার আয়ের এক-পঞ্চমাংশ তুমি সেবাইত হিসাবে গ্রহণ করতে পার, বাকী চার অংশ ইষ্টোত্তর সম্পত্তি বৃদ্ধির কাজে লাগাবে। সবগুলি নীতিই পালনীয়, কিন্তু অর্ঘ্য রাখাটা যদি অটুটভাবে চালান যায়—এমন কি, বিশেষ অবস্থায় ভিক্ষা ক'রেও যদি সেটা অব্যাহত রাখা যায়, তার ফলে আস্তে-আস্তে অন্যগুলিও আসতে থাকে, অবশ্য যদি আগ্রহ থাকে। আরগুলি পালন করার চেষ্টা করি, কিন্তু অর্ঘ্য রাখি না, তা'তে কিন্তু হবে না। উৎসের জন্যই যা-কিছু, ওইটে হ'লো বোঁটা—ঐ বোঁটা ভেঙ্গে গেলে আর সবও ভাঙ্গতে থাকবে। মূল urge (আকূতি) ঠিক রাখতে হবে সর্ব্বদাই, নইলে নিরর্থক হবে, শুকিয়ে যাবে প্রচেষ্টা। Knowledge of time (সময়ের জ্ঞান)-এর জন্য accuracy of time and date (সময় ও তারিখের নির্ভুলতা) observe (প্রতিপালন) করা দরকার।

বহু লোকে properly (যথাযথভাবে) স্বস্ত্যয়নী observe (প্রতিপালন) করার ফলে, কতখানি যে হ'তে পারে ভেবে শেষ করা যায় না। স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত থেকে কত স্বস্ত্যয়নী-ষ্টেট গ'ড়ে উঠবে। কোন এক actuary (হিসাব-বিশারদ) নাকি এটাকে বলেছে revolutionary economics (বিপ্লবী অর্থনীতি)। কোন emergency-তে (বিশেষ সঙ্কটকালে) স্বস্ত্যয়নীর ষ্টেটগুলির বার্ষিক আয়ের চারের পঞ্চমাংশ টেনে নিলে আর tax (কর ধার্য্য) করা লাগবে না, ইষ্ট ও পূর্ত্তের জন্য অফুরন্ত সম্পদ র'য়ে যাবে, দেশে আর হা-ভাত আসতে পারবে না, জগৎ অমৃতময় হয়ে যাবে।

সকলের মর্ম্মস্থল আলোড়িত ক'রে আগ্রহ-আবেগে শ্রীশ্রীঠাকুব কথাগুলি ব'লে গেলেন! বলার পর সহজভাবে আদরভরা কণ্ঠে বললেন, "প্যারীচরণ! তামাক খাওয়াও।" প্যারীদা তামাক সেজে গড়গড়ার নলটি শ্রীশ্রীঠাকুরেব হাতে তুলে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে হাসিমুখে প্রীতি-প্রসন্ন ভঙ্গীতে সস্নেহে সবার দিকে তাকাতে লাগলেন; তাঁর মধুময় দৃষ্টি সকলের অন্তরে যেন অমৃতস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে, সকলের বুক কানায়-কানায় ভ'রে উঠছে, কারও কোন কথা বলতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না, একটা সুখ-বেঘোরে আচ্ছন্ন স্তব্ধ সবাই।

ধীরে-ধীরে অরুণোদয় হ'লো। শিশিরস্নাত বালুচর ঝিকমিক ক'রে উঠলো। বাবলা, নিম ও বকুলের শীর্ষে ঝলকে উঠলো সোনালী আলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে লোকের ভিড়ও জমে উঠতে লাগলো। আবালবৃদ্ধ-বনিতা আসছেন সু-প্রভাতে তাঁকে প্রণাম ক'রে, সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিয়ে দিন-যাত্রাকে শুভোৎসবময় ক'রে তুলতে।

এরপর মহাপুরুষ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের আবির্ভাবের বিষয়ে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রয়োজনমতো এক-একটা constellation (জ্যোতিষ্কমণ্ডলী) আগে পরে সবটা নিয়ে ফুটে ওঠে, মহাপুরুষ যখন আসেন—তাঁ'তে অনুরক্ত সাঙ্গোপাঙ্গও আসেন, এই সাঙ্গোপাঙ্গদের কাজ হয় ঐ মহাপুরুষের mission (জীবনোদ্দেশ্য)-কে বাস্তবে ফুটিয়ে তোলা। মহাপুরুষেরা যে পদাঙ্ক রেখে যান, তাই হয় ভবিষ্যৎ মানুষের চলার পথ। সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে যাঁরা যত অচ্যুতনিষ্ঠাসম্পন্ন, আচরণ-সিদ্ধ, লোক-হৃদয়কে আদর্শে আকৃষ্ট ক'রে তারা তত দেব-দীপ্তিতে দীপ্তিমান হ'য়ে ওঠেন। মানুষ এঁদের কথা স্মরণ ক'রে ভরসা পায়, প্রেরণা পায়, জীবন পায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পায়খানায় গেলেন এবং শ্রীযুত কিশোরীদার পরিচালনায় মাতৃ-মন্দিরের বারান্দায় সমবেত বিনতি-প্রার্থনা সুরু হ'লো।

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, বুধবার (ইং ২৬। ১১। ১৯৪১)

ভোরে তপোবনের শিক্ষকবৃন্দ এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাসুতে। শ্রীশ্রীঠাকুর সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন—তিনিও যেন প্রতীক্ষায় ব'সে আছেন।

এক-একজন আসছেন—আর শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিখুশিভাবে বলছেন—'কে? অমুক দাদা নাকি? ব'সে পড়েন, এঁটে-সেঁটে বসেন, যেমন শীত পড়েছে।' বৃদ্ধ কোন দাদাকে হয়তো বলছেন,—'দাদা আমার চ্যাংড়াদেরও হার মানিয়েছেন, এই শীতের মধ্যে হনহন ক'রে চ'লে এসেছেন, আপনি যেন দিন-দিন young (যুবক) হ'য়ে উঠছেন। ইষ্টে নেশা থাকলে অমনি হয়।' দেখতে-দেখতে যেন একটি প্রাণবন্ত, স্ফূর্ত্তিময় অন্তরঙ্গ আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'য়ে উঠলো। ধীরে-ধীরে আলাপ-আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সুরু হ'লো।

ইন্দুদা (বসু)—বোর্ডিংয়ে ছেলেদের কি single-seated room (একজন থাকার মতো ঘর) করা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একলা থাকলে social (সামাজিক) হয় না। Conflict (সংঘাত) কম হয়। তাই conflict adjust (সংঘাত নিয়ন্ত্রিত) করার ক্ষমতাও বাড়ে না, ওতে বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিও ক্ষুণ্ণ হয়। অন্ততঃ তিনজন থাকা দরকার, দুইজন থাকাও সুবিধাজনক নয়, দুইজনের মধ্যে পারস্পরিক গোপন গলদ ঢুকতে পারে।

বিমলদা (মুখোপাধ্যায়)—ঘরের মধ্যে ক্লাসে ব'সে পড়ান ভাল, না উন্মুক্ত স্থানে, মাঠে বা গাছতলায় পড়ান ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইরে পড়ানই আমার ভাল লাগে। ওতে যেন একটা liberty (স্বাধীনতা) গোঁজা থাকে, দেহ-মনের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। তাছাড়া, ক্লাশের একটা কৃত্রিম আড়ষ্টভাব চ'লে যায়, প্রকৃতির সঙ্গে একটা নিজস্ব সম্পর্কও ধীরে-ধীরে গ'ড়ে উঠতে থাকে।

বিমলদা—ছেলেদের নিয়মানুবর্ত্তী ক'রে গ'ড়ে তোলার জন্য করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হৈ-চৈ করুক, কিন্তু common-interest (পারস্পরিক সমস্বার্থ) যা'তে intact (অক্ষুণ্ণ) রাখে, সেই বুদ্ধি মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে। ফলকথা, কেউ যেন কারও পক্ষে harmful (ক্ষতিকর) না হয়। বুদ্ধি থাকবে—প্রত্যেককে বাড়িয়ে তোলা, অন্যের ভালটা enjoy (উপভোগ) করবে, তা'তে সাহায্য করবে। Inferiority (হীনম্মন্যতা) থাকলে jealousy (ঈর্ষ্যা) প্রবল হয়, আর তা'তে মানুষ নিজেও সুখী হয় না, কাউকে সুখী করতেও পারে না। অপরকে আপন ব'লে ভাবতে শেখা বাস্তবে, আর নিজ স্বার্থবোধে প্রত্যেকের সত্তাস্বার্থী হওয়া—এইটে হবে নিয়মানুবর্ত্তিতার উৎসারক। উচ্ছল প্রাণ-চাঞ্চল্য নিয়েও তখন তারা অসুবিধা বা বিশৃঙ্খলার কারণ হবে না। আর, common interest (পারস্পরিক সমস্বার্থ)-সম্বন্ধে এই sentiment (বোধানুকম্পিতা) গজায় common Ideal-এ (এক আদর্শে) adherence (অনুরাগ)-এর ভিতর-দিয়ে। শিক্ষক যতই ইষ্টপ্রাণ হবেন কর্ম্মিষ্ঠ

তপস্যায়, ততই এটা ছাত্রদের ভিতর সঞ্চারিত হবে। Discipline (নিয়মানুবর্ত্তিতা)-এর মূলে হ'লো disciple-ship (শিষ্যত্ব)।

নগেনদা (বসু)—শাসন কেমন ক'রে করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাসন মানে মারধর নয়—সংযমন, নিয়ন্ত্রণ করা। শিক্ষকের প্রতি যদি ছাত্রের টান থাকে, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, এমন কোন কাজ সে করতে চায় না, ঐ টানই তাকে অনুশাসিত করে। আর, যে-ই যে-কোন অন্যায় করুক না কেন, তার মূল কারণটা কী, সেটা আবিষ্কার করতে হবে এবং যে deficiency-র (খাঁকতির) দরুন সে অন্যায় করে, সেইটে make up (পবিপূরণ) করতে চেষ্টা করতে হবে। Heredity (বংশগতি)-ব থেকে যে defect (দোষ) আসে, সেটা সারা মুশকিল হ'য়ে পড়ে। Environmental nurture-এ (পাবিবেশিক পোষণে) error (ভুল)-এর দরুন যে defect (দোষ) গজিয়ে ওঠে, sympathetically deal (সহানুভূতিসহকারে পরিচালনা) করতে পারলে তা' ঢের শোধরান যায়। পোষণ, তোষণ যেমন বৈশিষ্ট্যানুযায়ী করতে হয়, শাসনের বেলায়ও তেমনি বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিকে লক্ষ্য করতে হয়। তাহ'লেই শাসনের মাত্রা ও ক্রম ঠিক থাকে। গড়সাপটা একরকমে কাজ হয় না। কঠোর শাসন করতে হ'লেও শাসন ও তোষণের উপযুক্ত সমাবেশ চাই।

ভূদেবদা (মুখোপাধ্যায়)—কঠিন বিষয়গুলি কেমন ক'রে সহজ ক'রে তোলা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের উপর যদি রকমারি film (চলচ্চিত্র), drama (নাটক) ইত্যাদি করা যায়, ভাল হয়। আর, যে-কোন বিষয়েই ছাত্রদের পড়াও না কেন, তার একটা dramatic representation (নাটকীয় অভিব্যক্তি) যদি এমন ক'রে দিতে পার যে ছেলেদের তা' ভাল-লাগা ছাড়া উপায় থাকবে না, তখন দেখবে দুরূহ বিষয়গুলিও তাদের কাছে সহজ হ'য়ে উঠবে। আর, বাস্তব জীবনের সঙ্গে সব-কিছুর যোগ দেখিয়ে দিতে হয়।

ঈষদা-দা (বিশ্বাস)—শিক্ষকের করণীয় ব'লে আপনি যা' বলেন, তা' কি আমাদের দিয়ে সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন সম্ভব হবে না? একটু ইচ্ছা ও commonsense (সাধারণ বুদ্ধি) থাকলেই পারা যায়। Unbiased observation (অপক্ষপাত পর্য্যবেক্ষণ) থেকে commonsense (সাধাবণ বুদ্ধি) grow করে (গজিয়ে ওঠে)। যেমন, ডাক্তার তো মেটিরিয়া মেডিকার সব ওষুধগুলি ব্যবহার করেনি, তবু পাঁচটা দেখা থাকে ব'লে নূতন রোগ দেখে ঠিক ক'রে নেয় এই ওষুধটা দিতে হবে। Ideal-এ (আদর্শে) fanatically inclined (গভীরভাবে আনত) থাকলেই passion-এর (প্রবৃত্তির)

সওয়া-হাত উপরে থাকা যায়, তখনই ঠিক-ঠিক observe (পর্য্যবেক্ষণ) করা হয়। নইলে প্রবৃত্তি-অভিভূতির দরুন অনেক জিনিস আমাদের চোখেই পড়ে না। কোন-একটা জিনিস যা'-যা' নিয়ে, তা' অনুধাবন করার ভিতর-দিয়ে আসে জানা, সে-সম্বন্ধে অনুভবকে বলে বোধি। না ক'রে জানা হয় না, করার ভিতর-দিয়ে যে integrated sense (সংহত বোধ) হয়, তাকেই বলে জানা। পড়াশুনা ভাল পারলে তাকে আমরা ভাল ছেলে বলি, কিন্তু ভাল ছেলে মানে profitably active (লাভজনকভাবে কর্ম্মঠ) ছেলে, profitable to himself and the environment (নিজের এবং পারিপার্শ্বিকের পক্ষে লাভজনক)।

ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী)—নিউটনের মাথায় এলো, ফল পড়ে কেন? অন্যর মাথায় এলো না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Inquisitive (সন্ধিৎসু) থাকা active brain-এর (সক্রিয় মস্তিষ্কের) লক্ষণ, inquisitive (সন্ধিৎসু) হ'লে অমন হয়। যার যেমন interest (ভাল লাগা) তার inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) তেমনি, একজন হয়তো একদিকে interested (অন্তরাসী) ও inquisitive (অনুসন্ধিৎসু) হ'য়ে থাকে—অন্যদিককার ঘটনা তার নজরে পড়ে না। অনেকের inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) আদপেই বিশেষ দেখা যায় না, callous (বোধহীন) হ'য়ে থাকে। তারও কারণ দেখা যায়, তাদের inquisitive tendency (সন্ধিৎসু ঝোঁক) কোথাও হয়তো thrashing (আঘাত) পেয়ে বুজে গেছে। Heredity-র (বংশগতির) ভিতর-দিয়েও আবার callousness (বোধহীনতা) transmitted (সঞ্চারিত) হয়—তারও মূলে অনেক সময় থাকে পিতৃপুরুষের জীবনে পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে সন্ধিৎসার অপমৃত্যু।

ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়) অসুস্থ, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর দেবীকে (চক্রবর্ত্তী) পাঠিয়ে তাঁর খবর নিলেন।

প্রফুল্ল—আমাদের এ আন্দোলনে ঋত্বিক্‌দের দায়িত্বই তো সবচেয়ে বেশী, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতই প্রবৃত্তি-ঝোঁকা যে আমরা তো তাদের পথে আনতে পারছি না। এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিক্‌রা হ'লো messenger of the Lord (প্রভুর বার্ত্তাবহ), তারা যদি ইষ্টের সঙ্গে in tune (একতান) থাকে, তখন এমনতর একটা microphonic adjustment (সূক্ষ্ম শব্দ-শ্রবণযন্ত্রের মতো সমাবেশ) হয় যে, ঐ ইষ্টানুগ প্রেরণাই যেন রাশ ঠেলে দিতে থাকে, যেখানে যেমন চলা, বলা, ব্যবহার প্রয়োজন, সেখানে নিখুঁতভাবে তেমনতরই হ'তে থাকে, তখন তারা অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলতে পারে। যত বেয়াড়া মানুষই হোক, বাঁচার ক্ষুধা সবারই আছে, কামুক কামের সেবা ক'রেও বাঁচতে চায়, মরতে চায় না; লোভী খেতে যেমন চায়, বাঁচতেও

চায়; বেঁচে যদি না থাকে খাবে কি ক'রে? বাঁচার আকূতিই হ'লো common basis (সাধারণ ভিত্তি)। ওর উপর ভর দিয়ে, তার প্রবৃত্তিমাফিক টোপ ফেলে সেই সূত্রের ভিতর-দিয়ে তাকে ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রেই হোক, আর যে-ক'রেই হোক, তাকে ইষ্টবিষয়ে interested (অনুরক্ত) ও convinced (প্রত্যয়শীল) ক'রে তোলাই ঋত্বিকের পারগতার মাপকাঠি। ছলেবলে, কলে-কৌশলে যেমন ক'রেই হোক, মানুষকে মঙ্গলের পথে যুক্ত ক'রে তুলতে হবে। শুধু ভাল মানুষ হ'লেই চলবে না, কুশল-কৌশলী হবারও প্রয়োজন আছে। যার মধ্যে যে-রাস্তা দিয়ে ঢুকতে হয় তার মধ্যে সেই রাস্তা দিয়েই ঢোকা লাগবে। এর কোন ধরা-বাঁধা পথ নেই। তবে এক-এক complex-এর (প্রবৃত্তির) উপর দাঁড়িয়ে এক-এক category (শ্রেণী) হয়, তার মধ্যে আবার কত রকমারি থাকে। কোন্ category-র (শ্রেণীর) লোককে কেমন ক'রে deal (পরিচালনা) করলে, সহজে তার ভিতর প্রবেশ করা যায়, সেটা করতে-করতে বোধ করা যায়। যাজনের আগে-পরে বিশ্লেষণ করতে হয়। মহড়া দিতে হয়, কোন্ ধরণের লোকের সাথে কেমনভাবে কী বলা উচিত। মাথায় ঐ ধ্যান লেগে থাকা চাই। আর, সব বিষয়ে ভাল ক'রে পড়াশুনা ক'রে ঢাল-তরোয়ালও ঠিক রাখা লাগে।

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২৭।১১।১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাঁধের ধারে তাঁবুতে বিছানায় ব'সে আছেন। অন্যদিনের মতো আজও তপোবনের শিক্ষকবৃন্দ এবং আরও অনেকে সেই শীতের মধ্যে এসে হাজির হলেন তাঁর সঙ্গলাভের নেশায়। মানুষ ছুটে আসে তাঁর কাছে, না এলে ভাল লাগে না তাই আসে। এসে নূতন ক'রে প্রাণ পায়, প্রেরণা পায়, সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে। নিজেকে নূতন ক'রে ফিরে পায়, নূতন ক'রে অনুভব করে, তাই আসে। যত আসে, তত আসতে ইচ্ছে করে, তাই আসে। আসে, ব'সে থাকে, তাঁকে দর্শন করে, তাঁর কথা শোনে, আনন্দে ভরপুর হ'য়ে ওঠে। চেতনার ক্ষেত্রে চলতে থাকে নব রূপায়ণ,—এমনি ক'রেই মানুষ সপরিবেশ নিজেকে নূতন ক'রে ঢেলে সাজবার রসদ সংগ্রহ করে। সেই অমৃত উৎস হ'তে নিত্যই এমনি ক'রে উৎসারিত হ'চ্ছে প্রেমের প্রবাহ, প্রাণের প্রবাহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের থেকেই বলতে লাগলেন—আমি কাল রাত্রে ভাবছিলাম, এখানে যারা আছে, যদি পরস্পর পরস্পরের interest (স্বার্থ) দেখে, তাহ'লে কারও,—বিশেষ ক'রে এখানকার ছেলেপিলেদের চাকরী করার দরকারই হয় না। প্রত্যেকে যদি মনে করে, অন্য সবার জন্যই তার দায়িত্ব আছে, তার দায়িত্ব শুধু তার পরিবারের কয়েকজনের জন্যেই নয়, তবে সেই love pressure-এর (ভালবাসার চাপের) ঠেলায় কত production (উৎপাদন), কত industry (শিল্প)

গজিয়ে উঠবে। তা'তে কেউ আর বেকার থাকবে না। সকলের মধ্যে সমভাবে এই দায়িত্ববোধের উদ্বোধন হয় না, পরগাছা হ'য়ে নিজের জীবনকে উপভোগ করার মতলবও অনেকের থাকে। তাই, বাস্তবে এটাকে রূপ দিতে গেলে মানুষের পিছনে যথেষ্ট খাটুনির প্রয়োজন হয়। কয়েকটা মানুষ এমন চাই, যাদের মধ্যে অতোখানি দায়িত্ববোধ সক্রিয় হ'য়ে আছে। তারা নিজেরা তো কাজকর্ম্ম করবেই, আবার অন্য সকলকেও স্ফূর্ত্তি দিয়ে নিজেদের সঙ্গে রেখে উপচয়ীভাবে খাটিয়ে নেবে এমনতরভাবে, যা'তে তারা নিজেদের অর্জ্জনের উপর দাঁড়াতে তো পারেই, বরং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। প্রত্যেকের অর্জ্জনপটুতা ও সেবাবুদ্ধি যা'তে বাড়ে, প্রত্যেকটা মানুষ যা'তে more and more efficient (আরো-আরো যোগ্যতর) হ'য়ে ওঠে, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য ক'রে তেমনভাবে nurture (পোষণ) দিতে হয়। করিৎকর্ম্মা হওয়ার, মানুষকে সেবা-সাহায্য করার একটা আত্মপ্রসাদ আছে। আর, ওতে ব্যক্তিত্বও স্ফূরিত হ'য়ে ওঠে, তখন মানুষ মানুষের ভার হ'য়ে থাকতে চায় না। মানুষগুলির পিছনে লেগে থেকে সেই স্তরে তাদের পৌঁছে দিতে হয়। এটা শুধু এখানে নয়, বাইরে গিয়ে ঋত্বিক্‌দেরও এটা করা লাগে। তবে সবাইকেই যে এমনভাবে ঠিক করতে পারবে তা' নয়। কারণ, কিছু লোক আছে যাদের জন্মগত সম্পদের দৈন্য বড় বেশী। কিন্তু যাদের হ'তে পারে, তাদের যদি ক'রে তোলা যায়, তবে সামান্য সংখ্যক লোক অকর্ম্মণ্য হ'লেও তা'তে কিছু আটকায় না।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—মানুষের রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ যেন দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে, এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনটে জিনিস দরকার। প্রথম চাই আদর্শে দীক্ষা, আর চাই সদাচারপরায়ণতা—শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক। যা'তে শরীর-মন শুচি, শুদ্ধ, সুস্থ, স্বস্থ থাকে তাই করাই শারীরিক ও মানসিক সদাচার। আর, একমুখীন আদর্শানুগ গতিশীলতাই আধ্যাত্মিক সদাচার। এ-ছাড়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি interested (অন্তরাসী) হওয়া দরকার with active service (সক্রিয় সেবা নিয়ে), এইগুলি based (প্রতিষ্ঠিত) হবে auto-initiative responsibility (স্বতঃ-স্বেচ্ছ দায়িত্ববোধ) -এর উপর। নিজের পরিবারের জন্য মানুষ যেমন feel (বোধ) করে, বাস্তবে করে, পরস্পরের মধ্যে তেমন হওয়া চাই। সবাইকে নিয়ে যেন একটা পরিবার। এই পরিবারের উন্নতির জন্য প্রত্যেকেই দায়ী। যার যেমন ক্ষমতা, যার যেমন গুণ, যার যেমন প্রকৃতি, সে সেইটুকুই ষোল আনা সদ্ব্যবহার করবে, ফাঁকি দেবে না। আবার, তাই নিয়ে চেষ্টা করবে প্রত্যেকেরই ক্ষমতা, গুণ ও প্রকৃতি যা'তে পুষ্ট হয়! তোমাদের চরিত্র ও চলন দিয়ে এই জিনিসটুকু যদি সঞ্চারিত করতে পার, মানুষের অভ্যাসে এনে দিতে পার, রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ যে কোথায় ছুটে পালাবে, তা' ঠিকই পাবে না। প্রথমে তোমরা এখানে লেগে যাও, এই করায় এখানকার atmosphere

(আবহাওয়া) saturated (ভরপুর) ক'রে ফেল, cruelly but sweetly (নিষ্ঠুর অথচ মিষ্টভাবে) এটা করাই লাগবে। 'Cruelly' (নিষ্ঠুরভাবে) বলছি এইজন্য যে আমরা যদি নিজের ও অপরের সত্তাঘাতী প্রবৃত্তিগুলির প্রতি নিষ্ঠুর না হই, তাহ'লে সত্তার প্রতিই নিষ্ঠুর হ'তে হবে।

চক্রপাণিদার স্ত্রী রেণুমা সন্তান-প্রসবকালে মারা গেছেন। সে-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখ ক'রে বলছিলেন—মেয়েরা eugenic principle (সুপ্রজনননীতি)-গুলি ভাল ক'রে জানে কিনা কি জানি। 'নারীর নীতি', 'নারীর পথে' বইগুলি বোধ হয় সবাই ভাল ক'রে পড়েনি কিংবা জেনেও পালন করে না। মোক্‌থা কথায় আমি যা' বলেছি, ততটুকু যদি করে, মাতা-পিতা ও সন্তান সকলেরই ভাল হবেই এবং তা' সব দিক দিয়ে। জাতির স্বাস্থ্য, আয়ু, ধী ও কর্ম্মশক্তি দেখতে-দেখতে বেড়ে যাবে। বিয়েটা ঠিকমতো দেওয়া লাগে, বর হওয়া চাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়—বিশেষতঃ বংশে। অনেকে এদিকে খেয়ালই দেয় না, তার ফল ভাল হয় না। বরের কুলকৃষ্টি ও প্রকৃতি কন্যার কুলকৃষ্টি ও প্রকৃতির পরিপূরণী হবে, আবার কন্যার কুলকৃষ্টি ও প্রকৃতি হবে বরের কুলকৃষ্টি ও প্রকৃতির পরিপোষণী। কন্যার কুল ও কন্যা নিজে ঐ ছেলেকে পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করবে। এমনতর শ্রদ্ধাপ্লুত ভাব নিয়ে যে-মেয়ে আসে, সে স্বামীর সংসারকে তার তীর্থক্ষেত্র মনে ক'রে যথোপযুক্ত সেবায় সকলকে নন্দিত ক'রে সার্থক হ'য়ে ওঠে, সংসারকে সে উপচে তোলে তার বুকভরা প্রীতি ও প্রাণন-পোষণী দক্ষতা দিয়ে। সে জানে মনোজ্ঞ ব্যবহার কাকে বলে—না চাইতেই, না বলতেই যার যখন যেমনটি প্রয়োজন সে তাই করতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে। আর মেয়েদের এ-সব training (শিক্ষা) ছেলেবেলা থেকেই দেওয়া লাগে। বাপের বাড়ী থেকে অভ্যস্ত হ'য়ে এলে তখন আর বিয়ের পরে কষ্টও হয় না। তবে এ-সমস্ত করার মূলে চাই সুকেন্দ্রিক শ্রেয়প্রীতি, তখন সব জিনিসটাই সহজ হ'য়ে আসে। মেয়েরা যদি পিতৃভক্ত হয়, তাহ'লে সে-সব মেয়েরা সাধারণতঃ ভাল হয়ই।

ভক্তির আবার একটা পরখ আছে, ভক্তি চিরকালই কর্ম্মমুখর। যাকে যে ভক্তি করে, ভালবাসে, তার খুশির জন্য, তার স্বস্তির জন্য সে মাথা ও গা-গতর না ঘামিয়েই পারে না। আবার, নিজের চরিত্রটাকেও সুসজ্জিত ক'রে তোলে তেমনতর ক'রে। এই করতে গিয়ে তার প্রবৃত্তিগুলিও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে। তাই, অমনতর পিতৃভক্ত মেয়ে যদি আদর্শপ্রাণ উপযুক্ত ছেলের হাতে পড়ে, তাকেই নিজের অস্তিত্ব ব'লে গ্রহণ করে, তাকে বাদ দিয়ে নিজের আলাদা কোন খেয়াল-খুশি তার না থাকে, তার জন্য যে-কোন কষ্টকেই সে সুখের ব'লে মনে করে। সংসার সেখানেই স্বর্গ হ'য়ে ওঠে, আর তেমনতর দম্পতির ভিতর-দিয়েই দেবশিশুর আবির্ভাব হয়। বংশ-পরম্পরায় বিয়ে যদি ঠিকভাবে হ'তে থাকে, তবে দেখা যাবে একটা বংশ কেমন

ক'রে ধাপে-ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে! অবশ্য, আদর্শপ্রাণতা ও সুশিক্ষার সংযোগ এর সঙ্গে চাই, আর স্বভাবতঃই তাদের ঝোঁকও থাকে এদিকে।

আবার, একটা বিয়েও যদি কোথাও বেমিসিল হ'য়ে যায়, বংশপরম্পরায় তা' যে কত অপোগণ্ড ও অব্যবস্থের আমদানী ক'রে থাকে তার ইয়ত্তা করা যায় না। লাখ মহাপুরুষ ও শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষেও তা'দের মানুষ করা দুরূহ হ'য়ে ওঠে। বিসমোল্লায় গলদ! করবে কি ক'রে? তাই আমি বিয়ে-থাওয়া ও সুপ্রজননের কথা এত ক'রে বলি। তোমরা কেমন পোষাকীভাবে কথাগুলি নেও, ভাল ক'রে মাথায় নেও না, তাই কেমন যেন ফস্কান ভাব। চারিদিকে কী সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে তা' যদি তোমরা বুঝতে তাহ'লে কি এমন ঢিমে-তেতালা চলনায় চলতে পারতে? আগুন হ'য়ে উঠতে।

পরমপিতার দয়ায় এতখানি সম্পদ তোমরা পেয়েছ, এ নিয়ে tremendous (প্রচণ্ড) বাঁচা যদি না বাঁচা হ'লো, consolidation (সংহতি) যদি না এলো—গতানুগতিক এই চলতি চলায় কী সুখ! কী সার্থকতা! অবশ্য, তোমরা যতটুকু করেছ তা' কম নয়, কিন্তু যা' করণীয় তার তুলনায় তা' কিছু নয়।

অধীর আবেগে কথাগুলি বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন একেবারে তন্ময় হ'য়ে গেলেন। তাঁর চোখ-মুখ দিব্য ভাবদীপনায় স্ফীত, বিস্ফারিত ও আরক্তিম হ'য়ে উঠলো। কাছে যাঁরা বসেছিলেন কারও কোন বাক্য-স্ফূর্তি হচ্ছিল না, সকলেই ভাবতে লাগলেন—তাঁর দয়ার দানের তো তুলনা নেই, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাপূরণে আমরা করছি কতটুকু?

কথা শেষ হ'তে হরিপদদা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উদাস দৃষ্টিতে আনমনাভাবে তামাক টানতে লাগলেন, তাঁর মন যেন তখন কোন অজানা রাজ্যে বিচরণ করছে। এতক্ষণে বেলা হ'য়ে গেছে। কৃষকেরা তখন চরের কলাই-ক্ষেতে কাজে নেমেছে, আর সমবেত প্রার্থনার জন্যও দাদা ও মায়েরা অনেকে এসে জড় হয়েছেন। হরিপদদা গাড়ুটা হাতে ক'রে দাঁড়ালেন, দাদারাও উঠে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ধীরে-ধীরে প্রাতঃক্রিয়ায় গেলেন। কিশোরীদার পরিচালনায় মাতৃ-মন্দিরের বারান্দায় সমবেত বিনতি ও প্রার্থনা সুরু হ'ল।

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, শুক্রবার (ইং ২৮। ১১। ১৯৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ভোরে তাসুতে আনন্দের হাট বসেছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কেমন ক'রে তাড়াতাড়ি আসবে, সেই সম্বন্ধেই কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বাধীনতা আসে না, জাতি স্বাধীন হয়। আমাদের চরিত্রই আমাদের পরাধীন ক'রে রেখেছে। এখনও আমরা এমন কোন platform (মঞ্চ) সৃষ্টি করতে

পারিনি, যেখানে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্যের পোষণ পেয়ে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। আজও আমরা হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি নিয়ে মেতে আছি, কেউ কারও স্বার্থ নই, একটা পারস্পরিক প্রীতি ও দরদ এখনও ফুটে ওঠেনি।

তারপর ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে রাজনীতির কচ্‌কচি আমি বুঝি না। ধর্ম্ম মানে বাঁচা-বাড়া। Politics (রাজনীতি) মানে তাই যা' পূরণ করে, পোষণ করে। পূরণ ও পোষণ করবে কাকে? পূরণ ও পোষণ করবে প্রত্যেকের বাঁচা-বাড়াকে—ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে, সবৈশিষ্ট্যে। এই ধর্ম্মের দাঁড়া হলেন আবার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ—অর্থাৎ সেই মানুষটি যিনি প্রত্যেককে তার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পূরণ করতে পারেন। তাঁর মধ্যে আছে সব ভাব, সব মত, সব পথ, সব বৈশিষ্ট্য, সব স্বার্থ, সব প্রয়োজন, সব পরিপূরণের বৈধী সুসম্পূর্ণ সুসংহত সমাবেশ। পূর্ব্বতন প্রত্যেকটি মহাপুরুষ জীবন্ত হ'য়ে থাকেন তাঁ'তে। তাই জনসমষ্টি, এমন কি মানব-গোষ্ঠীর একায়নী কেন্দ্র হ'তে পারেন একমাত্র তিনি এবং তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই দেশের জনগণ তাদের যা'-কিছু সব নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হ'তে পারে, আর তাই-ই হ'য়ে দাঁড়ায় স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি। আর, এই আদর্শপ্রাণতার উদ্বোধন হ'লে কর্ম্ম তার সঙ্গে-সঙ্গে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। মানুষ তখন পরনির্ভরশীল হ'য়ে থাকতে চায় না, বরং নিজের অবদানে উচ্ছল করতে চায়, উপচয়ী করতে চায় প্রিয়পরমকে। এই করতে গিয়ে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরিবেশের সেবা তাকে করতেই হয়। প্রত্যেকেই এমন করতে থাকে, এমনি ক'রে তাদের প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে গজিয়ে ওঠে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, খাদ্য, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, নিরাপত্তা, যানবাহন, শাসন, সংযমন, অসৎ-নিরোধ, পারস্পরিক যোগাযোগরক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে সুসম্পূর্ণ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতি। তখন রাষ্ট্র স্বতঃই তাদের হাতে এসে পড়ে। কারণ, T. B. (যক্ষ্মা)-রোগীকে এমন nourishment (পোষণ) যদি দেওয়া যায় যা'তে তার vital force (জীবনী-শক্তি) ও resistance power (রোগ-প্রতিরোধী ক্ষমতা) বাড়ে, তখন যেমন তার parasite (রোগবীজাণু)-গুলি শরীর থেকে চ'লে যায়, তেমনি আমাদের সর্ব্বতোভাবে সংহত, সমর্থ ও সত্তাপোষণক্ষম ক'রে তুলতে পারলে, যদি আমাদের শোষক কেউ থাকে, তারা সরবেই, কিন্তু তখন তাদের অনুযোগ করার কিছু থাকবে না। তাই আমার মনে হয়, ইংরেজ তাড়াবার চেষ্টা না ক'রে যদি ইংরেজকে আমাদের প্রতি interested (অন্তরাসী) করতে চেষ্টা করি তাদের সত্তায় interested (অন্তরাসী) হ'য়ে, —তাহ'লে ইংরেজকে আমরা পেতে পারি আমাদের asset (সম্পদ) হিসাবে। আর, আমরা নিজেরা যদি সে-চরিত্র ও প্রস্তুতি আয়ত্ত না করি, এবং ইংরেজ যদি এ অবস্থায় চ'লেও যায়, তাহ'লে এখন যে সমস্যা আছে, সে-সমস্যা তো থাকবেই, বরং সমস্যা তখন আরো গহীন হ'য়ে উঠবে। ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, অনৈক্য, অসংহতি, অসামর্থ্য, অসাধুতা ও স্বার্থান্ধতা পরপ্রদত্ত

ক্ষমতার বলে বলীয়ান হ'য়ে দেশের বুকে প্রেতিনীর নৃত্য সুরু ক'রে দেবে, আর ইংরেজ ও অন্যান্য জাতি আমাদের এ অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে কসুর করবে না—তা' ইংরেজ যাবার আগেও, পরেও। কারণ, ভারতের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি সবারই আছে। ফলকথা, India (ভারতবর্ষ) হলো key to the world (জগতের চাবিকাঠি)। যেমন-যেমন বলেছি তেমনি ক'রে যদি সবাইকে organise ও integrate (সংগঠিত ও সংহত) করতে পার ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ভিত্তিতে—পারস্পরিক সেবা-সহযোগিতা ও সর্ব্বতোমুখী গঠনমূলক কর্ম্মের সুপ্রসারণায়—তাহ'লে সারা ভারতের স্বরাজ আসতে আর বেশী দেরী লাগবে না। স্বাধীনতার সে-রূপ দুনিয়াকেও সত্যিকার স্বাধীনতার পথ দেখাবে। ভারত আবার জগতের গুরু হবে।

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, শনিবার (ইং ২৯।১১।১৯৪১)

ভোরে আশ্রম-প্রাঙ্গণের তাসুতে অনেকেই এসে সমবেত হলেন। সবাই এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে যার-যার জায়গামতো বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও কাঁথা গায়ে জড়িয়ে চৌকিতে বিছানায় আসন গেড়ে বসেছিলেন, মুখে মাখা এক প্রশান্ত পরিতৃপ্তি, চোখে তাঁর করুণাঘন দীপ্ত দৃষ্টি, দেখলে প্রাণ স্বতঃই পুলকিত হ'য়ে ওঠে, অজানিতে তাঁরই কাছে ছুটে যেতে চায়। সবাই আসার পর ঘরোয়া কথাবার্ত্তা দু'চারটে হলো—দুই-একজনের অসুখ-বিসুখ, খাওয়া-দাওয়া, শীত কেমন পড়েছে ইত্যাদি কথা। অতি সাধারণ কথাও শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বলেন, মনে হয়, কত সরস, কেমন সুন্দর, কতখানি প্রাণদ! কথাবার্ত্তার একটা সহজ সম্ভ্রান্ত অন্তরঙ্গ আবহাওয়া জমাট বেঁধে উঠলো।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রশ্ন করলেন—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" কথার মানে কী এবং তা' হয় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন—"তুমি নিশ্চয় ক'রে জেনো আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।" মানুষ বিনষ্ট হয় প্রবৃত্তিবশ্যতায়, কিন্তু with all our passions (সব প্রবৃত্তি নিয়ে) ইষ্টে interested (অন্তরাসী) হ'লে বিনষ্ট হওয়ার উপায় নেই। বেশ্যালয়ে যাবার সময় বাপ, মা, স্ত্রী কত বলে, কাঁদে, কিন্তু সে-সব কথা কি মানুষ তখন শোনে?—এমনি with all our passions (সর্ব্ববৃত্তি-সহ) তাঁ'তে অচ্ছেদ্যভাবে চিরকালের জন্য interested (অন্তরাসী) হওয়া চাই, তা'তে বিনষ্টির মূল ম'রে যায়, বিনষ্ট হবে কেমন ক'রে? তার মানে এ নয় যে, তার দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক, মৃত্যু হবে না। দুঃখ-কষ্ট-রোগ-শোক এলেও তাকে শুভে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় কেমন ক'রে, তা' সে জানে। সব অবস্থাকেই তখন সে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার পরিপোষক ক'রে বিন্যস্ত ক'রে তোলে। কিছুই তখন তাকে দমাতে পারে না, হটাতে পারে না, সে নিরাশ হয় না, হতাশ হয় না, হাল ছেড়ে দেয় না কিছুতেই।

ক্রিয়াশীল আশাবাদী হয় সে। আবার, ভক্তি যদি মানুষের জীবনে একবার জাগে, সে এমন কর্ম্ম কমই করে যা'তে নূতন ক'রে দুর্ভোগের আমদানী হয়। আমাদের সমস্ত দুর্ভোগের মূলে আছে প্রবৃত্তিজনিত কর্ম্ম। তাছাড়া, ইষ্টকর্ম্ম করতে গিয়ে মানুষের জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট আসতে পারে, কিন্তু ইষ্টপ্রীতি যদি থাকে ঐগুলিই তখন সুখের মনে হয়, সেগুলি মনকে ক্লিষ্ট করতে পারে না, কারণ ওতে ক'রে সত্তা পুষ্ট বই ক্ষুণ্ণ হয় না। এই পথে চলতে স্বাভাবিকভাবে কারও মৃত্যুও যদি হয়, তাও সে উন্নততর জীবনের অধিকারী হয়, এমন কি, স্মৃতিবাহী চেতনাও হয়তো লাভ করতে পারে। তাই, জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তার বেলায় পিছে হটা বা নষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনাই থাকে না। পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তিই এই জিনিস সংগঠন ক'রে তোলে।

প্রফুল্ল—আত্মা তো অমর, শেষ পর্য্যন্ত কেউই তো নষ্ট পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা চাই ক্রম-অধিগমনে বিবর্ত্তনের পথে চলতে, বেড়ে চলার পথেই জীবনের আনন্দ, আর এই বাড়তি গতি আমরা অবিচ্ছিন্ন রাখতে চাই জীবন-মৃত্যুর পারাপার ভেদ ক'রে। এটা ঠিকই—আপূরয়মাণ ইষ্টে কারও যদি প্রকৃত টান জন্মে, এবং তাই নিয়ে যদি সে বিগত হয় তবে সে মহান জীবন লাভ করবেই। আবার, এ জীবনে, যে যতই হোমরা-চোমরা হোক না কেন, সে যদি সুকেন্দ্রিক না হয়, প্রবৃত্তিই যদি তার জীবনের নিয়ামক হয়, তবে ঐ বিচ্ছিন্ন বিকেন্দ্রিকতা তার মৃত্যুকালীন ভাবভূমি ও পরজন্মকে যে অপগতিতে অপকৃষ্ট ক'রে তুলবে, তা'তে সন্দেহ কমই।

সুবোধদা (সাহা)—আচ্ছা, আমাদের দুর্ব্বলতার হাত-থেকে বেহাই পাবো কেমন ক'রে? সেগুলিকে চেনা সত্ত্বেও যে তারা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ললিতভঙ্গীতে নিম্নলিখিত ছড়াটি আবৃত্তি করলেন—

"পাপে যখন আসে ঘৃণা
আসে আক্রোশ, অপমান,
ইষ্টপ্রাণন ফেঁপে ওঠে
তখন পাপের পরিত্রাণ।"

তারপর বললেন, দুর্ব্বলতাগুলির প্রতি আমাদের অনুরাগ থাকে, তাদের আদর করি, যত্ন ক'রে পুষে রাখি, তাইতো তারা ঠাঁই পায়। আমি সেগুলিকে আশ্রয় না দিলে, সেগুলিকে না চাইলে, তারা আমাতে টেঁকে কি ক'বে? ঐ চলনের প্রতি যখন একটা ঘৃণা ও আক্রোশ আসে, তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে অপমান বোধ হয়, তখন বোঝা যায় যে সত্যিই আমি তা' চাই না। তবে শুধু negatively (নেতিবাচকভাবে)

ওগুলির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা অনেক সময় ওতে আরও আবদ্ধ ক'রে তোলে। ওই সম্বেগ নিয়ে দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে ইষ্ট ও সৎ-এ নিজেকে বাস্তবভাবে নিয়োজিত করতে হয় হাতে-কলমে; শরীর ও মনকে এতখানি ব্যাপৃত ক'রে তোলা চাই, যা'তে অন্যদিকে নজর দেবার অবকাশই না থাকে। এমনি করতে-করতে ওগুলি খ'সে পড়ে। মানুষ ইষ্টনিষ্ঠ হ'লে খাপ-খোলা তরোয়ালের মতো হ'য়ে যায়, তখন সে কিছুতেই ইষ্টবিরোধী দুর্ব্বলতার সঙ্গে compromise (আপোষরফা) করে না।

মানুষের বিকৃত স্বার্থবুদ্ধি-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরস্পরকে ঠকাবার বুদ্ধি মানেই নিজের cell (কোষ)-গুলি ভেঙ্গে ফেলা, নিজত্বকে হনন করা। শরীরের অন্যসব cell (কোষ)-গুলি যদি সুস্থ ও জীবন্ত না থাকে, তাহ'লে একটা cell যেমন একক সুস্থ ও জীবন্ত থাকতে পারে না, সামাজিক পরিবেশে আমাদের ব্যক্তি-জীবনও তেমনি অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে একক টিঁকে থাকতে পারে না। তা'তে তার অস্তিত্বও অচল হ'য়ে উঠবে, পরিবেশের পোষণ-বঞ্চিত হ'য়ে সে শুকিয়ে উঠবে। তাই, পরস্পর স্বার্থান্বিত হ'য়ে, সবাই মিলে একগাট্টা হ'য়ে চলায় কিন্তু প্রত্যেকের নিজের লাভই সবচেয়ে বেশী। দেহস্থ প্রাণন-শক্তির পোষকতায় যেমন শরীরের কোষগুলির মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সংহতি ফুটে ওঠে, সমাজ-জীবনেও তেমনি সবারই সত্তাপূরণপোষণী জীবন্ত নরবিগ্রহের প্রতি আনুগত্যের ভিতর-দিয়েই এই সংহতি ও সহযোগিতার অভ্যুদয় হয়। তা' বাদ দিয়ে শুধু স্বার্থবুদ্ধিতে কিন্তু পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা যায় না।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, রবিবার (ইং ৩০। ১১। ১৯৪১)

আজও ভোরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাসুতে যথারীতি আলোচনা-বৈঠক বসল।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই কথা ওঠালেন—মানুষকে কেবল দিলেই হয় না, তার কাছ থেকে নিয়ে তার দেওয়ার অভ্যাস ক'রে দিতে হয়, নিজে থেকে মানুষকে দিয়ে সে যা'তে খুশি হয়, তেমনতরভাবে তাকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়। কেবল দিয়ে গেলে তাকে খোঁড়া করা হয়। যে-মানুষ কেবল অন্যের কাছ থেকে নেয়, কাউকে কিছু দেয় না, সে অপদার্থ হ'য়ে যায়, দারিদ্র্য ঘিরে ধরে তাকে। এই জিনিসের প্রশ্রয় দিতে নেই কখনও। সেইজন্য আমি অনেক সময় কারও-কারও কাছে খামাকা একটা কিছু চেয়ে বসি। কিন্তু না চাইতেই যদি দেয়, সেই-ই ভাল। আমার বড় ভাল লাগে যখন দেখি, কেউ আপদ-বিপদে, দুঃখ-কষ্টে, সে না ডাকতেই আর একজন যেয়ে

বুক দিয়ে পড়ে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে সাহায্য করে, আশা-ভরসা-উদ্দীপনায় তুলে ধরে তাকে। পরস্পরের মধ্যে এইটে যত বাড়ে, সংহতিও তত দৃঢ় হ'য়ে ওঠে। অনেক সময় আবার দেখা যায়, মানুষ অন্যকে দেয়, কিন্তু যার কাছে থেকে পায়, তাকে আর দেয় না। তার কাছ থেকে নিতে হবে এই জানে, তাকে যে দিতে হবে এই খেয়াল থাকে না, তাকে দিয়ে তৃপ্তিলাভের প্রলোভনও তাকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তোলে না—এ রকমটা ভাল না, এটা অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর, এতে মানুষের উন্নতি blocked (রুদ্ধ) হ'য়ে যায়। পাওয়ার উৎসকে পুষ্ট করে না অথচ অন্যকে দেয়—এই দেওয়ার পেছনে অনেক সময় দেখা যায় আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি। এইভাবে চলতে থাকলে প্রবৃত্তির আরো নানারকম ফ্যাকড়া বেরোতে থাকে। সেইগুলিতেই মানুষ জড়িয়ে যায়। সুস্থ কর্ম্মদীপনা তার থাকে না। কর্ম্মজঞ্জালের সৃষ্টি হয়। আর, বিশেষ কোন দিকে তার জেল্লা ফুটে উঠলেও সর্ব্বতঃ-সঙ্গতভাবে সুনিয়ন্ত্রিত চরিত্র ও জীবন লাভ করতে পারে না সে কিছুতেই। এমনতর মানুষ সুখের সন্ধান পায় না। ফল কথা, একজন উপকারীর উপকার করে না, মা-বাপের জন্য কিছু করে না, কিংবা গুরুজন বা গুরুর জন্য কিছু করে না, অথচ অন্যের করে—এমনতর দেখলেই বুঝে নিও, সে বৃত্তির সেবা করছে। আর, ঐ অমনতর সেবা তার নিজের বা পরের খুব একটা কাজে লাগবে না, শেষ-রক্ষা হবে না তা'তে।

শৈলমাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর চোখের ইসারায় কী যেন জিজ্ঞাসা করলেন। শৈলমা দুই হাতের আটটা আঙ্গুল দেখিয়ে হাত নাড়তে-নাড়তে দ্রুত চ'লে গেলেন।

বিমলদা (মুখোপাধ্যায়)—আচ্ছা, মানুষ দিন-দিন এত প্রবৃত্তিমুখী হ'চ্ছে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Eugenic relation-এ (যৌন-সম্বন্ধে) গলদ ঢোকাতেই যত সর্ব্বনাশ হয়েছে। বিয়ে যদি ঠিকমতোও হয় তবু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর attachment wisely conscious (অনুরাগ প্রজ্ঞাচেতন) না হ'লে অর্থাৎ চার-চোখো attention (অভিনিবেশ) না থাকলে, ছেলের শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো হ'লেও মানসিক স্বাস্থ্য vigorous (সতেজ) থাকে না, comparatively dull (অপেক্ষাকৃত মূঢ়) হয়, dull (মূঢ়) হ'লে চলনাও সেই ধাঁজের হয়। মোটের 'পর তাদের মধ্যে কোন-না-কোন প্রকারে অসঙ্গতি থাকবেই। কারণ, স্ত্রী যদি স্বামীর সত্তাস্বার্থিনী না হ'য়ে ওঠে সর্বতোভাবে, তার কতকগুলি চাহিদা, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি আলগা ও অসংলগ্ন যদি থাকে তবে তার ব্যক্তিত্ব সংহত হ'য়ে ওঠে না—তার ভিতরকার খণ্ডিত রূপই রূপায়িত হয়ে ওঠে সন্তানে। অবশ্য, স্বামীরও যে কিছু করণীয় নাই তা' নয়, তাকেও আদর্শ-প্রাণ হ'য়ে উঠতে হবে। কিন্তু প্রজনন-ব্যাপারে আমার মনে হয়, স্ত্রীর দায়িত্বই বেশী। যে-বেটীর পেটে জন্ম নিয়েছে সে যা' ক'রে দিয়েছে তাই নিয়েই সব কেরামতি। "যেখানে সেখানে যাও রে মাকু, চরকি ছাড়া নয়।" তাই দেখ, মায়ের

প্রবৃত্তি-পরায়ণতা কেমন ক'রে সন্তানে সঞ্চারিত হয়। অথচ প্রত্যেকটি মা চায় যে তার ছেলে সুখী হোক, সুস্থ হোক, সুদীর্ঘজীবী হোক, কৃতী হোক, ভাল হোক। কিন্তু গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কী হবে? জন্মের পূর্ব্বেই তো একটা জীবনের বেশীর ভাগ রচিত হ'য়ে যায়। কারণ, যে শরীর-মন নিয়ে সে জন্মায়, তার উপর দাঁড়িয়েই তো তার চলা, কিন্তু জন্মের পরে যেমন-যেমন ক'রে সন্তানকে সুগঠিত ক'রে তুলতে হয়, ক'জন মা-বাপই বা তার ধার ধারে? ফলে, ছেলেপেলেদের নিয়েই কত কষ্ট পায়, আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। অথচ নিজেদের যা' করণীয় তা' করে না, চলনাও শোধরায় না। আবার, অনেক সময় মানুষ দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক, দারিদ্র্যে ভোগে, যত ভোগে তত পারিপার্শ্বিকের ঘাড়ে দোষ চাপায়। তা' না ক'রে নিজের কী গলদের দরুন এমন হ'চ্ছে তার নিরাকরণ যদি করে, তবে কিন্তু দুঃখ ঘুচে যায়—তা' তো করবে না, সেদিকে blind (অন্ধ) হ'য়ে থাকে। মানুষ দোষ করলেও কিছু হয় না—যদি সেই experience (অভিজ্ঞতা)-টা মনে রেখে চলনা শোধরায়। আর, এটা কঠিন কিছু না, mal-adjust (কুনিয়ন্ত্রিত)-কে re-adjust (যথাযথ নিয়ন্ত্রণ) করা, এই তো কাজ।

প্রফুল্ল—বড় হওয়া মানে তো কেবল খাটুনি, কেবল কষ্ট—দেহ-মনের আর বিশ্রাম থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ খাটুনির মধ্য-দিয়ে মানসিক ও দৈহিক expansion (বিস্তার) যা' হয়, nerve-এর (স্নায়ুর) সাড়াপ্রবণতা যা' বাড়ে, fatigue-layer (অবসন্নতার স্তর) যেমন ক'রে, pass (অতিক্রম) করে, চৈতন্যের প্রসার যেমন হয়, অধিগমন ও আধিপত্যের পথে মানুষ যেমন বিবর্ত্তিত হ'য়ে এগিয়ে চলে—তাই তো বিশ্রাম, তাই তো আরাম। তবে এগুলি কষ্টকর হ'য়ে ওঠে—যখন মানুষ নিজের জন্য করে, সার্থকতার জীবন-কেন্দ্র যখন তার না থাকে। তখন সমস্ত চাপটা নিজের ঘাড়ের উপর এসে পড়ে, উদ্দীপনী কেন্দ্র বলতে কিছু থাকে না, তাই সতত নিজেকে ভারাক্রান্ত বোধ করে। আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে চলে ব'লে অবসন্নতা ও উৎফুল্লতা দুই-ই তাকে অব্যবস্থ ক'রে তোলে। কিন্তু শ্রেয়নিষ্ঠ হ'লে মানুষ সব সময়ই যেন একটা শক্তির যোগান পায়, ভালবাসার আবেগ তাকে-দিয়ে করিয়ে নেয়, সে দেখে, তাঁর দয়াতেই হ'চ্ছে, আমি নিমিত্ত মাত্র।

এরপর শিক্ষা-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছেলেদের প্রথম থেকে difficulties face করতে (বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হ'তে) দিতে হবে এবং সে-সব overcome (অতিক্রম) করতে দিতে হবে। এতে আত্মপ্রত্যয় ও ইচ্ছাশক্তি বাড়ে, বাস্তব জীবনের সমস্যা-সম্বন্ধে অতো ভীতি থাকে না, ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। Teacher (শিক্ষক)-দের মধ্যে consolidation (সংহতি) ও Ideal (আদর্শ)-কে

fulfil (পরিপূরণ) করার interested enthusiasm (অন্তরাসী উৎসাহ) থাকলে ছেলেদের মধ্যেও teacher (শিক্ষক)-এর প্রতি active attachment (সক্রিয় অনুরাগ) চারিয়ে যায়—তখন আর ছেলেদের শেখার কমতি হয় না, সব কাজেই interested (অন্তরাসী) হ'তে থাকে। ঐ urge-ই (আকৃতিই) তাদের after-life determine (পরবর্ত্তী জীবন নির্দ্ধারিত) করে, সে-সব ছেলেরা difficulty (কষ্ট) দেখলে shirk করে না (এড়িয়ে যায় না), বরং পেখম তুলে দাঁড়ায়। তোমরা যদি ছেলেদের ভাল ক'রে গ'ড়ে তুলতে চাও, এখানকার climate (আবহাওয়া)-ও তেমনি ক'রে তুলতে হবে। বিরাট ঘূর্ণির মধ্যে নৌকা পড়লে তার যেমন আর নিস্তার থাকে না, কাজের একটা তেমন atmosphere (আবহাওয়া) create (তৈরী) করতে পারলে, নূতন ছেলেদেরও সেই কর্ম্মস্রোতের মধ্যে প'ড়ে নিষ্কর্ম্মা থাকার উপায় থাকবে না। কাজের মধ্য-দিয়ে বহু শিক্ষা তাদের দিতে পারবে। হয়তো ইঞ্জিন মোছাচ্ছ—সেই সঙ্গে এমন science (বিজ্ঞান) শিখিয়ে দিলে যে, ছেলেদের science-এ (বিজ্ঞানে) interest (অনুরাগ) খুলে গেল এইভাবে রকমারি কাজকর্ম্ম হাতে-কলমে করাতে হয়, আর তার মধ্য-দিয়ে নানা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ও অনুরাগ জাগিয়ে দিতে হয়। প্রত্যেকটা ছেলের all-round development (সর্ব্বতোমুখী বিকাশ) যেন হয়। প্রত্যেকে সবরকম কাজ জানবে, শিখবে, তবে প্রত্যেকের নিজের একটা বিশিষ্ট বিষয় থাকবে, যা'তে সে normally interested (স্বতঃই অনুরাগী), আর সে-বিষয়ে মৌলিক গবেষণা ও উদ্ভাবনমুখর ক'রে তুলতে হবে তাকে। প্রত্যেকটা বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যেকটা বিষয়ের জ্ঞানকে যাতে আরো সমৃদ্ধ ও পুষ্ট ক'রে তোলে, তেমনভাবে বিষয়গুলির যোগসূত্র ধরিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেকটা বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যেকটা বিষয়ের সম্পর্ক যেমন বুঝিয়ে দিতে হবে, তেমনি জীবনের ক্ষেত্রে তার বাস্তব উপযোগিতা ও প্রয়োগ-কৌশল ধরিয়ে দিতে হবে। সব জ্ঞানকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে সত্তাসম্বর্দ্ধনায়। এ তো করবেই, আরো প্রত্যেকটা ছেলের মধ্যে individuality (ব্যক্তিত্ব) set up (প্রতিষ্ঠা) ক'রে দিতে হবে, যা'তে সে environment (পরিবেশ) -কে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে। সে যেখানে যাবে, ঠাকুর carry (বহন) ক'রে নিয়ে যাবে। Calculating (হিসাবী) টান না হ'য়ে টানের মতো টান হ'লে একটা enchanting magnetic influence (আকর্ষণী চৌম্বক প্রভাব) তার কথাবার্ত্তা, চালচলন, ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে ফুটে বেরুবে। হেঁটে বেড়াবে, তার personality (ব্যক্তিত্ব) over-powering (বিজয়ী) হ'য়ে উঠবে; তার তখন আসবে rational discussion (যুক্তিসঙ্গত আলোচনা), scientific investigation (বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান), consolidated service (সংহত সেবা), interested move (অন্তরাসী চলন)—মানুষ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যাবে। মানুষ বিরুদ্ধ-তর্ক করতে আসলে সে তার enchanting emotional flow (মনোমুগ্ধকর ভাবদীপ্ত বাক্যস্রোত), active

serviceable look (সক্রিয় সেবাপ্রাণ দৃষ্টি) নিয়ে দাঁড়িয়ে এমন ক'রে তার ব্যক্তিগত problem (সমস্যা)-গুলি discover (আবিষ্কার) ক'রে solution (সমাধান) দিতে থাকবে যে, সে একেবারে flooded (পরিপ্লাবিত) হ'য়ে যাবে,—"কহিতে গিয়া কথারই কথা মরম খুলিয়া দিয়াছে"—এমনতর হবে। পারিপার্শ্বিক তার প্রতি attracted (আকৃষ্ট) না হ'য়ে পারবে না। উপগুপ্তের এক গানের তানই অশোককে জাগিয়ে দিল। Enchanting attachment (মুগ্ধ অনুরাগ) থাকলে উপগুপ্তের মতো গান বেরোয়—যা'তে মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে যায়। আবার, টান না থাকলে পিপ্পুলে হরিদাসের মতো ভিতরে intention (ইচ্ছা) রেখে অভিনয় করতে-করতেও টান এসে পড়ে। হরিদাস ছিল চৈতন্যদেবের ভক্ত, সবাই কীর্ত্তন করতো, দরবিগলিত ধারে কতজনের প্রেমাশ্রু গড়িয়ে পড়তো, অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের আরো-আরো কত অভিব্যক্তি তাদের হ'তো। কিন্তু হরিদাস ভাবত, আমার এ পোড়া হৃদয় পাষাণ, তাই প্রভুর প্রতি অনুরাগে আমার চোখ দিয়ে একফোঁটা জলও বেরোয় না। তার অন্তরের শুষ্কতাকে সরস করবার অভিপ্রায় নিয়ে সে তখন পিপুলের গুঁড়ো চোখে দিয়ে প্রভুর নাম করতে-করতে কাঁদতো, এই করতে-করতে তার অন্তরের ছাই-চাপা প্রেমের প্রস্রবণ খুলে গেল, সে ধন্য হ'য়ে গেল। তাই বলি, কারও নিরাশ হবার কারণ নেই, বৈধীভাবে সাধন করতে-করতে কোন্ মুহূর্ত্তে কার অনুরাগের উৎস-কবাট মুক্ত হ'য়ে যাবে তার কি ঠিক আছে?

তাঁর ভাবদীপ্ত অমৃত-মধুর কণ্ঠে কথাগুলি শরীরী দিব্যবাণীর মতোই ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠলো। উপস্থিত সকলের অন্তর-বাহির তখন সুধা-স্রোতে পরিপ্লাবিত। কেবলই মনে হচ্ছিল, 'বিশ্বে বহে প্রেমনদী সুধাব ধারা অবিরাম—প্রাণারাম! প্রাণারাম! প্রাণারাম!'

পর-পর নানা প্রশ্নের অবতারণা হ'তে লাগলো। একজন জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষ যে ইষ্টের কথা শুনতে চায় না, কিংবা শুনলেও গ্রহণ করতে চায় না, এর উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে ইষ্টে interested (অন্তরাসী) নয়, সে passion-এ (প্রবৃত্তিতে) interested (অন্তরাসী) আছেই, সেই passion-এর (প্রবৃত্তির) দোর দিয়ে ঢুকতে হয়। তবু এ-কথা ঠিকই যে, কেউ চায় না যে প্রবৃত্তি-উপভোগ করতে গিয়ে তার সত্তা বিপন্ন হোক। সত্তাই যদি সাবাড় হ'য়ে যায়, উপভোগ করবে কে? এই সত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট ক'রে, সত্তার ধারক ও পোষক হিসাবে ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও দীক্ষার প্রয়োজনবোধ সহজেই মানুষের অন্তরে গেঁথে তুলতে পার। প্রতিটি পদক্ষেপে শ্বাসে-প্রশ্বাসে তুমি যদি ইষ্টকে নিয়ে চল, ইষ্টই যদি তোমার যথাসর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠেন, তখন যে-কোন মানুষকে তুমি লহমায় ইষ্টগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে পারবে সহজভাবে, তখন তার জন্য তোমার দর্শন-শাস্ত্র আওড়ান লাগবে না। নিজের

জীবনটাকে ইষ্টে অচ্যুত, সুকেন্দ্রিক ও সুবিন্যস্ত ক'রে তুলতে গিয়ে, নিজেকে অধ্যয়ন করতে গিয়ে তুমি যে বোধ, বিবেচনা, অনুভূতি ও নিয়মন-কুশলতা আয়ত্ত করবে, তারই সাহায্যে তুমি সারা দুনিয়াকে বোধ করতে পারবে, সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে পারবে, তোমার দর্শন অর্থাৎ দেখা তখন কতজনের দৃষ্টি খুলে দেবে। তাই ব'লে এ কথা নয় যে, perfect (পূর্ণ) হ'য়ে তবে যাজনে নামতে হবে। ইষ্টমুখী হ'য়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি তিনই চালিয়ে যাওয়া লাগবে। ইষ্টকে অবলম্বন ক'রে যতই আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হব—নিরন্তর সক্রিয়তায়,—ততই আমাদের যাজন ফলবতী হবে, সূক্ষ্ম আত্মসমীক্ষণের ভিতর-দিয়ে প্রত্যেককে যথাযথভাবে নিরীক্ষণ করতে পারব, তাই চলাগুলি হবে বাস্তব-অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও যথা-প্রয়োজন। তার সঙ্গে আবার থাকবে ইষ্টসম্বেগ, মানুষের প্রতি দরদ, সবটা মিলিয়ে তা' মানুষকে বোধসন্দীপ্ত ক'রে তুলবে। কিন্তু বহুলোক এমন আছে, যাদের প্রকৃতিই তা'দিগকে সৎ-এ অনুরক্ত হ'তে দেয় না। তবু যে যেমনই হোক, ইষ্টহীন ব্যক্তি যত হোমরা-চোমরাই হোক, ইষ্টনিষ্ঠ তুমি তার ঢের উপরে, এ-কথা স্মরণ রাখতে ভুলো না। তাই, কারও সম্বন্ধে আশা বা চেষ্টা ছেড়ো না, তোমার পারগতা-সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ো না। সেই পরম-কারুণিক প্রাণন-দীপনারূপে সবার অন্তরেই বিদ্যমান। কে জানে, কোন্ মুহূর্ত্তে, কার অনুপ্রেরণায়, কিসের ভিতর-দিয়ে কার জীবনে কী পরিবর্ত্তন আসে।

ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়)—ব্যক্তিগতভাবে অনেকের মধ্যে ইষ্টপ্রাণতা বেশ দেখা যায়, তবু সমগ্রভাবে সংহতি যতখানি আসা উচিত তা' আসে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টে অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও, প্রত্যেকের প্রবৃত্তি-সঞ্জাত কতকগুলি superstition (কুসংস্কার) থাকে, সে তা'তে isolated (বিচ্ছিন্ন সীমায়িত) হ'য়ে থাকে। বৃত্তিভেদী টান যত সময় না হয়, তত সময় ঐ গণ্ডী কেটে ইষ্টের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সকলকে আপন ক'রে নিতে পারে না, নিজস্ব সঙ্কীর্ণজগতে বাস করে। কিন্তু ইষ্টের প্রতি টান হ'লে নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও সব বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করতে শেখে, ভালবাসতে শেখে, সবার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে শেখে। তারপর temperament-এরও (ধাতুগত প্রকৃতিরও) difference (পার্থক্য) থাকে, প্রত্যেকে তার নিজের temperament-এর (ধাতুগত প্রকৃতির) লোকদেরই পছন্দ করে, অন্য-প্রকৃতিসম্পন্ন লোকদের তত পছন্দ করে না। এই সমস্ত কারণে মোটামুটি ভাল লোক যারা তাদের মধ্যেও অনেক সময় পূর্ণ সংহতি ফুটে ওঠে না, তবে তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক বুঝ থাকে। এ তো বলছি ভাল লোকদের কথা। তা'ছাড়া ভোগলিপ্সা, আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি যাদের প্রবল তারা ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে না। তবে মিলনের কেন্দ্র ঐ সর্ব্বাপূরক ইষ্ট—তাঁ'তে এতটুকু টানও যদি থাকে তবে সেই টানে সবাই একত্র হয়, পরস্পরের মেলামেশায় প্রত্যেকের প্রবৃত্তি, প্রকৃতি, স্বার্থ, চাহিদা ও কুসংস্কারে আঘাত লাগে, মানুষ ব্যথা পায়, কিন্তু গোড়ায় একজনের

প্রতি টান থাকায় কেউ কাউকে দূরে সরিয়ে দিতে চায় না। কারণ, তাতে তাঁর মনে আঘাত লাগবে। এইভাবে আসে বুদ্ধি, বিচার, সহনশীলতা ও দরদ, মানুষ adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, তার ভুল ভাঙ্গে। ভুল-ত্রুটি, প্রকৃতি-বৈষম্য ও কুসংস্কার সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরকে আপন ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে, মানিয়ে-পাতিয়ে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলতে শেখে। গোড়ায় টান না থাকলে একটু জোর আঘাত লাগলেই হয়তো স'রে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্কিমদাকে (রায়) বললেন—যেগুলি অবশ্যপালনীয় এমন কতকগুলি ছড়া পঞ্চানন (কর্ম্মকার)-কে দিয়ে লিখিয়ে নাও। যারা অভ্যাস করতে চায় তাদের চোখের সামনে থাকলে সুবিধা হবে।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, সোমবার (ইং ১।১২।১৯৪১)

তাঁর দয়ার দরবার নিত্য অবারিত—তিনি অকাতরে বিলিয়ে চলেছেন মণিমাণিক্য, অমূল্য রত্নরাজি। কাঙ্গাল মানুষ বঞ্চিত হয় না, বিমুখ হয় না তাঁর কাছে এসে কখনও—তাই বারে-বারে আসে, ফিরে-ফিরে আসে, বিশ্বের ভাণ্ডারী যিনি, তাঁরই কাছে—নিখিলের জ্ঞান, গুণ, প্রেম ও প্রাণের রূপায়িত বিগ্রহ যিনি, তাঁরই কাছে।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—সদ্‌গুরু গ্রহণ ক'রে কিছু যদি না করে, তবে কিছু লাভ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা গ্রহণ ক'রে যে যে-ভাবেই চলুক, যাই করুক, একটা খচ্‌খচানি লেগেই থাকে, এইটুকুই লাভ।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—ঋত্বিক্‌রা যদি কদাচারী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষাও দেয়, তাতে কি লাভ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিক্‌দের qualification (গুণ) দু-রকম, এক যুক্ত, আর realised (সিদ্ধ)। যুক্ত মানে interested (অন্তরাসী), attached (অনুরক্ত)। যে যত interested (অন্তরাসী), infusing-এ (ইষ্ট-অনুপ্রাণনা সঞ্চারে) সে তত successful (কৃতকার্য্য)। সবাই সমান না পারলেও আচার্য্যের রকমটা যা' মাথায় থাকে, imparting-এর (সঞ্চারণার) সময় তার কিছু-না-কিছু ঠিকরে বেরোয়ই—তা'তে কাজ হয়। তবে কদাচারী হ'লে অন্তরস্থিত দীপনা নিষ্প্রভ হ'য়ে যেতে থাকে, তখন অন্যের প্রাণকে ভাল ক'রে স্পর্শ করতে পারে না।

প্রশ্ন—'ঋত্বিক্' বই দেখে একজন যদি তা' অনুসরণ করে, কোন ঋত্বিকের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যদি দীক্ষা না নেয়, তা'তে হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'তে হয় না। একজনের কাছ থেকে impulse (প্রেরণা-সংঘাত)-টা পাওয়ার দরকার, সেইটুকুই আদত জিনিস।

ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী)—কোন বিষয়ে মানুষের taste (অনুরাগ) কোথা হ'তে আসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যেমন instinct (সহজাত সংস্কার) ও temperament (প্রকৃতি) নিয়ে জন্মায় এবং তার মধ্যে যেটার আবার nurturing (পোষণ) বেশী পায়, তার সেইটেই prominent (প্রধান) হ'য়ে ওঠে। তাই শুধু জন্মগত সংস্কার থাকলেই হবে না, সেই সংস্কারের উদ্বোধনের জন্য আবার উপযুক্ত পারিবেশিক প্রেরণা চাই। এই পারিবেশিক প্রেরণার অভাবে, সুযোগ-সুবিধার অভাবে মানুষ তার অন্তর্নিহিত অনেক কিছু সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেই সচেতন হ'তে পারে না, তাকে বাস্তবায়িত করা তো দূরের কথা।

প্রফুল্ল—জন্মের ব্যাপারে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর ক্রিয়া এবং অবদানের কথা বোঝা যায়, কিন্তু বাইরের একটা বায়ুভূত soul-এর (আত্মার) সঙ্গে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সম্পর্ক বা সঙ্গতি কী বা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ত্রীর যে ভাবধারা ও যেমনতর impulse (সাড়া)-দ্বারা পুরুষ স্ত্রীতে আনত হয়, পুরুষের brain-centre (মস্তিষ্ক-কেন্দ্রও) তেমনভাবে excited (উত্তেজিত) হয়, আর সেই সময়ই ঐ ভাবের range-এর (সীমার) মধ্যে যত soul (আত্মা) in tune (ঐকতানিক সূত্রে) থাকে, তারা এসে হাজির হয়। Scrotum-এর (অণ্ডকোষের) মধ্যে যে সমস্ত spermcells (শুক্রাণুকোষ) থাকে, সে-সময় সেগুলি charged (শক্তিসম্ভৃত) হ'য়ে নিয়ে life (জীবন) পায় অর্থাৎ ঐ আগত soul (জীবাত্মা)-গুলি spermcell (শুক্রাণুকোষ)-কে life (জীবন) দিয়ে চলৎশীল, নড়নশীল, সজীব ক'রে তোলে, মানুষের শরীরের মধ্যে তখন একটা contraction (আকুঞ্চন)-এর ভাব হয়। তারপর স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময় তারা ovum-এর (ডিম্বাণুর) সঙ্গে মেশার জন্য ছুটে যায়। স্ত্রী আবার স্বামীর ভাবভঙ্গী থেকে, আচার-ব্যবহার থেকে যেমনভাবে impressed (প্রভাবিত) হয়, ovum (ডিম্বাণু)-ও তেমনিভাবে impressed (প্রভাবিত) হয় তার ভাবভূমির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। অবশ্য, পুরুষও যে স্ত্রীর ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে থাকে সে-কথা তো পূর্ব্বেই বলেছি। স্ত্রীর একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাপ্লুত পরিচর্য্যা পুরুষকে যতখানি exalt (উন্নীত) ক'রে তোলে, তত উন্নত স্তরের আত্মা নেমে আসে। কিন্তু শুক্রাণুগুলি যত উন্নত স্তরের আত্মা বহন ক'রেই আনুক না কেন, ডিম্বাণু যে-রকম impressed (প্রভাবিত) হয়, সেই impression (প্রভাব ও ছাপ)-এর সঙ্গে affinity (সঙ্গতি)-ওয়ালা যে শুক্রাণু থাকে তারই সঙ্গে হয় মিলন—যেন খাঁজে-খাঁজে প'ড়ে গেল, আর ফাঁক রইল না, শুক্রাণু

ডিম্বাণুর সঙ্গে মিশে একটা whole entity (গোটা সত্তা) হ'য়ে গেল, তারপর cell-division (কোষ-বিভাজন) আরম্ভ হয় as a whole (সামগ্রিকভাবে)—সেই হোল ছেলে। পুরুষ ও নারী স্বভাবতঃই যদি ঊর্দ্ধমুখী না হয় বাস্তব জীবনে, তবে কিন্তু বুদ্ধি ক'রে ঐ সময়ে উচ্চ ভাবভূমিতে থাকতে পারে না। তাই পুরুষের ইষ্টনিষ্ঠ চলন ও স্ত্রীর ইষ্টানুগ স্বামিভক্তির উপর অতো জোর দেওয়া হয়। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিকতা চাই, সঙ্গতি চাই, গভীর প্রীতি চাই, শরীর, মন, চরিত্র ও প্রকৃতির সামঞ্জস্য চাই, আর এইটে পেতে গেলে বিয়েটা হওয়া চাই বিধিমাফিক। এতখানি হ'লে তবেই উন্নত আত্মার আবির্ভাব সম্ভব। আর, আমার মনে হয়, প্রত্যেকটা sperm (শুক্রাণু)-ই micro-cosmic form-এ (ক্ষুদ্রাকারে) এক-একটা being (জীব), ও নষ্ট করা মানে micro-cosmic form-এর (ক্ষুদ্রাকারের) একটা মানুষ মেরে ফেলা। আমাদের বোধশক্তি ও মমত্ববোধ জাগলে তখন আর অযথা নিষ্প্রয়োজনে, নিজের সুখের জন্য, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য লক্ষ-লক্ষ শুক্রাণু নষ্ট ক'রে অতোগুলি soul (আত্মা)-কে মারতে পারবো না। নিজেরা জন্ম নিতে এসে বার-বার যদি অমন ক'রে মারা পড়ি, তখন কী অবস্থা হয়, সেই কথা চিন্তা ক'রে শিউরে উঠব। অবশ্য, ডিম্বাণু যে সাধারণতঃ একটার বেশী শুক্রাণু গ্রহণ করতে পারে না এবং একটা জীবনকে রূপায়িত ক'রে তোলার ব্যাপারে যে বহু শুক্রাণুর জীবনাহুতির প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে, প্রকৃতির এই বিধানের উপর তো কারও কোন হাত নেই। তাই প্রজননকল্পে ছাড়া অন্য কারণে শুক্রাণু যথাসম্ভব নষ্ট না করাই উচিত। তুমি-আমি সবই তো ঐ living sperm (জীবন্ত শুক্রাণু), প্রত্যেকে ওরই উপর দাঁড়িয়ে গজিয়েছে, ওই আজ কত কথা কইছে, ঘুরছে, ফিরছে, হাতি-ঘোড়া মারছে। তুমি যে-দশা পছন্দ কর না, অনর্থক সে-দশায় ওদের ফেলবে? ওরা যে তুমিই।

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, মঙ্গলবার (ইং ২। ১২। ১৯৪১)

ভোরে বাঁধের ধারে তাসুতে মধুময়কে ঘিরে মধুচক্র জ'মে উঠেছে—বিভোর হ'য়ে সবাই সেই মধুময়ের মধুক্ষরা বচনসুধা পান করছেন, আর উপভোগ করছেন তাঁর মধুর হাসি, মধুর কথা, মধুর চাউনি, মধুর স্নেহ। উপস্থিত সবার কাছে এখন—'সুন্দর আজি সবই সুমধুর, এইতো পূর্ণ এ হৃদয়পুর।'

একটু বেসুরোভাবেই প্রশ্ন করা হ'লো—হঠাৎ অনেক সময় এক-একজনের ব্যবহারে চ'টে যাই, প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে, এর উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের উদ্দেশ্য হ'লো মানুষকে জয় করা, তার হৃদয় অধিকার করা, তার ego-কে (অহংকে) কাবু ক'রে ফেলা, repentance (অনুতাপ) জাগান।

তা' যদি না পারলাম, আমাদের জিদের কিম্মত কী? আর, পারস্পরিক সুখই বা কোথায়? যার উপর প্রতিশোধ নেবো, সেও যদি ব্যথার মধ্যে সুখবোধ না করে, তাহ'লে কি সুখ হয়? আমরা মানুষটাকে পেতে চাই, একটা মানুষকে হারিয়ে লাভ নেই, তবে তার মধ্যে সত্তাসম্বর্দ্ধনার পরিপন্থী যা' আছে তার নিয়ন্ত্রণ বা নিরসন প্রয়োজন। সেইজন্য তাকে শাসনে সংযত করা দরকার হ'তে পারে। এই শাসন হবে আবার প্রীতির শাসন, কঠোরতার মধ্যেও প্রীতি থাকবে। তার প্রতি তোমার প্রীতি যদি তার ভিতর তোমার প্রতি প্রীতি উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে, তাহ'লেই তুমি তাকে সংশোধন করার পথ পেলে। তবে কারও ভিতর obsession (অভিভূতি) থাকলেও বারংবার চেষ্টায় তাকে ফেরান যায়, কিন্তু treacherous habit (বিশ্বাসঘাতী অভ্যাস) ও instinct (সংস্কার) থাকলে তাদের হৃদয় জয় ক'রে তাদের ভিতর পরিবর্ত্তন আনা কঠিন, অনেক ক্ষেত্রে পারাই যায় না।

প্রশ্ন—Treacherous (বিশ্বাসঘাতক) কিনা তা' বুঝবো কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Treacherous (বিশ্বাসঘাতক)-এর একটা লক্ষণ—সবটার মধ্যে সে directly (মুখ্যভাবে), indirectly (গৌণভাবে) নিজেকে establish (প্রতিষ্ঠা) করতে চায়, তার জন্য কে যে কত করছে সে-কথা মুক্ত কণ্ঠে ব'লে কৃতজ্ঞতা জানায় না, সে যে একটা অসাধারণ কৃতী-মানুষ এবং তার গুণের জন্যই সে সর্ব্বত্র তার সমাদর—এই কথাটাই সে কায়দা-করণে, হাবেভাবে, প্রকারান্তরে প্রতিনিয়ত জাহির করতে চায়। ফলকথা, কারও মমতায় সে কিছু করে না, নিজের হীনম্মন্যতার মমতায় যা'-কিছু করে।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আর কিছু না, তোরা যা' ঠিক করেছিস্ সেইমতো heart and soul (প্রাণপণ) খেটে ১৩০ টাকার signatory (স্বাক্ষরকারী) ৫/৭ হাজার জোগাড় কর্, আমি কিছুই বাকী রাখব না।

এরপর অন্য কথা উঠলো।

প্রফুল্ল—ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কথা এত জোর দিয়ে আমরা বলি, সে জিনিসটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক মানুষ আলাদা হয়েছে যা' দিয়ে—সেইটেই তার বৈশিষ্ট্য। বর্ণ ও বংশ এর মধ্যে বিশেষভাবে ক্রিয়া করে, তারপর জন্মকালে পিতা-মাতার মানসিক ভঙ্গী ও ভাবভূমিরও অনেকখানি অবদান আছে এতে। আর চারটে complex (গ্রন্থি) আছে—OEdipus complex (এডিপাশ গ্রন্থি), এর স্বস্বরূপ হ'লো ছেলের মায়ের প্রতি অনুরাগ; Narcissus complex (নার্সিসাস গ্রন্থি), এর স্বস্বরূপ হ'লো আত্মপ্রীতি, আত্মপ্রত্যয়, আত্মমর্য্যাদাবোধ—এর মধ্যে কিন্তু হীনম্মন্যতা নেই, অন্যকে খাটো করার প্রবৃত্তি নেই; Homo-Sexual complex (সম যৌনগ্রন্থি), এর স্বস্বরূপ হ'লো মানুষের

সামাজিকতাবোধ; আর আছে Hetero-Sexual complex (অসম যৌনগ্রন্থি)। সুস্থ যৌন-আকাঙ্ক্ষা যেখানে ধর্ম্মসঙ্গত বিহিত পথে আত্মপ্রকাশ ক'রে নরনারীর বৈধী মিলনের ভিতর-দিয়ে সুপ্রজননে সার্থক হ'তে চায়, তার মধ্যে এর স্বস্থ অভিব্যক্তি দেখা যায়। এগুলির বিকৃতিও ঢের হয়। Psychology-তে (মনোবিজ্ঞানে) কী বলে আমি ঠিক জানি না, তবে আমি এইরকম বুঝি। যাহোক, প্রত্যেকের মধ্যে সব ক'টা complex (গ্রন্থি) থাকলেও, এক-একজনের মধ্যে এক-একটা prominent (প্রধান)। এইগুলি watch (লক্ষ্য) ক'রে বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়, আর সেই অনুযায়ী মানুষকে deal (ব্যবহার) করতে পারলে মানুষ elated (খুশি) হ'য়ে যায়—একটা expression (কথা) শুনেই বলবে, বাঃ, beautiful (সুন্দর), কী চমৎকার লোক, কেমন কথাটা বললো! এই যে একজনের বৈশিষ্ট্য ধরা—তাও নিজে obsessed (প্রবৃত্তি-অভিভূত) হ'য়ে থাকলে পারা যায় না—

'রঙ্গিল দৃষ্টি নয়কো যখন
আগ্রহ-নত মন,
তেমন মনই ধরতে পারে
সংস্কার কেমন।'

ইষ্টের রঙে যে যত রঙিয়ে থাকে সে তত uncoloured (অরঙ্গিল) অবস্থায় প্রত্যেককে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করতে পারে। প্রায় লোকেই প্রবৃত্তির ঘোরে চলে, তাই বিশ বছর যার সঙ্গে একসঙ্গে একঘরে থাকে, তারও বৈশিষ্ট্যটা হয়তো বোঝে না। এই না-বোঝার দরুন কত ঠোকাঠুকি বাধায়, আবার শুধু মাথায় বুঝ হ'লেই যে হয় তা' নয়। প্রবৃত্তি-অভিভূতির কবলে যখন আমরা প'ড়ে যাই তখন কোথায় কার সঙ্গে কী ব্যবহার সমীচীন—তা' জানা সত্ত্বেও আচরণে ফুটিয়ে তুলতে পারি না। তাই, একটু বুদ্ধিমান লোক যারা তারা সর্ব্বক্ষণ ইষ্টরত হ'য়ে প্রবৃত্তি-অভিভূতির মুঠম-হাত উপরে থাকতে চেষ্টা করে।

ফরিদপুর থেকে একটি দাদা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে ফরিদপুরের অনেকের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি কুষ্টিয়া হ'য়ে এসেছেন শুনে ডাক্তারবাবার কথাও জিজ্ঞাসা করলেন।

শরৎদা (হালদার) পূর্ব্বপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—ক্লাশে পড়াতে গিয়ে বা সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে কী-ভাবে বলতে হবে? সেখানে তো নানা বৈশিষ্ট্যের বহু লোকের সমাবেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা musical instrument-এ (বাদ্য-যন্ত্রে) কতকগুলি ঘাট থাকে, গ্রাম থাকে, তার সাহায্যে সব গৎ যেমন বাজান যায়, নানাবিধ প্রকৃতি-ওয়ালা একটা group (দল)-এর কাছে বলতে গেলে তেমনি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য nourishment

(পোষণ) পায়—তেমন ধরণের ঢেউ তুলতে হয়। সব কঁটা pose (ভঙ্গী) নিতে পারলে, tune (সুর) ও touch (স্পর্শ) দিতে পারলে, প্রত্যেকে interested (অন্তরাসী) হবেই। Sublime language-এ (গুরুত্বপূর্ণ মনোজ্ঞ ভাষায়) topic (বিষয়)-এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে tactfully (সুকৌশলে) বলতে হয়। হয়তো বললেন—তোমার ছেলে, তোমার স্ত্রী না খেতে পেয়ে আজ পথে এসে দাঁড়াতে বসেছে—এর সমাধান কি তুমি চাও না? ছেলে-বৌয়ের কথা বলেছ না অমনি তার complex (প্রবৃত্তি) interested (অন্তরাসী) হ'য়ে উঠল—তার মন চেতে উঠল, সে ভাবলো—কী কয় শুনে দেখি। তবে শুধু প্রবৃত্তিতে উস্কানি দিয়ে লাভ নেই, আর মানুষের হীন প্রবৃত্তি যেমন আছে, উন্নত প্রবৃত্তিও তেমনি ঢের আছে। বলতে গিয়ে সেগুলিকে আগুন ক'রে তুলতে হয়—ইষ্ট, কৃষ্টি, ধর্ম্ম, বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের স্বার্থ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের আগ্রহকে উদ্দীপিত ক'রে তুলতে হয়। সুকেন্দ্রিক মঙ্গলকর্ম্মে মানুষকে যতই উন্মাদ ক'রে তুলতে পারবে ততই বোঝা যাবে তোমার বলা সার্থক হ'লো। মানুষ complex-এর (প্রবৃত্তির) রাজ্যে যেমন দাঁড়িয়ে আছে তেমনি প্রবৃত্তিকে sublimate (ভূমায়িত) করার ইচ্ছাও তার আছে। তাই, বাস্তবের সঙ্গে যোগ রেখে বললে সৎ-এর প্রতি নেশা ধরিয়ে দেওয়া কঠিন কিছু নয়। মানুষের যেমন স্বার্থপরতা আছে, পরার্থপরতার প্রবৃত্তিও তা'তে কম নেই এবং সেটা তা'তে কম প্রবল নয়। প্রকৃতপক্ষে, পরার্থপরতাই তার স্বার্থের ভিত্তি। মানুষের যেমন আরামপ্রিয়তা ও তথাকথিত ভোগাকাঙ্ক্ষা আছে, ইষ্টার্থী ক্লেশ-সুখ-প্রিয়তা, ত্যাগ ও দুঃখ-বরণের স্পৃহাও যে তার না আছে, তাও নয়। দরকার ঐগুলিকে উস্কে দেওয়া, ওগুলির প্রতি লোভ জন্মিয়ে দেওয়া। শিল্পীর কাজ হ'লো তাই। প্রত্যেকটি আঙ্গিনা থেকেই এর কর্ষণ যদি চলে, জাতের মধ্যে progressive mood (প্রকৃত প্রগতিমুখী মনোভাব) চারিয়ে যেতে বেশী দেরী লাগে না।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, বুধবার (ইং ৩। ১২। ১৯৪১)

পাবনা মানুষের সব পেয়েছির দেশ, সত্তার ক্ষুধার খোরাক মেলেনি যাদের কোথাও, দিশেহারার মতো পথ হাতড়ে বেরিয়েছে যারা, অথচ পথ পায়নি, পায়নি যারা আনন্দের আস্বাদ, পায়নি যারা প্রেম-ভালবাসা, পায়নি যারা উজ্জ্বল-নির্ম্মল সত্তাসম্বর্দ্ধনী জ্ঞানের আলো, পায়নি যারা জীবনে উদ্দীপনা, কর্ম্মে প্রেরণা, চলার পথের হদিশ, আর্ত্তবেদনায় গুমরে মরছে যারা, পায়নি যারা স্নেহসরস সোহাগ-সিঞ্চিত শান্তির সংশ্রয়—তারা সব পেয়েছে পাবনা-পদ্মাতীরের পক্ষিকূজিত, দিগন্তপ্রান্তর-মেখলা, বকুল, বাবলা, বাঁশবনেঘেরা ইষ্টকৃষ্টি-অধ্যুষিত, বেদবিজ্ঞানদীপ্ত শান্ত, কর্ম্মমুখর, পুণ্যভূমি—সৎসঙ্গ আশ্রমে। তাই আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র যিনি—কি যেন এক

অজানা আকর্ষণে মানুষ বারংবার ছুটে আসে তাঁর কাছে। এমনি ক'রে নিরন্তর মানুষের ভিড় জমে ওঠে তাঁর চরণপ্রান্তে। তিনিও মানুষের কাঙ্গাল, ক্ষুধিত কোলের শিশুকে নিয়ে স্তন্যদানে মা যেমন পরিতৃপ্ত ও প্রসন্ন হ'য়ে ওঠেন, ব্যথাতুর মানুষকে, নিপীড়িত প্রাণসত্তাকে স্নেহবেষ্টনে আলিঙ্গন ক'রে তিনিও তেমনি খুশি ও সুখী হ'য়ে ওঠেন—এ ছাড়া যেন তাঁর বুক খালি-খালি লাগে—এই আমার ঠাকুর। মানুষ তাঁর কাছে যাবে না তো যাবে কোথায়? তাই, রাত্রি প্রভাত হ'তে না হ'তেই তাঁর আঙ্গিনায় আনন্দের মেলা বসে, তাঁকে ঘিরে মধুচক্র রচনা হয়, আসে আর্ত্ত, আসে অর্থার্থী, আসে জিজ্ঞাসু, আসে জ্ঞানী—সুধাসত্রে চলতে থাকে সুধাবিতরণ। আজও তার ব্যত্যয় হয়নি—এসেছেন সবাই।

কথাবার্ত্তা সুরু হ'লো।

ছেলে-মেয়েদের যৌন-বিজ্ঞান-সম্পর্কে কেমন ক'রে শিক্ষা দেওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যৌন-বিজ্ঞান ও প্রজনন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভাল বই লিখতে হয়, আর শেখাতে গেলে খুব সুরুচি-সঙ্গত পন্থায় শেখাতে হয়। অযথা গোপনতা ভাল নয়, সহজ ও পবিত্রভাবে জীবনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব উদঘাটিত ক'রে স্বচ্ছ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হয়। Distortion (বিকৃতি) ও abnormality (অস্বাভাবিকতা)-র প্রতি যা'তে একটা বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়, সে-পথ দিয়ে যা'তে কেউ না মাড়ায়, তেমন মনোভাব পাকা ক'রে দিতে হয়। আবার, স্বাভাবিক যৌন-বোধের উন্মেষ ও অভিব্যক্তিতে তারা যা'তে নিজেদিগকে অপরাধী মনে ক'রে দুর্ব্বল, অবসন্ন ও দিশেহারা হয়ে না পড়ে, বরং ঐ সম্বেগকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ক'রে জীবনকে উদ্বর্দ্ধন-মুখর ক'রে তুলতে পারে, সেইভাবে তাদের শিক্ষিত ক'রে তুলতে হয়। স্বাস্থ্য ও সদাচার-সম্বন্ধে কখন কোন্ অবস্থায় কী করণীয়, সেই সম্বন্ধেও ছেলে-মেয়েদের ওয়াকিবহাল ও অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হয়। আবার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সদাচারের পরিপোষণী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হয়—পরিবার, পরিবেশ, বিদ্যালয়—সর্ব্বত্র।

প্যারীদা (নন্দী) ভাগবতের একটা শ্লোক ব্যাখ্যা করতে নিয়ে আসলেন। তাই নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা নিজেদের মধ্যে হ'লো। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—তিনি আমার সব করবেন, এটা ভক্তির অন্তরায়। ভক্তের মনের ভাব—আমার জন্য প্রভু যেন কষ্ট না পান, বরং আমিই তাঁর কষ্টের লাঘব করব, তাঁর ভার বহন করব, তাঁকে সোয়াস্তি দেব, তাঁর দায়িত্ব মাথা পেতে নেব, তাঁর ইচ্ছা পূরণ করব। এই আগ্রহ-উন্মাদনার ভিতর-দিয়েই তার শক্তি বেড়ে ওঠে, সে অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে ফেলে প্রতি মুহূর্ত্তে গুরুর দয়া অনুভব করে, আর সহস্র মুখে তাঁর গুণগান করে। তা' না ক'রে গুরুর কাছে যারা 'দেহি' 'দেহি' করে, স্বার্থ-প্রত্যাশা

পূরণের জন্য তাঁর কাছে ঘোরে, তাদের শক্তি খর্ব্ব হ'য়ে যায়, তারা শান্তি পায় না, অভাবও মেটে না তাদের। হনুমান রামচন্দ্রের relief-এর (স্বস্তির) জন্য কী না করেছে? এতে কিন্তু তার আত্মপ্রসাদ বই কষ্ট ছিল না, আর এমনি ক'রেই সে বেড়ে উঠেছিল, কিন্তু তার ইতর অহঙ্কার ছিল না। একমাত্র গর্ব্ব ছিল তার রামচন্দ্রকে নিয়ে, তাঁকে নিয়েই বুক ভরেছিল তার, চাওয়া-পাওয়ার বালাই ছিল না। একমাত্র চাওয়া ছিল—তাঁর পরিপূরণ। তাই শান্তি, সন্তোষ ও শক্তি কোনদিন তাকে ত্যাগ করেনি। নয়নাভিরাম রামচন্দ্রের একটুখানি মুখের হাসি, একটুখানি সস্নেহ দৃষ্টি তার মনে যে কী আনন্দের ঢেউ তুলতো, সে সে-ই জানে। ফল কথা, fulfilling urge (পরিপূরণী সম্বেগ) নিয়ে তাঁর জন্য করাটা আমাদের যত keen (তীব্র) হয়, তাঁর ভালবাসাটাও আমরা তত অনুভব করতে পারি। নচেৎ আমাদের জন্য তাঁর লাখ ভালবাসা, লাখ করা আমরা বোধ করতে পারি না, উপভোগও করতে পারি না। আবার, আমরা যদি করিও এবং সে করাটা যদি হয় নিজেদের কেরামতি দেখাবার জন্য—তাঁর ভালবাসায় নয়—তাহ'লেও তাঁকে উপভোগ করা যায় না।

প্রফুল্ল—ব্যাকুলতা জিনিসটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাকুলতা হ'লো urge (সম্বেগ)। সত্যিকার ব্যাকুলতা থাকলে তপস্যা ফুটবেই, করা বাদ দিয়ে শুধু ব্যাকুলতায়, শুধু কান্নায় তাঁকে পাওয়া যায় না। আবার, করার সঙ্গে যদি সম্বেগ বা ব্যাকুলতা না থাকে, তবে নিজেরও মন ভেজে না, অপরেরও মন ভেজান যায় না—নীরস শুষ্ক হ'য়ে যায় সব। ব্যাকুলতা যেন driving force (সঞ্চারণী শক্তি), তাই-ই বৃহৎ সৃষ্টিকে সম্ভব ক'রে তোলে। বৈধী করণের মধ্যে দিয়েও অনেক সময় ধীরে-ধীরে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে।

শরৎদা (হালদার)—কেউ যদি সব কথাতেই বলে—'তিনি করাচ্ছেন', তখন কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব তো ফাঁকিবাজি। বলতে হয়, তিনিই করান, আর যিনিই করান, তুমি এই-এই চাও কিনা, আর কিছু পেতে গেলে তো তদনুপাতিক করতে হয়। আবাব, তিনি করছেন যদি বল, তবে তিনি তো তুমি হ'য়ে আছেন, তুমি-তিনি যা' করবে, তার ফল তো তুমি-তিনির উপরই গড়াবে। তুমি-তিনির যদি কিছু কাম্য থাকে, বিধিমাফিক করার ভিতর-দিয়ে তা' আয়ত্ত করার দায়িত্বও তুমি-তিনিরই। ফলকথা, তিনি নিজেকে যা'-কিছুতে উৎসৃষ্ট করছেন, আমরা যে বেঁচে চলেছি, সে তাঁর শক্তিতেই। আমাদের যা'-কিছু তাঁরই, ইচ্ছা করলে তা' দিয়ে আমরা তন্মুখী চলনায় চ'লে সার্থকও হ'তে পারি, আবার তাঁর দিকে পিছনে ফিরে খোশখেয়াল মতো চ'লে ঐ চলার দোষ তাঁর ইচ্ছার উপরই চাপাতে পারি। কিন্তু বিধি বড় কঠিন বান্দা, সে কাউকে রেহাই দেয় না।

শরৎদা—Predestination (নিয়তি) ও free will (পুরুষকার)—এর কোন্‌টা কতখানি act (ক্রিয়া) করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকেষ্ট-ঠাকুর যে গরুর দড়ির উপমা দিয়েছেন—ওইটেই ঠিক। গরু সেই দড়ির শেষ সীমা পর্য্যন্ত এবং এর মাঝখানে যে-কোন জায়গায় চ'রে ঘাস খেতে পারে। আর, যদি গলার দড়ি একেবারে খুলতে হয়, তা'ও ঐ এলাকার মধ্যে থেকে কারও সাহায্যে খুলতে হবে। মানুষও তেমনি predestination (নিয়তি)-কে অতিক্রম করতে পারে। Predestination (নিয়তি) বলতে আমি বুঝি, যেমন ক'রে যে সীমায়িত হ'য়ে আছে তাই, আর এক কথায় তাকে বলা যায় মায়া। গীতায় আছে—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'—তিনি ছাড়া উপায় নেই। With all our passions and complexes (সমস্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তি নিয়ে) তাঁ'তে interested (অন্তরাসী) হ'তে হবে, তবেই আমরা মায়ার পারে যেতে পারব। কারণ, একমাত্র তিনিই মায়ার পারে দাঁড়িয়ে আছেন, মায়া তাঁরই সৃষ্ট। কিন্তু এই limitation-এর (সীমার) ঊর্দ্ধে উঠতে গেলে limitation-এর (সীমার) মধ্য-দিয়েই যেতে হবে। গরু যেমন একমাত্র গলার দড়ির range-এর (সীমার) মধ্যে দাঁড়িয়েই গলার দড়ি খুলতে পারে, মানুষকেও তেমনি প্রকৃতিদত্ত বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে, সেই অনুযায়ী ইষ্টকে অনুসরণ ক'রে ব্রহ্মবোধে উপনীত হ'তে হয়। Parabolic line-এর (অধিবৃত্তের রেখার) মতো original line infinitely extend (মূলরেখা অনন্তপ্রসারিত) করা চলে। আমাদের শাস্ত্রে আছে, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হ'তে পারে, কিন্তু শূদ্রত্ব বাদ দিয়ে নয়, শূদ্রত্বের উপর দাঁড়িয়ে। আবার শরীর, মন, প্রবৃত্তি, সংস্কার, সামর্থ্য, যা' নিয়ে যেমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তা'ও তার ইচ্ছা ও কর্ম্মেরই সৃষ্টি। তাই, মানুষ যা' হ'য়ে আছে বা হ'য়ে উঠেছে তার উপর দাঁড়িয়ে আরো হওয়ার পথ খোলাই আছে। এই সম্ভাব্যতার ইতি নেই মানুষের। ঈশ্বর যেমন অনন্ত শক্তির আধার, মানুষও তেমনি—অবশ্য যদি তার উৎসের সঙ্গে যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকে। "God created man after his own image." (ভগবান মানুষকে নিজের প্রতিকৃতি-অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন।)

শ্রীশ্রীঠাকুর ভূষণদাকে দিয়ে অটলদার বৌদিকে ডাকিয়ে বললেন—বড় সাইজের পাঁচ সের রসগোল্লা করবি, ভিতরে ক্ষীরের পুর দিবি (সর্ব্ব-অঙ্গের অভিব্যক্তি দিয়ে)—একেবারে গন্ধে-বরণে-গানে মাত ক'রে দেওয়া চাই। বাইরে পাঠাব, মনে থাকে যেন।

শরৎদা—আমাদের সঙ্গে কারও মতভেদ হ'লেই আমরা inferiority complex (হীনম্মন্যতা) ব'লে দোষ দিই, এটা কেন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Inferiority complex (হীনম্মন্যতা) অনেক সময় দুইজনেরই থাকে। Egoistic knot-এর (অহমিকার গেরোর) দরুন অকারণ গণ্ডগোল বাঁধে। 'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্' হ'লে misunderstanding (ভুল বোঝা) হয় না। পরস্পরের প্রতি regard (শ্রদ্ধা) থাকলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের stand-point (দৃষ্টিভঙ্গী)-টা বুঝতে চেষ্টা করে। সেখানে বিরোধের অবকাশ কমই থাকে। আবার, যারা খাঁটি মানুষ, কেউ তাদের ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিলে তারা চ'টে যায় না, বরং নিজেদের adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে চেষ্টা করে, এবং যে ভুল ধরিয়ে দেয়, তার প্রতি আরো বন্ধুভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠে। তবে ভুল ধরানটাও প্রীতির সঙ্গে হওয়া চাই। মানুষের অন্যায়ের প্রতি যখন কঠোর হই, তখন স্মরণ রাখা লাগবে, মানুষটা কিন্তু আমার আপন, তাকে যেন পর ক'রে না দিই। আবার, আমরা অন্যায় করলে মানুষের কাছে কী ব্যবহার প্রত্যাশা করি, সেটাও মনে রাখা লাগবে, তবে মাত্রা ঠিক থাকবে। হীনম্মন্যতা যে কতভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তার লেখাজোখা নেই। আমি হয়তো অনেক অপরাধে অপরাধী। কিন্তু লোকের কাছে জানাতে চাই যে, সে-অপরাধের নামগন্ধও আমার চরিত্রে নেই, তখন সেই অপরাধে কাউকে অপরাধী দেখতে পেলে তাকে হয়তো শাসন করতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠি, ভিতরের উদ্দেশ্য, আমি যে তেমনতর অপরাধের ঊর্দ্ধে, লোকসমক্ষে সেইটে জাহির করা। এর উল্টো রকমটা অনেকের মধ্যে দেখা যায়, সেটাও হীনম্মন্যতারই ক্রিয়া। মানুষ যেমনতর অপরাধে অপরাধী, অন্যের ভিতর তেমনতর অপরাধ দেখলে অনেক সময় সেটাকেই সমর্থন করতে উদগ্র হ'য়ে ওঠে। এর কোনটার মধ্যেই আত্মসত্তায় বা পরসত্তায় প্রীতি নেই—আছে নিজের প্রবৃত্তির প্রতি প্রীতি, প্রবৃত্তিকে সত্তা ক'রে নিয়ে তারই পোষকতার কণ্ডূয়ন। কেউ-কেউ আবার মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে সব সময় জানিয়ে দিতে চায় যে সে মস্তবড় ভক্ত; তার ভক্তির তুলনা নেই—সেইটে দেখাতে গিয়ে সে কারও সঙ্গে সহজভাবে চলতে পারে না, ছুতানাতায় অন্যের খুঁত ধ'রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায়। এমনি ক'রে অযথা খটাখটি বাধায়। তাই ব'লে এ-কথা কেউ মনে ক'রো না যে, ভক্তির পথে চলতে গেলে অসৎ বা অন্যায়কেও সমর্থন করতে হবে, তা' নিরোধ করাই লাগবে—কিন্তু তা' শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত হ'য়ে—আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যও নয়, কাউকে হীন প্রতিপন্ন করা বা জব্দ করবার জন্য নয়—সকলের মঙ্গলের জন্য, ইষ্ট-স্বার্থ-প্রতিষ্ঠার জন্য।

শরৎদা—কৃতঘ্নতাকে সবচেয়ে বড় পাপ বলা হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও ছাড়া তো দুনিয়ায় পাপ ব'লে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই। Sex-complex (কাম-প্রবৃত্তি) যেমন আদি রস, কৃতঘ্নতা তেমনি আদি মাল নরকের, ওর থেকেই যত পাপের সৃষ্টি। পাপ মানে তাই, যা' আমাদের সত্তাকে, পালন থেকে পতিত করে। আর, কৃতঘ্নতার প্রধান কৃতিত্ব হ'লো, নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য

উপকারীর উপকার লোকসমক্ষে অস্বীকার করা, প্রয়োজন হ'লে প্রত্যক্ষভাবে তার অপকার করা। উপকারীর বিপদে-আপদে তার পাশে না দাঁড়িয়ে তাকে ছেড়ে যাওয়া, হয়তো তার বিরোধী বা শত্রু যে, তার সঙ্গে যোগ দিয়ে তার (উপকারীর) সর্ব্বনাশ সাধন করা। সত্তাপালক ও সত্তাপোষক যে, তাকে যদি আমরা এইভাবে বিসর্জ্জন দিই, তবে আমাদের সত্তা রক্ষা পাবে কিভাবে? তাই, এর থেকে বড় পাপ আর কী হ'তে পারে? তারপর আমাদের সমস্ত পাপ ও বিভ্রান্ত চলনের মূলেই আছে উৎসবিমুখতা। শ্রেয়বিধায়ক পিতা-মাতা, গুরুজন ও গুরুর প্রতি যতই আমরা বিমুখ হই, আচরণের ভিতর-দিয়ে ততই তাঁদের অস্বীকার করতে থাকি, তাঁদের নীতি লঙ্ঘন করতে তখন আমাদের বিবেকে বাধে না। এটাও একধরণের অকৃতজ্ঞতা, এবং এর থেকেই বহু দোষ-দুর্ব্বলতা আমাদের চরিত্রে বাসা বাঁধার সুযোগ পায়, তখন আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসংশোধনের বুদ্ধি থাকে না। কিন্তু গুরুজন বা গুরুর প্রতি সত্যিকার কৃতজ্ঞতা-বোধ যদি থাকে তখন আমাদের সব-কিছু দিয়ে তাঁদের নন্দিত করার আগ্রহই প্রবল হ'য়ে ওঠে, তার ফলে ভুলভ্রান্তি আপনিই শুধরে যেতে থাকে। তবে গুরুজন বা উপকারক কেউ যদি ইষ্টপরিপন্থী হয়, সেখানে তার বিরোধী হ'লে অন্যায় হবে না। বিভীষণ যেমন রাবণকে ছেড়েছিল রামচন্দ্রের জন্য। তা' যদি সে না কবত, তাহ'লেই অন্যায় হ'ত। কৃতঘ্নতা বড় কঠিন রোগ। অনেকে heredity (বংশগতি) থেকে পায়, purposely (ইচ্ছা ক'রে) ঐ রকম করে—না ক'রে যেন পারে না। ফলকথা, প্রতিলোম সন্তান হ'লে treacherous (কৃতঘ্ন) হবেই, তারা কিছুতেই ওটা ছাড়তে পারে না। কারও-কারও acquisition (অর্জ্জন) হয়,—environment -এর (পারিপার্শ্বিকের) মধ্যে প'ড়ে, ইচ্ছা করলে তারা তা' শোধরাতে পারে, অবশ্য যদি উপযুক্ত সংসর্গ পায়।

শরৎদা—Heredity (বংশগতি) ও environment (পারিপার্শ্বিক)-এর মধ্যে কোন্‌টি prominent (প্রধান)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ heredity (বংশগতি) থেকে পায় instinct (সহজাত-সংস্কার), environment (পারিপার্শ্বিক) দেয় তাকে nurture (পোষণ)। ছেলে জন্মাতে যেমন বাপ-মা দুই-ই লাগে, মানুষের জীবনে তেমনি heredity (বংশগতি), environment (পারিপার্শ্বিক) দুটো factor (জিনিস)-ই লাগে। পরিবেশের মধ্যে অনেক কিছুই থাকে, কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ তার instinct (সহজাত-সংস্কার) অনুযায়ীই pick-up (গ্রহণ) করে। প্রত্যেকের specific instinct (বিশিষ্ট সংস্কার) পোষণ পায় যা'তে তেমনতর পারিবেশিক বিন্যাস যত হয় ততই ভাল।

বৃত্তির গোলকধাঁধায় প'ড়ে মানুষ যে কেমন অসহায় হ'য়ে পড়ে, সে-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, মানুষ এক-একটা complex-এর (প্রবৃত্তির)

দশায় প'ড়ে obsessed (অভিভূত) হ'য়ে যায়। সেই complex (প্রবৃত্তি)-একটার পর একটা অবস্থা সৃষ্টি ক'রে চলে, একটা complex (প্রবৃত্তি) আর-একটা complex (প্রবৃত্তি)-কে ডেকে নিয়ে আসে। Complex (প্রবৃত্তি)-গুলি being (সত্তা)-কে absorb (শোষণ) ক'রে যেন ego (অহং) হ'য়ে দাঁড়ায়, individuality (ব্যক্তিত্ব) ব'লে কিছু তার থাকে না, being (সত্তা)-ই complex-এর (প্রবৃত্তির) control-এ (বশে) চ'লে যায়। মানুষ তখন স্রোতের মাঝে গা ঢেলে দেয়, সেই দশার ভোগকাল শেষ হবার আগে, হাজার বোঝালেও যেন সে-কথা তার মাথায় ধরে না। কারণ, ঐ অভিভূতিকে আঁকড়ে ধ'রে তা'তেই আবিষ্ট হ'য়ে থাকতে ভালো লাগে তার। পরে আবার সামান্য কথাতেই তার মোহ ছুটে যায়, চৈতন্য খুলে যায়। তবে স্বস্তির বিষয় এই যে, will to live is constant (বাঁচবার ইচ্ছা মানুষের চিরন্তন), তার being (সত্তা)-কে touch (স্পর্শ) ক'রে দিতে পারলে, will to live (বাঁচবার ইচ্ছা) excite ক'রে (উস্কে) দিতে পারলে সে সাড়া দেয়ই। ধর্ম্মদানের মরকোচ এর ভিতরই নিহিত। বাঁচবার ও প্রকৃত উপভোগের কৌশল দেখিয়ে দেওয়াই সত্যিকার ধর্ম্মদান। বিবর্ত্তনের প্রতি একটা উদগ্র আগ্রহ জন্মিয়ে দিতে হয়, সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বমঙ্গল-মূর্ত্তি ইষ্টের চিত্র এমন মনোমোহন ভাবে তার সামনে তুলে ধরতে হয়—যা'তে সমগ্র সত্তার সম্বেগ নিয়ে সে তাঁ'তে আনত হওয়ার জন্য উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। যাজনের মরকোচ তো এইটুকু। কিন্তু আমার জীবনে ইষ্টের জন্য যদি ইষ্ট না হন, আমার কোন-কিছুর জন্য যদি তাঁকে অনুসরণ করি, তবে ঐ নির্ম্মল, নিভাঁজ অমৃত-আবেগটুকু মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারব না। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" এ ধর্ম্ম অনুরাগের ধর্ম্ম। নিখাদ অনুরাগের ছিটেফোঁটাও যার জীবনে জেগেছে, তার আর ভয়-ভাবনার কিছু নেই। 'অনুরাগের বাতি যার নয়ন-কোণে জ্বলেছে, সর্ব্বস্ব তেয়াগিয়া সে গুরুকে সার করেছে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাগুলি বলছেন ভাবে ডগমগ হ'য়ে-ললিত-মধুর ভঙ্গীতে। তাঁর চোখমুখ ও সারা অঙ্গ থেকে শুদ্ধা ভক্তির দিব্য প্রবাহ তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠছে। উপস্থিত সবার অন্তর তখন বিগলিত, দ্রবীভূত, নির্ম্মল ভাবভূমিতে আরূঢ়।

শরৎদা—অন্যের বাঁচা-বাড়াকে অক্ষুণ্ন রেখে বাঁচবার পথে চলাই তো ধর্ম্ম, কিন্তু সব সময় কি তা' সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণকেও তো কত লোককে হত্যা করতে হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এত ধস্তাধস্তি, লোকসংগ্রহ, আন্দোলন কিসের জন্য? বাঁচিয়ে বাঁচাই তো আমাদের উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ সব সময়েই চেষ্টা করছেন যুদ্ধবিগ্রহ avoid (পরিহার) করতে, কিন্তু তাঁর environment (পরিবেশ) তাঁকে সে scope (সুযোগ) দিল না। আর, শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ—মৃত্যুকে মারবার জন্য। Gangrene-affected part of the body (শরীরের দুষ্টক্ষতযুক্ত স্থান) আমরা যেমন কেটে ফেলি জীবন বাঁচাবার জন্য,

তিনিও তেমনি মৃত্যু ও মারণের মূর্ত্ত প্রতীকস্বরূপ যারা ছিল তাদের মেরেছিলেন সমগ্র সমাজকে বাঁচাবার জন্য।

প্রফুল্ল—শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ হ'য়েও সমগ্র পরিবেশ আয়ত্তে আনতে পারলেন না, তিনিও তো এতগুলি লোক মারতে বাধ্য হ'লেন—এ কেমন কথা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে এই plane (স্তর)-এ কাজ করতে গেলে, মানুষের শরীর নিয়ে এসে যেমন-যেমন করতে হয় তাই করতে হবে, সময় ও সীমার মধ্যে আসলে তদনুযায়ীই চলতে হবে। তাঁর ইচ্ছা অমোঘ, তাঁর প্রয়োজন তিনি সিদ্ধ করবেনই, কোনটায় অকৃতকার্য্য হন না। বাইরে থেকে যেটাকে অকৃতকার্য্যতা মনে হয়, সেটাকেও তিনি এমনভাবে কাজে লাগিয়ে দেন যে তাও তাঁর মূল জীবনোদ্দেশ্যকে আরো অগ্রগতির পথে ঠেলে নিয়ে যায়, তিনি আফলোদয়কর্ম্মা, উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁর বিরতি নেই। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ও প্রয়োজন এবং বিধি—এর মধ্যে রয়েছে গভীর একতানতা।

তাঁর পরম মধুর অমৃতকথা শুনে কারও যেন আশ মেটে না, যত শোনা যায় ততই শুনতে ইচ্ছা করে। তাই, যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো কেউ উঠছেনই না, বরং সূর্য্যোদয়ের আগে-পরে আরো অনেকে এসে তাসুর ভিতর-বাইরে ঘিরে বসলেন। আগের মতন প্রশ্নোত্তর চলতে লাগলো।

শরৎদা—ক্ষর, অক্ষর দুইভাবে transcend (অতিক্রম) ক'রে পুরুষোত্তম থাকেন, তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই আদিকারণ স্ব অর্থাৎ নিজের ভিতরে অনুস্যূত বৃত্তির অভিধ্যান ও তপস্যা দ্বারাই যা'-কিছু হয়েছেন, এই হওয়ার পিছনে আছে আবার তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাই বৈধী-করণের পথে প্রবাহিত হ'য়ে হওয়ায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে। তাই, দুনিয়ার যা'-কিছু হয়, ইচ্ছা ও বৈধী-করণের পথেই হয়। পুরুষোত্তমও এই নিয়মের বহির্ভূত নন, সে-হিসাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য নাই। আ'বার, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, "God made man after His own image," কেষ্টঠাকুর গীতায় বলেছেন, "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন, তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ"। তফাৎ এই, তিনি সব জানেন, Universal I-এর (বিশ্বাত্মার) full consciousness (পূর্ণচেতনা) তাঁর মধ্যে আছে, সেই light-এ (আলোকে) তিনি চলেন, উৎসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে চির-যোগযুক্ত তিনি, তাঁর কাছে সবটার meaning (অর্থ) আছে, আমাদের তা' নাই। নচেৎ human barrier (মানবীয় পরিমিতি) সবটুকুই তাঁর আছে, তিনি যে হাগবেন না, মুতবেন না, খাবেন না, মা-বাপ-স্ত্রী-পুত্রকে ভালবাসবেন না, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করবেন না, সুখ-দুঃখ বোধ করবেন না এমন কিছু নয়। তিনি সহজ মানুষ, আর পুরোপুরি মানুষ না

হ'লে মানুষ তাঁকে অনুসরণ করতে পারতো না, করলেও লাভবান হ'তো না। সৃষ্টি-সম্ভূত জীবের ক্ষরত্ব তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, কোন অলৌকিকত্বের ধার ধারেন না তিনি, সাধারণ মানুষের মতো রোগ, শোক, আধি, ব্যাধি, মৃত্যু সবই তাঁর আছে, এ যেমন সত্য, তাঁর ভূতমহেশ্বরত্ব ও অক্ষরত্বও তেমনি সত্য। সেই পরম চেতনা সহজ হ'য়ে বিদ্যমান তাঁর চরিত্রে, তাই-ই তাঁকে প্রতিমুহূর্ত্তে পরিচালিত করে। এ তাঁর মধ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সলীল ও বেমালুম, তাই সব-কিছু নিয়েও তিনি সহজ, স্বভাব-সুন্দর, চির আত্মভোলা, সর্ব্বাকর্ষক, ভালবাসার কাঙ্গাল। তিনিই মানুষের মুক্তির রাজপথ, তাঁকে বাদ দিয়ে এই নরলোকে ঈশ্বরলাভের অন্য কোন পন্থা নেই মানুষের। তাই, অধুনাতম যুগ-পুরুষোত্তমই মানুষের উপাসনার বেদী, তাঁর উপাসনায় পূর্ব্বতন সকলেরই উপাসনা হয়, আর তিনি যদি বর্ত্তমান না থাকেন তবে তদনুবর্ত্তনশীল উপযুক্ত আচার্য্যের কাছে দীক্ষিত হ'য়ে তন্নির্দ্দেশিত নিয়মনে ঐ পুরুষোত্তম-পূজারী হ'য়ে চলাই মানুষের কল্যাণের পথ।

সতীশদা—সবই যদি তাঁর সৃষ্টি, তবে পাপ আসলো কোত্থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ উৎসবিমুখ হ'য়ে উঠলে বৃত্তি তাকে চেপে ধরে। মানুষ বৃত্তি-অভিভূত হ'লে সত্তাপোষণী চলন থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে, ঐ বৃত্তি সত্তারই রস নিঙড়ে তা' দিয়ে আত্মপুষ্টি করতে চায়। আমরাও বৃত্তি-স্বারূপ্য লাভ ক'রে ঐ বৃত্তিকেই সত্তা মনে ক'রে তারই পুষ্টিসাধনে তৎপর হ'য়ে চলি। ফলে যা' হবার তা' হয়। পাপ মানে—এমনতর চলনা। ফল কথা, ঈশ্বর সৃষ্টি করলেও মানুষের ইচ্ছার উপর তাঁর কোন হাত নেই। তিনি নিজে যেমন স্বরাট, স্বাধীন, প্রত্যেককে তেমনি স্বরাট, স্বাধীন ক'রে দিয়েছেন, কাউকে কম ক'রে দেননি কিছু। প্রত্যেককে তাঁর মতো ক'রে ভ'রে উজাড় ক'রেই দিয়েছেন। এখন সে স্বেচ্ছায় তৎপ্রদত্ত সম্পদ যে-কোন দিকেই নিয়োজিত করতে পারে। এ-নিয়ে সে তন্মুখী চলনেও চলতে পারে, আবার তাঁকে অস্বীকার ক'রে, তাঁর দিকে পিছন ফিরিয়ে খেয়াল ও ভোগোন্মত্ততার পিছনেও ছুটে চলতে পারে। দুনিয়ার দিকে চাইলেও এটা আমরা স্পষ্ট বোধ করতে পারি। বাপের থেকে জ'ন্মেও বাপের অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা ছেলের আছে। এ-স্বাধীনতা থাকলেও, এ-স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ না ক'রে যে পিতাকে মান্য ক'রে চলে—সদভিদীপনা নিয়ে, সেই-ই উন্নতি লাভ করে। মানব-জাতির উন্নতি বা শান্তির বেলায়ও ঐ কথা—যত তারা উৎসমুখী হবে ততই তারা কল্যাণের অধিকারী হবে। অনেকে বলে, ঈশ্বর-পরিপন্থী চলনে চলবার স্বাধীনতা ঈশ্বর মানুষকে দিলেন কেন?—তার জন্যই তো যত দুঃখকষ্ট। কিন্তু এ কথার উত্তর হ'ল, জবরদস্তির ভিতর-দিয়ে পীরিত হয় না, আর হ'লেও তা' উপভোগ্য হয় না। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি-চলনের সম্ভাব্যতা থাকা সত্ত্বেও সে যখন তা' উপেক্ষা ক'রে স্বেচ্ছায় ইষ্টমুখী হ'য়ে চলে, ঈশ্বরমুখী

হ'য়ে চলে—অনুরাগনিবদ্ধ হ'য়ে, বৃত্তি-প্রবৃত্তির সুনিয়ন্ত্রণে তৎপর থেকে, সেই অনুরাগ উভয়ের কাছে উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে, লীলারসের আস্বাদন সম্ভব হয় অমনতর স্থলেই। নচেৎ, যন্ত্রচালিতবৎ গত্যন্তর-বিহীন হ'য়ে, বোধহারা আবর্ত্তনে মানুষকে যদি তথাকথিত ভালর পথে চলতে হ'ত, সে ভাল হ'ত না। কারণ, কেন্দ্রানুগ অনুরাগে ভালমন্দের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাঝখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে মানুষের বোধের যে বিকাশ হয়, বিন্যাস-ক্ষমতা যেমন বেড়ে যায়, তা' বাড়তে পারত না। মানুষের বিবর্তনও হ'ত না। উপভোগও থাকতো না। তা'ছাড়া, অমনতর হ'লে চারিত্রিক দৃঢ়তা, ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্বের অভ্যুত্থানও সম্ভব হ'ত না।

ভবানীদা—(সাহা) একটা টেলিগ্রাম নিয়ে আসলেন—একজন অসুস্থ, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ক'রে টেলিগ্রাম করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখনই জবাব দিয়ে দাও। কী অসুখ বিস্তারিত জানাতে বল।

প্রফুল্ল—ভগবান গোড়ায় তো একা ছিলেন, সৃষ্টি করলেন কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর মধ্যে বৃত্তি ছিল। তিনি এবং তাঁর বৃত্তি যেন positive (ঋজী সম্বেগ) ও negative (রিচী সম্বেগ), পুরুষ ও নারী। এই দুইয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও আবেগদীপ্ত সহযোগ ও সম্মেলনের ভিতর-দিয়ে সৃষ্টি গুণিত হ'য়ে চললো তাঁর বুকে। আকর্ষণ, বিকর্ষণ দুই আছে ব'লেই positive (ঋজী সম্বেগ) ও negative (রিচী সম্বেগ) দুই-ই র'য়ে যাচ্ছে, একটা আর একটাকে আকৃষ্ট করলেও তার সত্তা ও স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত ক'রে দিতে পারছে না। তাই সৃষ্টির সম্ভাব্যতা চিরস্রোতা হ'য়েই ব'য়ে চলেছে। Positive (ঋজী সম্বেগ) যেখানে যেমনতরভাবে বিদ্যমান তার counter part (বিপরীত অংশ) হিসাবে র'য়ে গেছে তদনুপাতিক negative (রিচী সম্বেগ)। এই দুইয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে সুষ্ঠু সৃষ্টি লীলায়িত হ'য়ে ওঠে। আমাদের শাস্ত্রেও তাই মনোবৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রীর কথা বলেছে, স্ত্রী যেন স্বামীর বৃত্তি অর্থাৎ ঐ পুরুষের প্রকৃতি-অংশ এবং স্বামী যেন স্ত্রীর স্ব অর্থাৎ অস্তিত্ব। এমনতর সাত্ত্বিক মিলন যেখানে, সেখানেই উদ্বর্দ্ধন ও সুপ্রজনন দুই-ই সার্থক হ'য়ে ওঠে।

১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, বৃহস্পতিবার (ইং ৪। ১২। ১৯৪১)

ভোরে শ্রীশ্রীঠাকুর-সমীপে বাঁধের ধারে তাসুতে আজও বৈঠক বসেছে। শরৎদা (হালদার), হরিপদদা (সাহা), প্যারীদা (নন্দী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), ইন্দুদা (বসু), বিমলদা (মুখোপাধ্যায়), ঈষদাদা (বিশ্বাস), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), কালিদাসীমা, মানদামা, সরোজিনীমা, কালীষষ্ঠীমা প্রমুখ অনেক দাদা ও মা-ই উপস্থিত আছেন।

সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজাকারে থাকে, affair-এর (বিষয়ের) মধ্যে পড়লে সেটা ফুটে বেরোয়। সৃষ্টির উদ্ভেদ যা' হ'তে, তার মরকোচ যার অধিগত হয় সুকেন্দ্রিক তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে,—তার কিছুই অজানা থাকে না। সে একটু অভিনিবেশ-সহকারে যা'-কিছু অনুধাবন করে, তারই মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে পারে। এটা কারও একচেটিয়া অধিকার নয়, প্রত্যেকেরই এটা হ'তে পারে তার বৈশিষ্ট্যমাফিক। তোমরা ভাল ক'রে নাম-টাম করই না। অনুরাগমুখর হ'য়ে নামধ্যান খুব স্ফূর্ত্তিসে চালিয়ে যাও, চলও প্রতিটি কাজে ইষ্টসন্ধিৎসু আগ্রহ নিয়ে, নিজের জীবনকে ইষ্ট-সর্ব্বস্ব ক'রে ফেল, দেখবে তোমাদের মধ্যেই কত জিনিস জেগে উঠবে। অবশ্য, কোন-কিছুর লোভ রেখো না, তখন ঐ লোভই পর্দ্দা ফেলে দেবে, এগুতে দেবে না। ফলকথা, সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ প্রকট যাঁ'তে তাঁকেই ভালবাস মনপ্রাণ দিয়ে, তাঁর সঙ্গ কর, তাঁকে অনুসরণ কর, তাঁর ইচ্ছা পূরণ কর সক্রিয়ভাবে, তাঁর জন্য স্বেচ্ছায় সানন্দে দায়িত্ব গ্রহণ কর এবং তা' কৃতিত্বের সঙ্গে নিষ্পন্ন কর, এই স্রোতের মধ্যে ফেলে দাও নিজেদেরকে, নিজের-নিজের পুঁটলির ভাবনাটা ছাড়, তাঁর যা'-কিছুকে নিজের ক'রে নিয়ে তাঁরই জন্যে খাট, তাঁরই প্রীতি ও প্রতিষ্ঠা-কামনায় প্রত্যেককে সেবা দাও তার বৈশিষ্ট্যমাফিক,—এই হিল্লেয় প'ড়ে তোমরা দেখতে পাবে, তোমাদের অজান্তে তোমরা অনেক কিছু জেনে ফেলেছ—পরিপূর্ণ বোধ-সঙ্গতি নিয়ে। এই চলনের পথেই সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ, ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। ও-সব কোন আজগবী বা এই জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—মানুষ ত্রিকালজ্ঞ হয় কখন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ত্রিকালজ্ঞ মানে, একটা অবস্থা দেখে তার পূর্ব্বে কী ছিল এবং পরে কী পরিণতি হবে, তা' যে বুঝতে পারে সেই। জগতের কোন-কিছুই বিচ্ছিন্ন ও অহেতুক নয়—একটা কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলায় জড়িত হ'য়ে আছে যা'-কিছু, এই কার্য্যকারণ গড়িয়ে-গড়িয়ে চলেছে কালের বুকে আরো-আরো কার্য্যকারণের বীজ সৃষ্টি ক'রে, এর সঙ্গে আবার মিশে আছে পরিস্থিতির চাপ, প্রত্যেকের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি। এইগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, পূর্ব্বাপর পারম্পর্য্য বিবেচনা করলে, বর্ত্তমান বাস্তব যা', তা' দেখে অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করা যায়। অঙ্কের মতো নির্ভুলভাবে ব'লে দেওয়া যায়, astrologer (জ্যোতিষী)-রা যেমন বলে তার থেকে অনেক ভাল ক'রে ব'লে দেওয়া যায়। এ কঠিন কিছু নয়। নিজেকে ভাল ক'রে দেখা ও পড়ার অভ্যাস আছে যার, সে-ই অনেকখানি পারে। তবে প্রবৃত্তি-অভিভূতি যাদের নেই এক-কথায়, যারা মুক্ত পুরুষ, তাদের সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয় ক'রে বলা মুশকিল হ'য়ে পড়ে। যাহোক, ও-সব বলাবলির কথা নয়, তোমরা তোমাদের অতীত

ও বর্ত্তমানকে কার্য্যকারণ-সহ বিশ্লেষণ ক'রে যতই বিশদভাবে অনুধাবন করতে পারবে ততই তোমাদের লাভ। ওতে নিজেদের চলনা নিয়ন্ত্রিত করার পক্ষে সুবিধা হবে, এমন-কি ঐ পশ্চাদপসারিনী চিন্তা ও বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে তোমাদের স্মৃতিবাহী চেতনার উদ্বোধন হ'তে পারে।

শরৎদা—বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, তার অর্থ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীব কখনও কৃষ্ণ হয় না। আপনি কি আপনার বাবা হতে পারেন? ছেলে বাবারই দাস। কারণ, সে বাবারই দান, বাবা থেকেই তার উৎপত্তি। জীবও তেমনি ঈশ্বরের দান, ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট, তাই সে তাঁর দান। আবার, সে যত ঈশ্বরের প্রতি এই আনুগত্য-বোধ নিয়ে চলে, ততই জীবনে অক্ষত অবস্থায় চলতে পাবে, নচেৎ দুনিয়ার নানান টানে প'ড়ে কোথায় সে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে তার কি ঠিক আছে? তাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেলা।
মায়া-পিশাচী তায় গলায় বেড়িলা॥"

ঈশ্বরোপাসনার বেদী আবার ঐ পুরুষোত্তম, তাই জীবকে কৃষ্ণদাস বলা হয়েছে, ঈশ্বরদাস ব'লে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। কারণ, অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনায় মানুষের বৃত্তিপ্রবৃত্তির গায়ে হাত পড়ে না। এটাকে আবার নিত্যসম্বন্ধ বলা হয়েছে এইজন্য যে, জীব যতই উন্নত স্তরে উঠুক না কেন, সে জীবই এবং ঈশ্বর তার প্রভু। এই ভক্তি, অনুরতি ও অনুগতিই তার জীবন। সাধনার সম্পদ বা সঞ্চয় তার যতই থাক না কেন, যে-মুহূর্ত্তে সে অহমিকায় মূলের সঙ্গে সংযোগহারা হবে, সেই মুহূর্ত্তেই সে শুকিয়ে উঠবে। ফলকথা, ঈশ্বর তার সত্তার সত্ত্ব, ঈশ্বর চিরপ্রভু, জীব চিরদাস। আমার এই রকমটাই ভাল লাগে। তা'ছাড়া দেখুন না, আপনি আপনার ছেলের বাবা হ'তে পারেন, কিন্তু আপনার বাবার কাছে আপনি ছেলেই—তা' আপনি যত বড়ই হন না কেন, এ-জন্মের মতো এ-সম্বন্ধ অপরিবর্ত্তনীয়। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবেরও তেমনি চিরকালের মতো অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধ।

শরৎদা—আপনার অনুভূতির বর্ণনার শেষে লিখেছেন, ইষ্টপ্রতীকে তিনি আবির্ভূত হলেন, তা' কেন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা সেই অকহ, অলখ, অগম রাজ্যে যখন প্রায় merge ক'রে (ডুবে) যাই, কেবল হ'য়ে উঠি, তখন কোন বোধই যেন থাকে না, যা' থাকে তা' বলা যায় না। অতোখানি সূক্ষ্ম ও গভীর স্তরে, ভিতরের টান, অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্কোচনী প্রভাব এতই প্রবল ও অনিবার্য্য হয় যে, আমাদের সত্তা যেন সেখানে গায়েব হ'য়ে যেতে চায়। ঐ মুহূর্ত্তেও অনুস্যূত চেতনাকে জীইয়ে রেখে, আবার স্থূলে প্রত্যাবর্ত্তন করতে গেলে, ঐ ইষ্টসূত্রকে অবলম্বন ক'রে ছাড়া তা' হবার উপায় নেই, সেখানে

আমাদের চেতনা হ'তে আর সবই বিলীন হ'য়ে যায়। তাই, ইষ্টমূর্ত্তিই তো ভেসে উঠবে, ইষ্টকে নিয়েই তো আমি-বোধ। এ কাঠামো থাকতে, আমার এই রূপ থাকতে তাঁর রূপ ছেড়ে যাবার জো নাই। তিনি যদি পরে অন্য রূপ নিয়ে আসেন এবং আমিও অন্য দেহ নিয়ে আসি তখন অবশ্য সেইরূপই বড় হবে। গুরুই ভগবানের সাকার মূর্ত্তি। তাই যীশু বলেছেন— "I am the way, the truth, the life, none can come to the Father but by me." গীতায় আছে, 'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। আরো আছে— "মন্মনা ভব, মদ্ভক্তঃ, মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু, মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে"। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—"কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নবলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"

নরবপু তাঁরই বপু। আবার শাস্ত্রে বলেছে, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি',—তাই তাঁকে বাদ দিয়ে দাঁড়াই কোথায়?

প্রফুল্ল—গুরুই ভগবানের সাকার মূর্ত্তি, এ-কথা সদ্‌গুরু সম্বন্ধে না হয় খাটে, কিন্তু সব গুরু-সম্পর্কে কি এ-কথা বলা চলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরু মানেই সদ্‌গুরু, আচার্য্য। গুরু-পুরুষোত্তমই সচ্চিদানন্দের মূর্ত্ত বিগ্রহ, তিনিই রূপায়িত ঈশ্বর-প্রেরণা, তিনিই আত্মিক শক্তির প্রোজ্জ্বল প্রকাশ, অস্তিবৃদ্ধির পরম অমৃতপথ। দুনিয়ার যত দ্বন্দ্বের মাঝে অন্বয়ী সার্থকতার সারকেন্দ্র তিনিই। তাঁকে ভালবেসে, তাঁর ইচ্ছা পরিপূরণ ক'রে তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে, তাঁরই সঙ্গ, সাহচর্য্য ও সেবার ভিতর-দিয়ে মানুষ ঈশীস্পর্শ লাভে ধন্য হয়। আর, গুরু-পুরুষোত্তমকে direct (সরাসরি) যারা না পায়, তারা তদনুবর্ত্তী আচার্য্য-পরম্পরার ভিতর-দিয়ে তাঁর ভাবটাই কিছু-না-কিছু পায়। ঐ ভাব যখন মলিন ও ম্লান হ'য়ে যায়, উবে যাবার মতো হয়, বিকৃতিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে, মানুষকে ঈশীস্পর্শে সঞ্জীবিত ক'রে তোলবার জন্য তখন তিনি আবার মানুষ হ'য়ে আসেন, মানুষের মধ্যে তাদেরই একজন হ'য়ে বিচরণ করেন, আর নিজের আচরণ দিয়ে প্রতি-পদক্ষেপেই দেখিয়ে দেন, কেমন ক'রে মানুষ ঈশ্বরেরই হ'য়ে চলতে পারে সব-কিছুর মধ্যে। তাই গুরু তিনিই, আর তাঁর অভাবে তদ্ভাবভাবিত, তৎচলননিরত যাঁরা, তাঁরা। যেখানে কারও কিছু হয়েছে, কেউ কিছু পেয়েছে—তা' অমনতর গুরুকে ধ'রেই। অবশ্য, নামকো-ওয়াস্তে ধরলে হবে না, তাঁকে অনুরাগভরে অনুসরণ করা চাই। আবার, এ-কথাও স্মরণ রাখতে হবে—সদ্‌গুরু শুধু means (উপায়) নন, তিনি নিজেই goal (উদ্দেশ্য)।

নরেনদাকে (চক্রবর্ত্তী) শ্রীশ্রীঠাকুর একখানি ছবি আঁকতে দিয়েছেন। সেটা শেষ করতে দেরী হ'চ্ছে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজ যদি তাড়াতাড়ি সুন্দরভাবে

না করতে পারিস, তবে কিন্তু ঢিলেমিই পেয়ে বসবে। করবি, কিন্তু তা'তে তুই লাভবান হ'তে পারবি না।

প্রশ্ন করা হ'লো—আপনি পারিবারিক চাহিদাকে উপেক্ষা ক'রে ইষ্টের কাজে লাগতে বলেছেন, আবার বলেছেন, যারা সাংসারিক জীবনে অকৃতকার্য্য তাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু তমসাচ্ছন্ন—এর সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের জন্য আপ্রাণ হ'য়ে উঠলে তখন সংসারও ইষ্টার্থে হ'য়ে ওঠে। কিছুদিন অভাব-অভিযোগ, struggling period (টানাটানি অবস্থা) চললেও ইষ্টের কাজ ঠিক-ঠিক উপচয়ীভাবে করতে লাগলে—তাঁতেই ঠিক-ঠিক interested (অন্তরাসী) হ'য়ে উঠলে বেশীদিন তা' থাকে না। তখন আমাদের চরিত্রবল, যোগ্যতা, মানুষ-সম্পদ সব-কিছুই বেড়ে যায়, দুঃখ থাকে না। যতক্ষণ আমরা নিজেদের নিয়ে বিব্রত থাকি, ততক্ষণ কেউ আমাদের আপন হয় না, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমরা ইষ্টকে নিয়ে মেতে উঠি, তাঁরই স্বার্থ-প্রতিষ্ঠাকল্পে পারিপার্শ্বিকের সেবায় উন্মুখ হ'য়ে উঠি, তখনই সবাই আপন হ'য়ে ধরা দেয়, তারাই আমাদের দুঃখ দূরীকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়ে দাঁড়ায়। আবার, যে ঠিক-ঠিক ইষ্টপ্রাণ, সে পরিবারের সকলকেও ঐ-ভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলে তা'তে পরিবারের মধ্যেও একটা integration ও consolidation (সংহতি ও সংঘবদ্ধতা) আসতে থাকে, প্রত্যেকে ইষ্টের জন্য ও পরস্পরের জন্য করে। ঐ loving urge (প্রীতিপ্রাণ আকূতি)-ই প্রত্যেকের কর্ম্মশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে, আবার concentric (সুকেন্দ্রিক) হবার দরুন কাজগুলিও হয় well-adjusted ও profitable (সুনিয়ন্ত্রিত ও লাভজনক)। ধর, ইষ্টভৃতির ভিতর-দিয়ে সংসারের প্রত্যেকের মধ্যে কেমন একটা excess urge (বাড়তি আকূতি) এসে হাজিব হয়, সেই দীপনবেগে চলন ও করণ সংসারকে সচ্ছলতায় উচ্ছল ক'রে তোলে। তখন ইষ্টের চাহিদা পূরণের জন্য তারা সর্ব্বদা প্রস্তুত হ'য়ে থাকে, তিনি কোন্ সময় কী চান, তার জন্য আগে থাকতেই কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রে রাখে। ইষ্টেরটা যদি ঠিক থাকে, সংসার তো তার তলায়, সেটাও ঠিক থাকে। যেমন, একজনের নিজের সংসারের জন্য লাগে মাত্র ৩০ টাকা, কিন্তু ইষ্টের জন্য আর ১০ টাকা সংগ্রহ যদি করতে হয়, তবে ৪০ টাকার urge (আকূতি) নিয়ে চ'লে তাকে তা' সংগ্রহ করতেই হবে। কারণ, ইষ্টকে না দিয়ে, না খাইয়ে তার তৃপ্তিই নেই। আর, ইষ্টের স্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য, ইষ্টকে এই দেওয়া বজায় রাখার জন্য নিজেদের বাঁচা বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাই সমগ্র অর্জ্জনটাই যেন ইষ্টের জন্য। ৪০ টাকার মধ্যে তো ৩০ টাকা আছেই, তাই অভাব থাকে না। ইষ্টকে দেওয়ার, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার urge-এর (আকূতির) দৌলতেই কিন্তু তুমি সচ্ছলতায় উচ্ছল হ'য়ে উঠলে। ইষ্টকেও দিলে, পারিবারিক সংস্থানও করলে, drudgery (দিগ্‌দারি) বা বিভ্রান্তি আর থাকলো না।

গোড়ায় ইষ্ট থাকার দরুন সব কাজ মিষ্টি মোহন সুঠাম হ'য়ে উঠলো। আবার, এই পথে লাখ ঐশ্বর্য্যের অধিকারীও যদি হও, তাও তুমি তা'তে আবদ্ধ হ'য়ে পড়বে না, তুমি সবটার মধ্যে থেকেও উপরে থাকবে। কারণ, তুমি জান, তোমার সব-কিছুই তাঁরই সেবার জন্য, তাই ঐশ্বর্য্য তোমাকে অভিভূত বা বিমূঢ় করতে পারবে না। আবার, খানিকটা কৃচ্ছ্রতার মধ্য-দিয়েও যদি তোমাকে চলতে হয়, তা'তেও তুমি ক্লিষ্ট, সন্তপ্ত বা দিশেহারা হ'য়ে পড়বে না। কারণ, তাঁকে নিয়ে তুমি এতই ভরপুর হ'য়ে থাকবে যে, অভাব-বোধ তোমাকে পীড়া দিতে পারবে না। তবে কোন প্রত্যাশার কাঙাল হ'য়ে তাঁর ভরণ-পূরণ করতে যেও না। তা'তে রস পাবে না, অন্তরের ঐ দৈন্যই তোমাকে তন্ময় হ'তে দেবে না, তাই বুকও ভরবে না, তৃপ্তির সন্ধানও পাবে না।

বীরেনদা—মানুষ যে তথাকথিত সৎকাজের বন্ধনে আটকে যায় তার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ক্ষুদ্র ভালর মধ্যে আটকে থাকে, সেটা যদি কারও প্রীত্যর্থে না হয়। রসগোল্লা খুব ভাল জিনিস, কিন্তু রসগোল্লার লোভ যদি আমাকে পেয়ে বসে, তাহ'লে রসগোল্লা আমাকে আটকে রাখল। আত্মতৃপ্তি ও আত্মপ্রীতি যেখানে মুখ্য, সেখানেই আমরা আবদ্ধ হ'য়ে পড়ি, তার গণ্ডী কেটে বেরুতে পারি না, আমাদের অগ্রগতিও রুদ্ধ হ'তে থাকে। আমা-অতিরিক্ত কোন জীয়ন্ত মানুষ আমার উপাস্য না হ'য়ে যদি আমার কোন কামনা বা ধারণা আমার উপাস্য, অনুসরণীয় হয়, তবে আমি তা'তেই তো আরো-ক'রে নিমজ্জিত হব। কারও তৃপ্তির জন্য না হ'লে, মানুষ নিজের ego (অহং) ও whim (খেয়াল)-কে satisfy (তুষ্ট) করবার জন্য তার ধারণামাফিক ভাল নিয়ে rigid (অনমনীয়) হ'য়ে ব'সে থাকে। শ্রেষ্ঠের প্রীতির জন্য হ'লে সে চায় আরো, আরো, আরো—কোন একটা জায়গায় সমাপ্তিরেখা টানতে চায় না। কারণ, ঐ তাঁর পরিপূরণের জন্য আরোতরের পথ তার খোলা রাখতেই হয়, মানুষ এইভাবে eternal becoming (অনন্ত বিবর্দ্ধন)-এর পথে চলে। ইষ্টস্বার্থ, ইষ্টপ্রতিষ্ঠা হ'ল ভব-সমুদ্রের compass (দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্র), ওর ভিতর-দিয়েই আসে ব্রহ্মজ্ঞান বা বৃদ্ধির জ্ঞান, আত্মজ্ঞান অর্থাৎ চলৎ-জ্ঞান। ইষ্টার্থ-আপূরণী ধান্ধা যদি না থাকে তৎপূরণী বাস্তব কর্ম্মের দায়িত্ব যদি মানুষ গ্রহণ না করে, তবে চোখ বুঁজে সাধনা সে যতই করুক না কেন, তার কিন্তু ঐ জ্ঞান ফোটে না। করার ভিতর-দিয়ে, চলার ভিতর-দিয়ে আসে অভিজ্ঞতা, আসে ভূয়োদর্শন, তা' যার যত একসূত্রসঙ্গত তার জ্ঞান তত পাকা।

একটি মা দরজার পাশ জুড়ে বসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—সব সময় লক্ষ্য রাখবি অন্যের সুবিধা কিসে হয়। সব ব্যাপারে এইটে যদি লক্ষ্য রাখিস তাহ'লে সুখী হ'তে পারবি।

ধূর্জ্জটিদা—ভগবান সর্ব্বশক্তিমান হ'য়েও এত ছোট জিনিস থেকে সৃষ্টি সুরু করেছেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৃষ্টি হ'লো তাঁর লীলা—আলিঙ্গন ও গ্রহণ, 'ছিল না'র বক্ষ বিদারণ ক'রে সত্তার ফুটে ওঠার মধ্যেই তো আনন্দ, এর মধ্যেই তো শক্তি। উপাদান যত সূক্ষ্মই হো'ক না কেন, এই ধর্ম্ম যেখানে আছে, বুঝতে হবে, সেখানেই শক্তি নিহিত আছে। আমরা যে এক-একজন এত বড় হয়েছি, আমরা গোড়ায় তো একটা zygote (জীবন-কোষ) ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু ওর মধ্যে এতখানি সম্ভাব্যতা লুকিয়ে ছিল, তাই আমরা এত বড় হ'তে পেরেছি। সব ব্যাপারেই এই রকম। আর, সব-কিছুর মূল যা', তা' যদি আমরা বুঝতে পারি, তখন আমাদের কিছুই বুঝতে বাকী থাকে না; সেই সর্ব্বকারণকারণ মানুষী তনু ধ'রে আসেন, সেই কারণ-সত্তার বাচক যে বীজনাম, তাও তিনি আমাদের কাছে ঘোষণা করেন। এই নামের অনুশীলন যদি আমরা করি—নামীতে অনুরক্ত হ'য়ে, আমাদের চলা, বলা, করা যদি নাম ও নামী-অনুগ হয়, তখনই আমাদের কাছে সব খুলে যেতে থাকে।

১৩০ টাকার স্বাক্ষরকারী উপযুক্ত সংখ্যক সংগ্রহ করার পথে কী-কী অসুবিধা হ'চ্ছে সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর তা'তে বললেন—যা' আমাদের করণীয় তা' করতেই হবে, কোনরকম negative consideration (নেতিবাচক বিবেচনা)-কে আমল দিলে চলবে না, সমস্ত বিরুদ্ধতাকে ছাপিয়ে উঠবে আমাদের উদ্‌গ্রীবতা, আমাদের উৎসাহ, তাই-ই 'না'কে 'হাঁ'তে পর্য্যবসিত করবে। উদ্‌গ্রীবতা, উৎসাহই হ'লো আদত জিনিস,—ও যার আছে, সে কিসের ভিতর-দিয়ে কী ক'রে ফেলবে তার ঠিক নাই। মানুষ যখনই বলে অভাব-অভিযোগের কথা, তখনই বুঝবে—তার unwillingness (অনিচ্ছা) আছে। Sentiment (ভাবানুকম্পিতা) হ'লো মানুষের আসল, sentiment-কে (ভাবানুকম্পিতাকে) এমন ক'রে চেতিয়ে দিতে হবে যে, সেটা যেন তাকে ভূতের মতো পেয়ে বসে, সব কাজের মধ্যে তাকে pursue (অনুসরণ) করে এবং all rationality (সমস্ত যুক্তি) যেন সেই sentiment-কে (ভাবানুকম্পিতাকে) support (সমর্থন) করে। আমাদের নিজেদের মধ্যে যতখানি উদ্‌গ্রীবতা থাকে ততটা অন্যের ভিতর সৃষ্টি ক'রে দিতে পারি। আমি যে পাই, পাওয়ার mechanism (মরকোচ)-টা আমি জানি। আমার সব সময় উদ্দেশ্য থাকে—প্রত্যেকে যা'তে আরো পারে, আরো পায়, আমাকে দেওয়াটা যা'তে তার পাওয়ার পথ খুলে দেয়, ঐ দেওয়াটাই যা'তে তার উদ্বর্দ্ধনের কারণ হয়। দুনিয়ায় urge (আকূতি)-ই তো যা'-কিছু সৃষ্টি করে, সেই urge (আকূতি) গজিয়ে মানুষকে বাঁচা-বাড়ায় উন্নীত ক'রে তোলাই ধর্ম্মদান। পাওয়ার urge-এর (আকূতির) থেকে দেওয়ার urge (আকূতি) যত ফুটিয়ে দেওয়া যায় এবং তাও আবার যত শ্রেয়কেন্দ্রিক হয়, ততই মানুষের মঙ্গল হয়। মানুষ যে

exercise (ব্যায়াম) করে, সে তো শক্তিক্ষয়। কিন্তু শক্তিবৃদ্ধির জন্য সেই শক্তিক্ষয় প্রয়োজন, দেওয়াটাও তাই পাওয়ার জন্য দরকার হয়। ফলকথা, তুমি যদি তেমনতর হও, তোমার ঐ উদ্দীপ্ত ভাব, চেহারা, চাল-চলন, কথাবার্ত্তা অন্যের মধ্যেও সেই উদ্দীপনা সঞ্চারিত ক'রে তুলবে, তারাও convinced (প্রত্যয়-প্রবুদ্ধ) হ'য়ে উঠবে, একটা positive (ইতিবাচক) ভাব এসে যাবে তাদের মনে, সমস্ত negative (নেতিবাচক) ভাব ও pessimism (দুঃখবাদ) উবে যাবে তাদের অন্তর থেকে।

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, শুক্রবার (ইং ৫। ১২। ১৯৪১)

আজও বাঁধের ধারে তাসুতে প্রাতঃকালীন বৈঠকে অনেক কথাবার্ত্তা হ'লো।

প্রফুল্ল—ইষ্টভৃতি কিছুদিন করলেই তো সহজ হ'য়ে যায়, খুব effort (প্রচেষ্টা) কিছু করতে হয় না, তা'তে কি আমাদের উন্নতি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Normal (সহজ) হ'লেও একটা superfluity of energy (উদ্বৃত্ত শক্তি) থেকেই যায়, এবং সব কাজেই তার সাহায্য পাওয়া যায়। ইষ্টভরণ-ধান্ধা যার মন-মাথা জুড়ে থাকে, তার প্রবৃত্তিগুলিও ধীরে-ধীরে সুবিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে, তার সব-কিছুর মধ্য-দিয়ে একটা একসূত্রনিবদ্ধ সমাহার হ'তে থাকে, তাই বোধও তেমনি ক'রে ফুটে ওঠে। তা' ছাড়া, সে শুধু ভাব বিলাসী হয় না, তার ভাবা, করার মধ্যে একটা সঙ্গতি থাকে। এইভাবে জীবনে কৃতকার্য্যতার পথ তার খুলে যায়। নিত্য ইষ্টভোগের নৈবেদ্য নিবেদন ক'রে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। প্রসাদের মধ্যে প্রসারও আছে। দিয়ে পুষ্ট করার মধ্যেই পেয়ে পুষ্ট ও উন্নত হওয়ার পথ আছে। আবার, ইষ্টভৃতি ক্রম-বর্দ্ধমান ক'রে রাখতে হয়, অমনতর প্রচেষ্টা নিয়ে চললে, অমনতর তপস্যারত থাকলে তার উন্নতি অনিবার্য্য। ভোজ্যটা বা পয়সাটা ইষ্টভৃতির মূল কথা নয়, ওর মূল কথা হ'লো ইষ্টকে দেওয়ার আবেগ, তাঁকে না দিয়ে, না খাইয়ে আমার ভাল লাগে না, তাই সর্ব্বাগ্রে আমার তাঁর সেবার আয়োজন। ঐ আবেগ যখন মানুষের অন্তরে নেশার মতো পেয়ে বসে, সে তখন তার সব করার ভিতর-দিয়ে তাঁকেই অর্ঘ্য-নন্দিত করতে চায়, জীবনে যেন তার একটা অফুরন্ত উৎসাহ জেগে যায়।

* * * *

অক্ষমতার সঙ্গে হীনম্মন্যতা কেমনভাবে জড়িত সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ চায় appreciation (গুণগ্রহণ-মুখর স্তুতি), চায় পারিপার্শ্বিক তাকে তারিফ করুক, কিন্তু দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা, আলসেমি থাকলে মানুষ

তো ছাড়ে না! তখন ঐ অক্ষম যারা, তাদের অনেকেই নিজেদের সংশোধন না ক'রে বরং জোর ক'রে নিজেদের নিজেরা establish (প্রতিষ্ঠা) করতে চেষ্টা করে, অনেক সময় অন্যকে খাটো ক'রে নিজেদের বড় করতে চায়। এমনতর দেখলে বুঝতে হবে—ঐ অক্ষমতার হাত থেকে তাদের আর রেহাই নেই। কিন্তু যারা নিজেদের অক্ষমতাকে অতিক্রম করতে ইচ্ছুক, কেউ তাদের দোষ ধরলে তারা তা' বিনীতভাবে স্বীকার করে, তাদের হীনম্মন্যতা অতো উগ্র হয় না, এদের উন্নতি তাই আশা করা যায়। প্রকৃত সক্ষম যারা, বিশেষতঃ শ্রেয়ানুপূরণী আবেগে দক্ষ ও যোগ্য হ'য়ে ওঠে যারা, তাদের হীনম্মন্যতার বালাই থাকে না, তারা মানুষের প্রশংসার কাঙ্গাল হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় না, তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে প্রিয়পরমকে খুশি করা, তাঁর খুশিতেই খুশি তারা। আবার, তিনি যদি তোয়াজ বা তারিফ না করেন, বাহ্‌বা না দেন তা'তেও তাদের দুঃখ নেই। তিনি সুখী হ'লেই হ'লো—এই তাদের মনোভাব। নিজেদের জন্য কিছুই চায় না তারা। কিন্তু নিজেদের চলন-চরিত্র-কর্ম্মের ভিতর যদি ঐ তাঁর সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তির ব্যাঘাতী কিছু ধরতে পারে তারা, তখনই অনুতাপে তাদের বুক জ্বলে যায়, নিজেদের পরিশুদ্ধ না করা পর্য্যন্ত তারা শান্তি পায় না। তাই এমনতর যারা, দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা বা হীনম্মন্যতা তাদের মধ্যে বাসা বাঁধতে পারে না। তারা স্বতঃই তাদের সমান-সমান বা তাদের চাইতে যোগ্যতর যারা, তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা যাদের, তাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়। তাদের চেষ্টা থাকে কেমন-ক'রে সেবা-পরিচর্য্যায় যোগ্যতর ক'রে তুলবে তা'দিগকে। যারা হীনম্মন্যতা থেকে যোগ্যতা আহরণ করে, তারা কিন্তু প্রায়শঃই এমনটা পারে না। তারা নিজেদের বাহাদুরি প্রমাণ করবার জন্য অন্যের মনে আঘাত দিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপন'কে অনেক সময় থেঁতলে দেয়। আশা, ভরসা, স্ফূর্ত্তি ও প্রেরণা জুগিয়ে দরদী বন্ধুর মতো হাত ধ'রে উপরে টেনে তুলতে পারে না। তাই আমার মনে হয়, যে-যোগ্যতা অন্যকে যোগ্য ক'রে তুলতে পারে না, তাও অযোগ্যতারই সামিল। অবশ্য, মানুষের শ্রদ্ধা, ইচ্ছা ও চেষ্টা না থাকলে বাইরে থেকে কেউ কিছু ক'রে দিতে পাবে না।

পর-পর প্রশ্ন চলতে লাগলো। ক্রমে ভিড় বাড়তে লাগলো। সবাই শীতে জড়-সড় হ'য়ে বসেছেন। তারপর আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে এমন একটা জমাট আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে, যিনি একবার এসে বসেছেন তাঁর আর ওঠার সাধ্য নাই। কথার মধ্য-দিয়ে তিনি যেন নিজের প্রাণ সবার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন—হাবে, ভাবে, ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরে, চাউনির ভিতর-দিয়ে। তাঁর নিতি নব নটলীলা—প্রতিটি মুহূর্ত্তে অনবদ্য, অনুপম, অপূর্ব্ব। তাই, কখনও তাঁকে পুরান মনে হয় না, পুরাতন হ'য়েও চির-নূতন তিনি, চির অনাবিষ্কৃত তিনি, বিস্ময়ের নূতন

শিহরণ নিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তেই থমকে দাঁড়াতে হয় তাঁর সম্মুখে। তাঁর সান্নিধ্যে যে-সুখ, সে যেন পাহাড়ে ওঠার সুখের মতো, তাতে ক্লেশ আছে, তপস্যা আছে, বোধির রাজ্যে ধাপে-ধাপে এগিয়ে যাবার আনন্দ আছে। আরো আছে বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের জন্য দায়িত্ব-গ্রহণের আনন্দ। দুঃস্থ, আতুর, অনাথ, প্রয়োজনপীড়িত ক্রমাগত তাঁর কাছে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়। তিনি পরস্পরকে দিয়ে পরস্পরের সেবা করিয়ে নেন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহায় হয়। যার যতটুকু যোগ্যতা আছে, তাই নিয়ে পারিপার্শ্বিকের সহযোগিতায় সে অনেকখানি করতে পারে। এইভাবে দুর্ব্বল শক্তিমান হয়, স্বার্থান্ধ ব্যক্তি প্রেমিক ও সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে, অনিয়ন্ত্রিত, অপচয়প্রবণ ব্যক্তিও সুনিয়ন্ত্রিত, উপচয়ী হ'য়ে ওঠে, সমাজ-শক্তি এন্তার উন্নতির পথে এগিয়ে চলে।

শরৎদা প্রশ্ন করলেন—সব অবতারই কি সমান? শক্তির তারতম্য তো থাকেই—সবার মধ্যে সব aspect (দিক) তো দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলেই পূর্ণ, সবাই বরিষ্ঠ, বড় কথার মধ্যে রয়েছে পরিপূরণ। যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন আবির্ভাব—যুগপ্রয়োজন পরিপূরণের জন্য। যুগে-যুগে সেই একজনই আসেন, পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তীর মধ্যে—তাই রয়েছে অচ্ছেদ্য সঙ্গতি। বিবর্ত্তনের ধারা এইভাবে এগিয়ে চলেছে। তাই, একজনকে খাটো ক'রে আর-একজনকে বড় করার প্রচেষ্টা ভাল নয়। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে রামচন্দ্রকে দেখি না, বুদ্ধদেবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে দেখি না—এই যে দোষ। বর্ত্তমানের মধ্যে পূর্ব্বতনকে খুঁজে দেখার বুদ্ধি যদি আমাদের থাকে, তাহ'লে তাঁর মধ্যে পূর্ব্বতন প্রত্যেককে আমরা পেতে পারি এবং তাঁকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র মানব-সমাজ ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে—প্রত্যেকে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে অক্ষুণ্ণ থেকে। 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ'। আপনার মধ্যে আপনার বাবা আছেন, ঠাকুরদা আছেন, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষ সবাই আছেন—তাঁদেরই বিবর্ত্তিত রূপ আপনি। পরবর্ত্তীও তেমনি পূর্ব্ববর্ত্তীর বিবর্ত্তিত রূপ। আজকের দিনে তাই পূর্ব্ববর্ত্তী কোন অবতার-মহাপুরুষকে যদি বুঝতে চাই, তবে বর্ত্তমান পূরয়মাণ অবতার-মহাপুরুষ যদি কেউ থাকেন, তাঁর মধ্যে-দিয়েই বুঝতে পারব। নচেৎ তাঁর মর্ম্মকেন্দ্রের সন্ধান পাব না। আবার প্রেরিত, তথাগত, অবতার-মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তম যাঁরা, তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে সব aspect-ই (দিকই) থাকে; affair (বিষয়) দরকার, তখন টের পাওয়া যায়, নচেৎ প্রয়োজনোপযোগী কতকগুলি aspect (দিক) prominent (প্রধান) ও active (সক্রিয়) দেখা যায়, অন্য সব aspect (দিক)-এর spark (ঝলক) মাঝে-মাঝে দেখা যায়। অবতার-মহাপুরুষ ছাড়া আর একদল আছেন পাবক-পুরুষ—বিশেষ-বিশেষ গ্লানি নিরাকরণের জন্য তাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে সব দিককার অমনতর সুসঙ্গত সমাবেশ দেখা যায় না। তবে পূর্ব্বতনের প্রতি আনুগত্য তাঁদের মধ্যে পরিস্ফুট থাকেই কি থাকে।

একজন তামাক সাজতে গিয়ে পর-পর দেশালাইয়ের চারিটি কাঠি খরচ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তা' নজর এড়ায়নি, বললেন—এ দেখে বোঝা যায়, তুমি মিতব্যয়ী কতখানি। ছোট-ছোট ব্যাপারগুলি ঠিক ক'রে ফেল, তাহ'লে বড় ব্যাপার আটকাবে না।

শরৎদা এইবার প্রশ্ন করলেন—মীরাবাঈ-এর জীবনে দেখতে পাই, তার এক ইষ্ট, স্বামীর অন্য ইষ্ট। স্বামীর প্রতি টান নেই, কিন্তু স্বামীর প্রতি টান নিয়ে স্বামীর through-তে (ভিতর-দিয়ে) ইষ্টানুসরণ করাই তো বিধি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Through (ভিতর-দিয়ে) নাই, in co-ordination with husband (স্বামীর সহযোগে) এই পর্য্যন্ত। ইষ্টানুসরণের অধিকার সবারই আছে, স্বামী ইষ্টানুসরণ না করলেও মেয়েরা করবে এবং স্বামীকে সেই পথে আনবে। মীরাবাঈ তো প্রকৃতপক্ষে গিরিধারীলালের সঙ্গে wedded (পরিণয়নিবদ্ধ) হ'য়ে গিয়েছিল। তাকে ওখানে বিয়ে দেওয়াটাই ঠিক হয়নি। আবার, রাণা যদি গিরিধারীলালের ভক্ত হ'তো তাহ'লে সোনায় সোহাগা হ'তো, সে তার ভক্তিপথের সহায় হ'তো এবং সেইজন্য মীরা তার প্রতি স্বতঃই অনুরক্ত হ'য়ে উঠতো, ইষ্টানুরাগের সঙ্গে সঙ্গতি নিয়ে স্বামী-অনুরাগ গজিয়ে উঠতো তার ভিতর, এতে তার ভক্তি-জীবন সমৃদ্ধতর হ'তো বই ক্ষুণ্ণ হ'তো ব'লে আমার মনে হয় না। ইষ্টার্থ-আপূরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুনিয়ার যত-কিছুর সঙ্গেই আমরা সম্বন্ধান্বিত হই না কেন, তা'তে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। নানা ব্যক্তি, বিষয় ও ব্যাপারকে ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণে যতই আমরা সুবিন্যস্ত ক'রে তুলতে পারি, ততই আমাদের ব্যক্তিত্ব বিস্তার লাভ করে এবং ইষ্টানুরাগও গভীরতর হ'য়ে ওঠে, এবং ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যে সপরিবেশ বাঁচা-বাড়া—তাও সার্থক হয় ঐ পথেই। নচেৎ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কহারা জীবন কিন্তু ধর্ম্ম নয়। তাই ব'লে ইষ্টনিষ্ঠা ব্যাহত হয় যা'তে তেমনতর সংসর্গে ঢ'লে পড়াও কিন্তু ঠিক নয়। সেই আশঙ্কায়ই মীরা হয়তো রাণার সংসর্গ সযত্নে পরিহার ক'রে চলেছে।

কিন্তু রাণার স্বীয় ইষ্টের প্রতি তীব্র অনুরাগ যদি থাকত তাহ'লেও হ'তো, পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো, তার মধ্য-দিয়ে মিল হ'তো। তাই বিয়ে-থাওয়া ব্যাপারে বর্ণ-বংশ ইত্যাদি যেমন দেখা দরকার, সঙ্গে-সঙ্গে ছেলে ও মেয়ের প্রকৃতি-সঙ্গতিও দেখা দরকার।

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, শনিবার (ইং ৬। ১২। ১৯৪১)

লুব্ধ মধুব্রত যেমন মধুচক্রকে ঘিরে ভিড় জমায়, ইষ্টব্রতী তাপস-মণ্ডলী উষা-সমাগমে তেমনি ক'রেই এসে হাজির হয়েছেন তাঁরই কাছে। আজ হিমায়েতপুরের পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে যে-দৃশ্য আমরা দেখছি—এমনতর দৃশ্য মানুষ বড় বেশী দেখেনি,

দেখেছিল একদিন দক্ষিণেশ্বরের দেবদেউলে, দেখেছিল একদিন নদীয়ার পথে-পথে, দেখেছিল একদিন আরবের মরু-প্রান্তরে, দেখেছিল একদিন জেরুজালেমের জলপাইবনে, দেখেছিল একদিন সারনাথের স্তূপপাদমূলে, দেখেছিল একদিন মথুরা-বৃন্দাবন-দ্বারকায়, দেখেছিল একদিন অযোধ্যার রাজপুরীতে। এইতো অমৃতময়ের অমৃতসঞ্চারের পর্ব্ব, যে অমৃতপ্রবাহ গুটিকয়েক ব্যষ্টির ভিতর-দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে যায় সারা বিশ্বে, আনে নূতন প্লাবন—এক নবীন ভাববিপ্লব,—স্তরে-স্তরে পলি রেখে যায়—যার উপর দাঁড়িয়ে সমৃদ্ধতর ফসল ফলতে সুরু করে মানব-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ'—এর মানে কী? এটা কি গোড়া থেকেই আছে? ,

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। ভিতরে যেমন instinct (সহজাত সংস্কার বা গুণ) থাকে, কর্ম্মও তদনুযায়ী হয়। দুনিয়ার দুটো জিনিস ঠিক অবিকল বা একরম দেখতে পাবেন না, প্রত্যেকটি যা'-কিছুর একটা বিশিষ্টতা আছে—তা' যেমন রূপে তেমনি গুণে। একই বাপ-মায়ের পাঁচটি সন্তান পাঁচরকম হয়। কারণ, উপগতির সময় নারী পুরুষকে যখন যেমন প্রেরণা দেয়, পুরুষের ভিতরকার তেমনতর জিনিসই তখন বেরোয়। স্ব-অয়ন-স্যূত বৃত্ত্যভিধ্যান তপস্যায় গতি ও অস্তি অধিজাত হয়েছে। সেখানে স্ব হ'চ্ছে যেন পুরুষ, sperm (বীজ), বৃত্তি যেন প্রকৃতি, ovum (ডিম্বকোষ), আর অভিধ্যান হ'লো cohesive affinity (যোগাবেগ)। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রেরণায় একই পুরুষের ভিতর থেকে বিভিন্ন গুণের সৃষ্টি হ'লো। যত রকমের গুণই থাক না কেন, তার grand division (প্রধান বিভাগ) ঐ চার বর্ণের মধ্যেই রয়েছে। শুধু মানুষের জন্যই নয়, জীব-জগতের সব স্তরেই চাতুর্ব্বর্ণ্য রয়েছে, সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই বর্ণ ঢুকে গেছে। প্রথম থেকেই তা' instinct (সহজাত সংস্কার) হিসাবে থাকে, environment (পারিপার্শ্বিক)-এর মধ্যে তা' প্রকাশিত হয়, generation after generation (বংশ-পরম্পরায়) সেই ধারা চলে।

শরৎদা—বর্ণ যদি প্রধানতঃ গুণগত ব্যাপার, তাহ'লে hereditary varna (বংশানুক্রমিক বর্ণ) মানবার প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তো বেশ বুঝেছেন দেখছি। গুণটা আসছে কোত্থেকে? সেও তো ঐ জন্মসূত্র থেকে। আপনার জৈবী-বিধানকে বাদ দিয়ে আপনার কোন গুণ বা কর্ম্মক্ষমতা নেই। হাওয়ার উপর কিছু দাঁড়ায় না। গুণ ও কর্ম্মক্ষমতা শরীর, স্নায়ু, কোষ chromosome (ক্রমজম), gene (জনি) ইত্যাদিকে আশ্রয় ক'রেই অবস্থান করে। সেগুলি বংশানুক্রমিকতার সূত্র বেয়েই তো নেমে আসে, যাকে বলে immortal necklace of germ-cells (বীজ-কোষের অবিনশ্বর মালা)।

শরৎদা—বর্ণধর্ম্ম ঠিকভাবে পালন করতে গেলে তো মানুষ বর্ণোচিত কর্ম্ম ছাড়া অন্য কাজ করতে পারবে না। কিন্তু কোন মানুষের অন্য বর্ণের কর্ম্মে যদি বিশেষ প্রতিভা থাকে এবং তা' যদি সে করতে না পারে, তাহ'লে তো সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ জীবিকার জন্য বর্ণোচিত কর্ম্ম ছাড়া করতে পারবে না—এক আপদ্ধর্ম্ম ছাড়া। তা' ছাড়া, কোন কর্ম্মানুশীলনে মানুষের কোন বাধা নেই। বর্ণাতীত কর্ম্মে যার বিশেষ প্রতিভা থাকে, বর্ণোচিত কর্ম্মেও সে অপটু হয় না। সেই কর্ম্ম দিয়ে জীবিকা আহরণ ক'রে বাদবাকী সময় সে তার প্রতিভার স্ফুরণ এবং তদনুযায়ী লোকসেবায় ব্যয় করতে পারে। তার বিনিময়ে সে কিছু চাইবে না, কিন্তু তার সেবায় প্রীত হ'য়ে স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহে প্রীতি-অবদান-স্বরূপ কেউ যদি তাকে কিছু দেয়, তা' গ্রহণ করতে তার কোন বাধা নেই। কিংবা রাষ্ট্রের তরফ থেকেও যদি তাকে কোন পুরস্কার দেয়, তা'ও সে গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেকে যদি বর্ণোচিত কর্ম্মনিরত থাকে, কেউ কারও বৃত্তিহরণ না করে, তাহ'লে বেকার-সমস্যা জিনিসটাই আসতে পাবে না। অযথা প্রতিযোগিতা জিনিসটাও বন্ধ হ'য়ে যায়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। বংশপরম্পরায় একই কর্ম্ম করার ফলে প্রত্যেকের দক্ষতা ও যোগ্যতাও বেড়ে যায়। প্রত্যেকে স্ব-স্ব কর্ম্ম করায় সর্ব্বতোমুখী সুষম উৎপাদন ও সেবা-পরিবেষণের একটা স্বাভাবিক ব্যবস্থা স্বতঃই গজিয়ে ওঠে। কোন বর্ণেব বিশিষ্ট সেবার অভাবে, তারা এবং অন্যান্য বর্ণ অপুষ্ট থাকে না। সামাজিক শৃঙ্খলা অব্যাহতভাবেই এগিয়ে চলে। তাই আমাদেব বাপ, বড় বাপ, ঋষি, মহাপুরুষরা যে বিধান ক'রে গেছেন, তা' একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবেন। অদূরদর্শিতা ও হীনত্ববুদ্ধি থেকে দুনিয়ার অনেক আন্দোলনই হয়েছে, কিন্তু তা'তে সমস্যার সমাধান কিছু হয়নি, সব ব্যাপার মানুষের হাতের বাইরে চ'লে যাচ্ছে এবং বারবার বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য্য হ'যে উঠছে। এর প্রতিকার আছে সুসঙ্গত ব্যক্তিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানকে আশ্রয় করার মধ্যে। এই বিজ্ঞানের নামই বর্ণাশ্রম, এবং আমাদের ঋষি-মহাপুরুষরাই এই প্রাকৃতিক বেদবিজ্ঞানের দ্রষ্টা, আবিষ্কর্ত্তা ও প্রতিষ্ঠাতা।

সাধনা-সম্পর্কে কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা অগ্নির উপাসনা, বরুণের উপাসনা, milky way (ছায়াপথ)-এর উপাসনা—যত উপাসনাই করি না কেন, তা' আমাদের কাছে যত বিরাট বা সূক্ষ্ম হোক না কেন, একটা মজা দেখবেন, আমরা কিন্তু তা' হ'তে চাই না, cause (কারণ) আমরা জানতে চাইলেও causal plane-এ (কারণভূমিতে) আমরা রূপান্তরিত হ'তে চাই না। আমরা চাই with this body and consciousness (এই শরীর এবং চেতনা নিয়ে) সবটার উপর আধিপত্য করতে, সবটাকে উপভোগ করতে, ঈশত্ব লাভ করতে। তাই, আমাদের মতো মানুষ

হ'য়েও যিনি তা' পেরেছেন, তাকে আমরা খুঁজি—ভগবান লাভের আকাঙ্ক্ষার মূলে রয়েছে এই। একটা দেহী-মানুষ না থাকলে, তাঁর প্রতি টান না জন্মালে, এতে কোন রস থাকে না। তাঁকে যখন জীবনে মুখ্য ক'রে ধরি তখন তাঁর প্রীতির জন্য, তাঁর তৃপ্তির জন্য অসাধ্য সাধন করতে পারি আমরা, তা'তে আমাদের কষ্টের বোধ থাকে না, আরো-আরোর পথে অতন্দ্র প্রয়াসে এগিয়ে চলি। এই সাধনার ভিতর-দিয়ে নূতন-নূতন acquisition (অর্জ্জন বা অধিগমন) হয়, এমনি ক'রেই হয় আমাদের evolution (বিবর্ত্তন) বা becoming (বিবর্দ্ধন)। আবার, ঐ বাঞ্ছিতই হ'লেন elixir of acquisition (অধিগমনের অমৃত)। আধিপত্য আসলেও তা' নিজে-নিজে উপভোগ করা যায় না, তাঁকে উপভোগ করিয়ে উপভোগ করতে হয়, control (আধিপত্য) করতে চাই, সেও তাঁরই জন্য, নচেৎ অহংকারে বদ্ধ হ'য়ে যাই, further acquisition (আরোতর অধিগমন)-ও হয় না, উপভোগও থাকে না। এমনি ক'রে ইষ্টহারা সাধনার মধ্য-দিয়ে মানুষ একটা দানব, পাগল বা দুশমনও হ'য়ে উঠতে পারে। কারণ তখন সাধনার ভিতর-দিয়ে সে যদি কোন শক্তি লাভ করে, তা' সে নিজেরই খুশি, খেয়াল বা প্রবৃত্তিমাফিকই ব্যবহার করবে। সাধনা মানে acquisitive effort (অধিগমনী প্রয়াস), যে-কোন দিকেই মানুষ সাধনা করুক, যেমনতর বিদ্যা, শক্তি বা যোগ্যতা সে আহরণ করুক, তার পিছনে যদি ইষ্টানুরাগ না থাকে, তা'তে কিন্তু ঐ একই ফল দাঁড়াবে। তাই, জীবনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে—সর্ব্বাবস্থায় যে জিনিসটি দরকার, তা' ঐ ইষ্টপ্রাণতা।

প্রশ্ন করা হ'লো—ইষ্ট নাই অথচ সংযত, ব্যক্তিত্ববান, বুদ্ধিমান, পরোপকারী, কৃতী লোকও তো অনেক দেখা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের দেখবে অন্ততঃ মা-বাবা বা শ্রেয় গুরুজনের প্রতি টান আছেই। অনেকের আবার জন্মগত সম্পদ্ ও প্রকৃতি ভাল থাকে, তাই ইষ্ট ধরা না থাকলেও তার দরুন চলনার মধ্যে অনেকখানি goodness (সদ্‌গুণ) থাকে। কিন্তু সেটা হ'চ্ছে mechanical goodness (যান্ত্রিক সদ্‌গুণ)—যা' কিনা সর্ব্বতঃসঙ্গতি নিয়ে কাউতে সার্থক হ'য়ে ওঠে না। ফলে দাঁড়ায় একটা sterile uneven goodness (বন্ধ্যা অসমঞ্জস সদ্‌গুণ)—যা' প্রেরণা-প্রদীপ্ত ক'রে কোন জীবনকে উৎক্রমণশীল ক'রে তুলতে পারে না। কারণ, শ্রেয়কেন্দ্রিক না হওয়ার দরুন তাদের meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয় না, তাদের কোন করার সঙ্গে কোন করার সঙ্গতি থাকে না। আর, শ্রেয় মানেই শ্রেষ্ঠপুরুষ। কিন্তু দৈবী-প্রকৃতিসম্পন্ন যারা, তারা উপযুক্ত ইষ্টকে গ্রহণ না করলেও স্বতঃই শ্রদ্ধাবান থাকে এবং ইষ্টের সন্ধান পেলে তাঁকে গ্রহণ করতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না। আবার কিন্তু হীনত্ববুদ্ধি, ঈর্ষ্যা বা আক্রোশ থেকে মানুষ যদি খানিকটা কৃতিত্ব অর্জ্জন করে, কিংবা প্রতিষ্ঠার লোভে পরোপকার বা মোলায়েম বাহ্যিক চাল নিয়ে চলে, তাদের দৈন্য অর্থাৎ ভিতরের

অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য প্রতিপদেই ধরা পড়তে থাকে, তাদের শেষ পর্য্যন্ত শেষরক্ষা হয় না, মাঝপথেই এলিয়ে পড়ে তারা। প্রকৃতি বড় কঠোর পরীক্ষক, দুনিয়ার বুকে দীর্ঘদিন কারও ফাঁকি দিয়ে চলবার জো নেই। আবার, হীনত্ববুদ্ধি যাদের বেশী, তারা সদ্‌গুরু পেলেও, তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না। আত্মসমর্পণের কথায় তাদের সমস্ত সত্তাটা যেন থেঁতলে ওঠে।

এরপর গণতান্ত্রিক বিধান-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—আমাদের এই body-র (শরীরের) দিকে চেয়ে দেখুন, প্রত্যেকটা organ (শরীর-যন্ত্র) প্রত্যেকটা organ-কে (শরীর-যন্ত্রকে) help করছে, কোন organ-এ (শরীর-যন্ত্রে) deficiency (খাঁকতি) হ'লেও, অন্য organ (শরীর-যন্ত্র)-গুলি লেগে যাচ্ছে তা' make up (পরিপূরণ) করতে, প্রত্যেকের থাকা অন্য সবগুলির উপর নির্ভর করছে। আর, brain (মস্তিষ্ক)-টা যেন whole (সমগ্র), তাই তাকে বলে উত্তমাঙ্গ, সব organ (শরীর-যন্ত্র)-গুলি separately (পৃথকভাবে) ও jointly (সমবেতভাবে) constantly (সর্ব্বক্ষণ) brain (মস্তিষ্ক)-কে nourish (পুষ্ট) করতে চেষ্টা করছে, brain (মস্তিষ্ক) করছে গুরুর কাজ, brain (মস্তিষ্ক) দিচ্ছে impulse (প্রেরণা), সবাইকে guide (পরিচালনা) করছে। সত্যিকার সঙ্ঘ, সমাজ বা রাষ্ট্র গড়তে গেলেও এমনতর দরকার। এ-ছাড়া কোন system (বিধান) গ'ড়ে ওঠে না, ধ'সে যায়। তাই বুঝুন, 'vox populi vox dei' (জনগণের কথা ভগবানের কথা)। না 'vox expletori vox dei' (পূরক-পুরুষের কথাই ভগবানের কথা)। Sufferings-এর (দুঃখের) ক্রন্দন একটা atmosphere (আবহাওয়া) সৃষ্টি করে, একটা good pair-এর (সু-দম্পতির) brain (মস্তিষ্ক)-কে সেই আকুলতা ঠেসে ধরে, সেখানে পরিত্রাতার soul (আত্মা) নেমে আসে, একটা zygote (জীবনকোষ) cord (নাড়ী) placenta (ফুল)-এর মধ্যে শুয়ে-শুয়ে বাড়ে, নারায়ণ যেন ক্ষীরোদ-সমুদ্রে শুয়ে আছেন, লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা অর্থাৎ চলনসেবা করছেন। পরে একদিন জন্ম হয়—জেগে ওঠেন তিনি মানুষের মধ্যে। জন্মের থেকেই তাঁর বিরাটত্বের tinglings (ঝঙ্কার) টের পাওয়া যায়। সকলের দুঃখ, বেদনা বক্ষে ধারণ ক'রে তারই নিরাকরণী প্রতিভা ও প্রচেষ্টা-প্রদীপ্ত হ'য়ে যিনি আসেন—এমনতর মানুষই মানুষজাতির প্রাণ ও মস্তিষ্কস্বরূপ—তা' ব্যষ্টিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে। তাই, সঙ্ঘ, সমাজ বা রাষ্ট্র যদি তাকে কেন্দ্র ক'রে সংগঠিত ক'রে তোল—প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে পোষণ দিয়ে, প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহায়ক ক'রে—পারস্পরিকতায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে ঐ জীয়ন্ত কেন্দ্রকেই পরিপূরিত ক'রে পরিপুষ্ট ক'রে,—তাহ'লেই মানুষের দুঃখ ঘুচে যায়। আর, ভেবে দেখ—এমনতর বিধান তোমরা চাও কিনা, প্রত্যেকটা মানুষই চায় কিনা। এই আমাদের শাশ্বত আর্য্য-বিধান। একে যে-তন্ত্রই বল না কেন, তাতে কোন আপত্তি নেই, তবে দরকার এই জিনিসটা।

অনির্ব্বচনীয় অক্ষয় সুধাস্বাদে ভরা তাঁর জীবন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে মানুষ যতটুকুই যা' কুড়িয়ে নেয় সে অতি সামান্য, তবু এর মধ্যে একটা নেশা আছে—নিজের হারান সত্তাটাকে কুড়িয়ে পাবার নেশা। সেই নেশায় মানুষ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে, জানার পর আরো জানে, করার উপর আবার করে, এমনি ক'রে সে নিজেকে সত্যি ক'রে উপলব্ধি ক'রে চলে, —পরম সত্য, শিব, সুন্দর জীবনের সঙ্গে প্রীতি-নিবদ্ধ হ'য়ে।

প্রফুল্ল—আপনি কি গোড়া থেকেই বুঝতেন যে আপনি জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-সব কি জানি। ছোট থেকেই মানুষকে ভালবাসতাম—কারও দুঃখ দেখতে পারতাম না। কাউকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখলে মনে হ'ত, আমি নিজেই ঐ অবস্থায় প'ড়ে গেছি, এবং তার একটা বিহিত না করা পর্য্যন্ত স্থির থাকতে পারতাম না। বিদ্যেবুদ্ধি, টাকাপয়সা, লোকবল—কোন সম্বলই আমার ছিল না, কিন্তু একমাত্র ভালবাসার সম্বলকে বুকে ক'রে আমি দুঃসাহসিকের মতো চলেছি—কোন কাজকেই অসম্ভব ব'লে মনে করিনি। মানুষের যাতে ভাল হয়, তা' না ক'রে আমার উপায় ছিল না। সেখানে পারব কিনা এমনতর প্রশ্ন বা সন্দেহের অবকাশ আমার কোনদিন ছিল না। আমারই সত্তার আত্মরক্ষার আকূতি যেন আমাকে হন্যে ক'রে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সকলের আত্মরক্ষার জন্য। আমার এই অসহায় অবস্থা দেখে পরমপিতা বোধহয় দয়া ক'রে সব-কিছুর অন্তর্নিহিত সত্যবস্তুকে আমার চোখে-আঙ্গুল দিয়ে স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই আমি লেখাপড়া না জানলেও—ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের সবদিককার সবরকম মঙ্গল কীভাবে হবে, সে-সম্বন্ধে আমার বুঝতে কিছু বাকী নেই—পরমপিতার দয়ার দান হিসাবেই আমি এটা বুঝতে পেরেছি। আমি সাহিত্য, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, তত্ত্ব, ইতিহাস কিছুই জানি না, কিন্তু যা' আমি নিজে চোখে দেখেছি, সেই দর্শনে—আমার বোধ যতটুকু ধরতে পারে তা'তে—কিছুই বাদ পড়েছে ব'লে মনে হয় না। আমি যা'-কিছু বলি, ওর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই বলি। তাই, আমার বলা-সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নেই। কিন্তু আমার সব চাইতে কষ্ট হয়, যখন দেখি, তোমরা আমার সব কথা শুনেও যেমনভাবে খাটা দরকার, তা খাট না, একটা তাত্ত্বিক আমেজ নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে দাও। এ-কথা ঠিক জেনো, আমি নিষ্ক্রিয় আলাপ-আলোচনা পছন্দ করি না। তোমাদের ফিঙ্গে হ'য়ে লাগার পর বাংলার, ভারতের তথা সমগ্র জগতের অনেক-কিছু দুঃখ-কষ্টের সমাধান নির্ভর করছে। যা' বলছি, সেভাবে তীব্র বেগে এগিয়ে যদি না চল, সারাদেশে এটা যদি ছড়িয়ে না দাও তাড়াতাড়ি, মানুষগুলিকে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে যদি সুগঠিত ও সংগঠিত ক'রে না তোল, তবে অদূর-ভবিষ্যতে তোমরা এতবড় বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হবে, যার

ভয়াবহতা এই অবস্থায় তোমরা কল্পনাও করতে পার না। আমার কী কষ্ট তা' তোমরা বুঝতে পার না, তাহ'লে এমন ক'রে যার-যার পিছটান নিয়ে আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে পারতে না। আমি বলি! তোমাদের পিছটানের প্রতিই যদি সুবিচার করতে চাও, তাহ'লেই ওগুলির প্রতি নির্ম্মম হ'য়ে আমি যা' বলি তা-ই কর—

'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥'

কথাগুলি বলতে-বলতে আগ্রহ ও আবেগের আতিশয্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখ জ্বল-জ্বল করতে লাগলো, কণ্ঠস্বরের তড়িৎ-মূর্চ্ছনা সকলের অন্তরে এক তীব্র জ্বালা সৃষ্টি ক'রে তুললো—তিনি আপনমনে কিছু-সময় পদ্মাচরের দূর আকাশের দিকে উদাসদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, কারও মুখে একটিও কথা নেই, একটা দিব্য গাম্ভীর্য্য থমথম করতে লাগলো। হরিপদদা (সাহা) নিঃশব্দে তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাতে নলটা ধ'রে মুখে দিয়ে টানতে লাগলেন। তিনি যে তামাক খাচ্ছেন তা' যেন তিনি নিজেই ঠিক পাচ্ছেন না, দৃষ্টি তখনো তাঁর কোন সুদূরের কোন গভীরে,— দেশ-কাল-পাত্রকে অতিক্রম ক'রে—অনন্তের মহাসায়রে। চুপচাপ ব'সে আছেন— পূর্ব্বদক্ষিণাস্য হ'য়ে, এমন সময় জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়লো বিছানায় ও গায়ে। শীতের সকালে ঐ রোদটুকুকে পরমাত্মীয়ের মতো মনে হ'তে লাগলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—সব জেনে-শুনেও যে প্রতিকার করতে পারছি না, এর চাইতে দুঃখ আর কী আছে? (তিনি যেন সর্ব্বসাধারণেব কী এক ভীষণ বিপদকে প্রত্যক্ষ ক'রে আতঙ্কিত হ'য়ে উঠেছেন।)

শরৎদা—আপনি দুঃখ করছেন কেন?—আপনার ইচ্ছা হ'লে সবই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বিশ্বাস করি, আমি যেমন-যেমন ইচ্ছা করি ঠিক তেমনি-তেমনিই হ'তে পারে, অবশ্য আপনারা যদি আমার ইচ্ছাটাকে আপনাদের ইচ্ছা ক'রে নেন। আমার ইচ্ছামতো কাজ করবেন, আর তার মধ্যে আপনাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলি, স্বার্থ, প্রয়োজন, প্রবৃত্তি ও খেয়ালগুলি স্বতন্ত্রভাবে সাবল চালাতে থাকবে, তাতে কিন্তু হবে না! আপনাদের ভিতর যা'-কিছু আছে তার প্রত্যেকটি আলাহিদাভাবে এবং সবগুলি সামগ্রিকভাবে আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠা চাই। তোমার রক্তের একটা কণা, শরীরে একটা cell (কোষ) বা ইচ্ছার একটা আঁশও যদি থাকে, যা' আমার ইচ্ছার পরিপূরণে সক্রিয়ভাবে আগ্রহশীল হ'য়ে ওঠেনি, তাই-ই একদিন মস্ত বড় বাধার সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে। এই বাধার অপসারণ হ'য়ে গেছে যার মধ্যে, তার অসাধ্য কাণ্ড নেই। এমনতর যে, সে নিরহঙ্কার হ'য়ে যন্ত্রস্বরূপ কাজ ক'রে যেতে পারে, পরমপিতা তাকে নিত্য শক্তির যোগান দেন। সে ভাবে না— 'আমি পারব কিনা', সে জানে যে তার না করলেই নয়, তাই ক'রেই চলে এবং

পারেও। আবার, তার ঐ আকুলতা বহুলোককে ভিড়িয়ে তোলে। সে নিজে যা' পারে না, অন্যের সাহায্যে তা' করে। .... তাই, আপনারা মাঝখানে ফাঁক বা ফাঁকি নিয়ে চলবেন না, তাহ'লে নিজেরাও ঠকবেন, আমাকেও ঠকাবেন। আপনাদের ঠকাটাই আমার ঠকা, তা' ছাড়া আমার নিজের ঠকা-জেতা ব'লে আর কিছু নেই। এবার আপনারা সবভাবে জিতে ওঠেন দেখতে চাই, আপনারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে সেই সুযোগটুকু আমায় দিন—এই আমার ভিক্ষা আপনাদের কাছে।

তাঁর চোখমুখ, চাউনি, কথাবার্ত্তা—সবটার ভিতর-দিয়ে যেন করুণা ক্ষরিত হ'চ্ছে। হঠাৎ ফিরে বসলেন, তিনি ফিরে ব'সে প্রত্যেকের সর্ব্বাঙ্গে স্নেহদৃষ্টি বুলিয়ে দিতে লাগলেন। মুহূর্ত্তে শান্তি—গভীর শান্তিতে অগাধ হ'য়ে উঠলো সকলে। —এ এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত্ত—'অবাঙ্মনসগোচরম্'—'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'।

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, রবিবার (ইং ৭।১২।১৯৪১)

যথাসময়ে তপোবনের শিক্ষকবৃন্দ এবং অন্যান্য দাদাদের নিয়ে বাঁধের ধারে তাসুতে শ্রীশ্রীঠাকুর-সান্নিধ্যে প্রাতঃকালীন বৈঠক বসলো।

জীবনের উন্নতি কেমন ক'রে হবে, সেই কথা বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রথম জিনিস হ'লো উৎসমুখতা। উৎসমুখতা এনে দেওয়াই শিক্ষার মূলকথা। বাপ, মা, গুরুর প্রতি উদগ্র টান থাকলে, তার বেচালে পা পড়তে পারে না, সে কখনও প্রবৃত্তির দাস হয় না। ভুল-ভ্রান্তি তার জীবনে কমই হয়। 'ভ্রান্তি এলো সেই, উৎসবিমুখ চলন-বলন বসলো পেয়ে যেই।' যে উৎসবিমুখ হয় না, তার ভুল আসবে কোত্থেকে? সমস্ত star (তারা) Polar Star-এর (ধ্রুবতারার) দিকে মুখ ক'রে ঘুরছে, তাই কক্ষচ্যুত হয় না। সব জায়গায় ঐ এক কথা। এই ধৃতি, স্থিতি ও গতি অব্যাহত থাকে যা'-দিয়ে, তাকেই বলে ধর্ম্ম। তাই, ধর্ম্ম প্রত্যেককে বলে, 'তুমি সুকেন্দ্রিক হও, যে-টানে বিধৃত থেকে তুমি সুস্থ থাক, স্বস্থ থাক, তুমি তুমি থাক, ছিন্নভিন্ন হ'য়ে না যাও, সেই টানে নিবদ্ধ রাখ নিজেকে, আর তোমার পরিবেশকেও সেই টানে-টানে রাখ।' মানুষের পক্ষে এই কেন্দ্র হলেন যুগ-পুরুষোত্তম, তিনি প্রত্যেককেই পরিপূরণ করেন স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যানুপাতিক। তাঁর টানে আবদ্ধ থাকলে মানুষের আর কোন ভাবনা নেই। তাঁকে যদি কেউ না পায়, পিতামাতা ইত্যাদি স্বভাব-গুরু যাঁরা, সুকেন্দ্রিক অনুরাগমুখর শ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাঁদের প্রতিও যদি টান থাকে, তাহ'লেও মানুষের অনেকখানি বাঁচোয়া। টান মানেই আপোষণী, আপূরণী টান। নইলে যে যত বড় হোমরা-চোমরাই হো'ক না কেন, সে বৃত্তিস্বারূপ্য লাভ করবেই। ছোট ছেলে লাল দেখলে লালই যেন হ'য়ে যায়—মা'র প্রতি টান থাকবার দরুন, তখন মা'র কথা মনে পড়ে, আর মা'র থেকে ওটা যে আলাদা, contrast-এ (বৈপরীত্যে) সে-বোধ

মাথায় গজায়, নইলে লালকে লাল ব'লে বোধই করতে পারতো না। ছোট-বড় যে যেমনই হোক—নিজের একটা দাঁড়া না থাকলে, বস্তুবোধই আমাদের গজায় না, প্রত্যেকটি জিনিসের সংস্পর্শে আমাদের প্রবৃত্তি যেমন উত্তেজিত হয়, তাই দিয়ে আমরা পরিচালিত হ'তে থাকি। আর, এ-দিকে আমরা ভাবি—আমরা খুব বুঝছি, জানছি, করছি; কিন্তু সবটাই যে প্রবৃত্তির ক্রীতদাসত্ব করা হ'চ্ছে সে বুঝটা আর ফোটে না। আর, ওতে ক'রে প্রকৃত বোধ ও উপভোগ হ'তে আমরা অনেক দূরে স'রে যাই। ধর, লোভের ঠেলায় রসগোল্লা কাছে আসলেই জিহ্বা যদি রসগোল্লা হ'য়ে যায়, তখন আর রসগোল্লাকে বোধ বা উপভোগ করবে কে?

কোন-কিছু জানতে গেলে, বোধ করতে গেলে, উপভোগ করতে গেলে, তার থেকে interested aloofness (অন্তরাসী দূরত্ব) দরকার হয়। বৃত্তি যদি স্ব-এর অধীন থাকে তবেই তা' সম্ভব, আর স্ব বজায় থাকে superior-এ (শ্রেষ্ঠের) প্রতি active attachment-এ (সক্রিয় অনুরাগে)। বৃত্তি দিয়েই তো দুনিয়া উপভোগ, কিন্তু বৃত্তিতেই যদি আমাদের সত্তা merge ক'রে (ডুবে) যায়, তবে কে কাকে উপভোগ করবে? তাই জীবনই অচল হ'য়ে ওঠে, সবই নিরর্থক হয়—যদি উৎসের প্রতি হাড়ভাঙ্গা টান না থাকে। এইজন্যই সব ব্যাপারে ইষ্টনিষ্ঠা, গুরুভক্তির কথা আমি অতো ক'রে বলি। কারণ, জানি—ও-ছাড়া কিছুতেই কিছু হবার নয়, ও বাদ দিয়ে জীবনীয় কিছুর সূত্রপাত হয় না, তাতে বড় জোর অনেক চেষ্টায় একটা অশ্বডিম্ব প্রসব করা যেতে পারে মাত্র।

মানদা-মা একটা কফি বাইরে রেখে এসে ভিতরে বসেছেন। ইতিমধ্যে একটা গরু এসে তা' খেয়ে গেল। পরে সবার খেয়াল হ'লো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গরুতে কফি খেয়েছে সে কিছু না। কিন্তু তোমরা কেউ সজাগ না, হুঁশিয়ার না, চোখ-কান-বোধ যেন আচ্ছন্ন।

ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী) পূর্ব্বকথার সূত্র ধ'রে বললেন—তাহ'লে তো ইষ্টানুসরণ বাদ দিয়ে কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তা' ঠিকই তো। সমাধানের ব্যাপারে সমাধা, সমাধি দুই-ই লাগে। অর্থাৎ, এর জন্য চাই যথাযথ নিষ্পন্নতা ও সম্যক ধারণা। কোন-কিছু-সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে গেলে এবং তা' বিহিতভাবে নিষ্পন্ন করতে গেলে যে বৃত্তিসারূপ্যে নিমজ্জিত থেকে তা' হবার নয়, সে-কথা তো এতক্ষণ ধ'রে বললাম। সমাধি-সম্বন্ধে অনেকের কিন্তু কিম্ভূতকিমাকার ধারণা আছে। সমাধি কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থা নয়। ঘুমে থাকে অজ্ঞানতা, আর সমাধিতে থাকে একটা full knowledge (পূর্ণ জ্ঞান), সমাধি হ'লো keener conscious (তীব্রতর-চেতন)-অবস্থা। সমাধির মধ্যে

করা, ভাবা, জানা, বোধ-করা, হওয়া—সবটাই আছে, সমাধিতে বৈধানিক বিন্যাসেরই পরিবর্ত্তন ঘ'টে যায়।

প্রফুল্ল—মানুষ ইষ্টপ্রাণ হ'লেই কি তার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়? কত ইষ্টপ্রাণ ব্যক্তিও অভাবে কষ্ট পায়, আবার কত ইষ্টহীন ব্যক্তিও তো সচ্ছলতা উপভোগ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ইষ্টপ্রাণ হ'লে তার চলন-চরিত্র সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তার বুদ্ধিবৃত্তি, দক্ষতা, যোগ্যতা, সেবাবুদ্ধি, কর্ম্মক্ষমতা পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। এতে-ক'রে সে লোকের প্রয়োজনপূরণী স্বভাবসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে, তাতে তার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হওয়াই তো উচিত। তা' ছাড়া, মানুষই মানুষের সব চাইতে বড় সম্পদ, সে দিক দিয়ে যাজনমুখর, সেবাপ্রাণ, ইষ্টানুরাগী যে, যার চলনা সুসমঞ্জস, ব্যবহার হৃদ্য ও মনোজ্ঞ, তার লোক-সম্পদ তো বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তার দরিদ্র থাকার তো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, অর্থনৈতিক উন্নতির বুনিয়াদ যে দক্ষতা, যোগ্যতা, ক্ষিপ্রতা, চরিত্র, নিরলস-সেবাবুদ্ধি, সুসঙ্গত-চলন—তার কোনটারই অভাব থাকে না তাতে। অবশ্য, তারা হয়তো প্রয়োজনাতিরিক্ত consume (ব্যবহার) নাও করতে পারে। তবে অর্থের প্রতি তার লোভ না থাকায়, অর্থকরী প্রয়াসের দিকে বেশী নজর না দিয়ে সে হয়তো এমন কোন কল্যাণকর গবেষণা বা অনুশীলনের দিকে ঝোঁক দিল, যার ফল নগদানগদি পাবার নয়, অথচ সেটা কিনা ভবিষ্যতে একদিন হয়তো পরিবেশশুদ্ধ তাকে প্রভূত সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে। এমনও হয়তো হ'তে পারে যে, তার ফল সে নিজের জীবনে পেল না; উপকৃত হোল ভবিষ্যৎ-বংশধরগণ। এ অবস্থায় তাকে কি বলতে হবে যে সে অর্থনৈতিক-জীবনে অকৃতকার্য্য হ'লো? বিপুল সৃষ্টির, বৃহৎ সংগঠনের দায়-দায়িত্ব যারা বহন করে, অনেক দুঃখের আগুনে পোড় খেয়ে. অনেকের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ক'রে, অনেকের অক্ষমতার বালাই বহন ক'রে, তা'দিগকে এগুতে হয়। তাদের পুরো গতি ও পরিণতিটা লক্ষ্য না-ক'রে মাঝখানকার কোন-একটা অবস্থাকে দেখে একটা রায় দেওয়া সবসময় বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আজ আমাদের ঋত্বিক্‌দের যাদের হয়তো দেখছ—কত অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতা, তাদের নিরলস সেবার ফলে হয়তো দেখবে একদিন সমগ্র জাতি কতখানি সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে—সবদিক দিয়ে। এদের এই আপাত-কৃচ্ছ্রতা দেখে কি বলবে যে এরা কিছুই পেল না, কিছুই পারল না, কিছুই করল না? ব্যক্তিগতভাবে দুই-চার জনের সম্বন্ধে সে-কথা খাটলেও এদের বেশীর ভাগের সম্বন্ধে সে-কথা খাটে না। আমি বলব, একটা গোটা মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচাবার জন্য, মানুষ করবার জন্য, এদের প্রত্যেকে যদি লাখো কষ্ট-দারিদ্র্য বরণ ক'রে নেয়, সেই-ই তাদের পরম ঐশ্বর্য্য। আর, এরা যদি মানুষের পিছনে seriously (গুরুতরভাবে) খাটে, তবে এদের দুঃখ ঘুচতেও দেরী

লাগবে না—এরা তা' চা'ক বা না' চা'ক। মানুষের ঐশ্বর্য্যের এক কণাই তাদের অঢেল ক'রে দেবে। তবে মানুষ যদি শুধু মুখে-মুখে ইষ্টপ্রাণ হয়, অথচ বাস্তবে তেমন না হয়, তাহ'লেও যে সে অর্থনৈতিক-জীবনে কৃতী হবে, এ-কথা বলতে পারি না। আবার, চোরা কারবার ক'রে বা ফাঁকিবাজির ভিতর-দিয়ে কেউ যদি বেশ দু'পয়সা কামায়, তাহ'লেই যে সে খুব একটা যোগ্য হ'য়ে উঠলো, এ-কথাও আমি ক'বার চাই না। আমার কথা হ'লো, মানুষের ইষ্টপ্রাণতার সঙ্গে জড়িত আছে তার সুনিয়ন্ত্রিত যোগ্যতা, এবং এর সঙ্গে জড়িত আছে তার অর্থনৈতিক অবস্থা।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, সোমবার (ইং ৮। ১২। ১৯৪১)

রাত্রির মৌনতার মাঝে অন্তরের বেদনা মুখর হ'য়ে ওঠে—তাঁর কাছ থেকে এত পেলাম, তাঁর জন্য করলাম কী? ক্লান্তি কেন স্তিমিত ক'রে তোলে প্রচেষ্টাকে? ব্যথায় মনটা মোচড় কেটে ওঠে, অসহায় প্রাণ তাঁরই সঙ্গ-লালসায় আতুর হ'য়ে ওঠে। ভাবে, তাঁর কাছেই এর কিনারা পাওয়া যাবে, প্রতীক্ষায় প্রহরের পর প্রহর গণে—কখন ভোর হবে, কখন তাঁর কাছে গিয়ে আর-একবার নিজেকে ঢেলে দেবে, তাঁর পূত-স্পর্শে পরিস্নাত হ'য়ে নিজের দৈন্য, গ্লানি, অক্ষমতাকে ধুয়ে-মুছে ফেলবে, পরিশুদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াবে তাঁর পাশে—তাঁর বল হ'য়ে, বোঝা হ'য়ে নয়। রাত্রি কেটে যায়, নেশার টানে ছুটে আসে সবাই পদ্মাচরের ছোট্ট ঐ টিনের তাসুতে, ঐখানেই যে দুনিয়ার যত অমৃত-মদিরা পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে একখানে—একদেহে; পিয়াসী-প্রাণ তাই সমবেত হয় ঐ পরম সঙ্গমতীর্থে। প্রত্যেকে নিজেকে অবারিত করে, উন্মুক্ত করে তাঁর কাছে, তৃষ্ণা তাদের পরিতৃপ্ত হয়; তারা সুখে ডগমগ হ'য়ে ঘরে ফেরে, তারই রেশ চলে সারাদিন ধ'রে প্রতিটি কাজের ভিতর, জীবনের গভীরে তা' দাগ কেটে যায় চিরতরে।

প্রশ্ন হ'লো—Fatigue-layer (ক্লান্তির স্তর) pass (ভেদ) করা যায় কী-ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজনকে হয়তো ভিক্ষা করতে বলা হ'লো, সে অভ্যস্ত নয়, চেষ্টা ক'রেও সুবিধা করতে পারছে না, ঘুরে-ঘুরে দেহমনে fatigued (ক্লান্ত) হ'য়ে পড়েছে,—fatigued (ক্লান্ত) আর depressed (অবসন্ন) কিন্তু এক কথা নয়, তখনও সে মাথা খাটাচ্ছে, এইভাবে চিন্তা-চেষ্টা করতে-করতে সে একটা সুষ্ঠু পন্থা বের করলো, সেই অনুযায়ী ক'রে successful (কৃতকার্য্য) হ'লো—তখন তার energy (শক্তি) যেন খুলে গেল, confidence (প্রত্যয়) আসলো, আরো বড়-বড় কাজের দায়িত্ব নিয়ে সহজে করতে লাগলো। আবার, পরে হয়তো অন্য difficulty (অসুবিধা) আসলো, সেটাও pass (অতিক্রম) করলো, এইভাবে বাস্তব কাজের ভিতর-দিয়ে fatigue-layer (ক্লান্তির স্তর) pass (অতিক্রম) করে। না ক'রে শুধু

ব'সে-ব'সে ভেবে আর হা-হুতাশ ক'রে এটা কিন্তু হয় না। করাই পারার পথ খুলে দেয়, করতে গেলে আবার বিহিত পন্থায় করা চাই, তাই তন্মুখী ধ্যান, মনন ও চিন্তনও লাগে। সে এক জিনিস, আর নিষ্ফল নেতিবাচক দুশ্চিন্তা আর-এক জিনিস। তার মধ্যে কোন সৃজনী আবেগ থাকে না, তাই তা'তে কার্য্যসিদ্ধিও হয় না! Nothing succeeds like success (কৃতকার্য্যতা যেমন কৃতকার্য্যতাকে আবাহন করে, অমন আর কিছুতে করে না)। ফলকথা, সাফল্যই সাফল্যকে ডেকে আনে। কারণ, সাফল্যে মানুষের যেমন উৎসাহ বাড়ে, তেমনি তার অভিজ্ঞতাও বাড়ে। কোন-কিছুতে সফল হ'তে গেলেই তা' নিখুঁতভাবে করতে হয়। ওর ভিতর-দিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা হয়, বোধ বাড়ে, আর ঐ নিখুঁত করার অভ্যাসই তাকে পরবর্ত্তী কাজে কৃতকার্য্যতার দিকে নিয়ে যায়। তবে গোড়ার কথা হ'লো Ideal-এ (আদর্শে) interested (অন্তরাসী) হওয়া।

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥"

মানুষ যে স্থিরমস্তিষ্কে লেগে থেকে কাজ করবে, তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আরো-আরো বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে, তা' সে পারে না—যদি এই করার মূলে কেউ না থাকে। কোন-একটা প্রবৃত্তির তাগিদে যদি মানুষ কোন কাজে প্রবৃত্ত হয়, মাঝপথে আর-একটা প্রবৃত্তি এসে তা'তে লণ্ডভণ্ড বাধিয়ে দেবে, সেইটের তাগিদ হয়তো তখন এত প্রবল হ'য়ে উঠবে যে আগেরটা ছেড়ে দিয়ে সেইদিকে ঝুঁকবে, এইভাবে মানুষ সঙ্গতিহারা ব্যর্থ চলন নিয়ে চলে। সাধনার একাগ্রতা ব'লে যে জিনিস, তা' তার জীবনে ফুটে ওঠে না, সেই তন্ময়তা ছাড়া শক্তিও খোলে না। শ্রেয়-প্রিয়ে অন্তরের অনুরাগ নিয়ে যুক্ত থাকা ছাড়া এ জিনিসটি হবার নয়। কারণ, প্রিয় যেখানে প্রবৃত্তি-উপভোগের বিষয়ীভূত, সেখানে সেই প্রিয়ের প্রতি টানে অন্য প্রবৃত্তিগুলির আকর্ষণ ও বিক্ষেপ হ'তে আত্মরক্ষা ক'রে নিবিষ্ট সাধনায় রত থাকার মতো সামর্থ্য জন্মায় না, কোন সময় যে কী ওলটপালট হ'য়ে যায়, তা' সে নিজেই ঠিক পায় না। অহঙ্কার, মান, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা আচমকা বিপর্য্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে। এ গেল একদিককার কথা। আর, পারার বুদ্ধিই পারিয়ে দেয়। তোমাকে যদি ২৫টা টাকা আনতে বলি, তুমি যদি গোড়াতে বল 'পাই কিনা'—তা'হ'লে পাওয়াও মুশকিল। পারায় দ্বিধাশূন্য হ'য়ে চেষ্টা করলে পারা যায়। ভাল ব্যাপারে 'না'-এর form-এ (আকারে) চিন্তা করাই ভাল না।

প্রফুল্ল—আমাদের সময় ও সামর্থ্য কম, কাজ বিরাট ও বহুল, করি কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Co-ordination (সঙ্গতি) আসলেই হয়। তখন ভাবা, বলা, করা, muscle (পেশী), nerve (স্নায়ু) সবই একযোগে purpose (উদ্দেশ্য) fulfil (পরিপূরণ) করার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগে। তখন একসঙ্গে দশটা দিকে তাল দেওয়া

যায়। স্মৃতিও তখন তুখোড় হ'য়ে ওঠে, কোনটা মাথার থেকে স'রে যায় না এবং যাকে দিয়ে যখন যেটা করানর, টকাটক মাথায় এসে যায়, একটা সুযোগও এড়িয়ে যেতে পারে না। পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকটি বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে বোধও তখন প্রখর হ'য়ে ওঠে, কে বা কী কোথায় কোন্ কাজে লাগে, কার বা কিসের উপযোগিতা কোথায়, কোন্ ক্ষেত্রে, কোথায় কোন্-কোন্ মানুষ বা জিনিসের কোন্ রকম সমাবেশে ও প্রয়োগে কী কার্য্য উদ্ধার হয়, সবই মাথায় খেলতে থাকে। এইভাবে একটা মানুষই অযুত কাজ করতে পারে। আবার, প্রত্যেকেরই প্রকৃতি ও প্রয়োজনকে লক্ষ্য ক'রে, তার পোষণ ও পূরণে যথাসম্ভব যত্নবান হ'তে হয়। এতে প্রত্যেকটা মানুষই আপন হ'য়ে ওঠে। তখন ঐ মানুষগুলির সহায়তায় তুমি অসম্ভব সম্ভব করতে পার। অবশ্য, তোমার নিজের বিশিষ্ট করণীয়গুলি ঠিকভাবে করা চাই। এমনতর চলন ও করণকেই বলে organisation (সংগঠন)। আবার, এই organisation (সংগঠন)-এর প্রাণই হ'লো একপ্রাণতা বা আদর্শপ্রাণতা। তোমরা আদর্শপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় স্বার্থান্বিত হ'য়ে অন্যকেও যতটা ঐরকম ক'রে তুলতে পারবে—প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে, —ততই তোমরা সংগঠিত হ'য়ে উঠবে। নিজের ব্যক্তিত্ব আদর্শানুপূরণে সুসংহত ও সংগঠিত না হ'লে, অন্যকেও সংহত ও সংগঠিত করা যায় না। তাই বলি, সংহত ও সংগঠিত চরিত্র-সম্পন্ন যদি হও, তখন সমগ্র বিচ্ছিন্ন দুনিয়াটাকেই তুমি দানা বেঁধে তুলতে পারবে, তখন তোমার অভাব কোথায়? তখন দেখবে, প্রত্যেকের হাত তোমার হাত, প্রত্যেকের মাথা তোমার মাথা, প্রত্যেকের শক্তি-সম্পদ তোমারও শক্তি-সম্পদ, একা তুমি বহু হ'য়ে আছ,—এই রকম প্রতি-পরস্পরে, তখন আর শক্তি-সামর্থ্যের কমতি কোথায়? Collective volition-এর (সমবেত ইচ্ছার) অভ্যুত্থান অমনি ক'রেই হ'য়ে ওঠে। একেই বলে ভূমায়িত জীবন, একেই বলে ব্রহ্মানুভূতি। এই ব্রাহ্মীচলন তোমাদের চরিত্রগত হোক। "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা, নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।" নিজস্ব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্বার্থ, প্রত্যাশা ও মমত্বমোহে আটকে থেকে নিজেদের বৃহৎ জীবন হ'তে বঞ্চিত ক'রো না।

ইন্দুদা (বসু)—আমাদের মধ্যে দানা বেঁধে ওঠে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সক্রিয় ইষ্টানুধ্যায়িতা নিয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি interested (অন্তরাসী) হ'য়ে উঠলেই 'সূত্রে মণিগণা ইব' হয়। বাধা হয় designing inferiority (দুরভিসন্ধিমূলক হীনম্মন্যতা) থাকার দরুন, অনেকে ঐ প্রবৃত্তির দরুন বড়কে ছোট করতে চায়, ইষ্টের কাজের চাইতে অহং-এর প্রতিষ্ঠা বেশী ক'রে চায়। অনেকে যেমন ভাবে, 'আমাকে দিয়ে দেশ স্বাধীন হয় তো হো'ক, না হয় দেশ গোল্লায় যাক',—ঐ ধরণের ভাবে, তাই কাজের দায়িত্ব যাদের উপর থাকে, তাদের help (সাহায্য)

করে না, ভাবে, কাজে successful (কৃতকার্য্য) হ'লে ঐ ওদেরই তো সুনাম হবে, তাদের সাহায্যের কথা কেউ খতাবেও না, অতএব ক'রে লাভ কী?

এরপর আবার সহানুভূতিশূন্য হ'য়ে দোষ দেয়, আবার দোষ ধরে, কাজে সাহায্য তো করেই না, আবার অনেক-সময় বাধা সৃষ্টি করার তালে থাকে। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে curative urge (নিরাময়ী আবেগ), constructive urge (সংগঠনী আবেগ) কম। এই curative urge (নিরাময়ী আবেগ) ও constructive urge (সংগঠনী আবেগ)-ওয়ালা মানুষের সংখ্যা না বাড়লে, মানুষকে দানা বেঁধে তোলা খুব মুশকিল ব্যাপার। দোষ দেখে যারা সহজেই দুষ্ট হয়, দোষ-নিরাকরণী প্রচেষ্টা যাদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে প্রবল হ'য়ে ওঠে না, ভাঙ্গনমুখী যা' তাকে গঠনমুখী ক'রে তোলার স্বপ্ন যারা দেখে না, এবং ভাঙ্গনকে গঠনে পর্য্যবসিত করার মধ্যে যারা আনন্দ পায় না, ভাঙ্গন-স্রোতের সংস্পর্শে যাদের অন্তরের সংগঠনী সঙ্কল্প ভেঙ্গে যেতে থাকে, ক'ষে হা'ল ধরার রোখ গজিয়ে ওঠে না, তারা মানুষকে সংহত ক'রে তুলতে পারে না। কর্ম্মীদের অন্ততঃ এই গুণগুলি থাকাই চাই, আর কর্ম্মীরা পরস্পর পরস্পরের গুণগ্রাহী হবে, 'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্' হবে। প্রশংসার কাঙ্গাল হওয়া যেমন খারাপ, হীনম্মন্য আত্মপ্রতিষ্ঠার লালসা যেমন নিন্দনীয়, প্রত্যেককে তার ন্যায্য প্রাপ্য শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি, সম্মান, মর্য্যাদা ও প্রশংসা-দানে কার্পণ্য ও কুণ্ঠাও তেমনি অবাঞ্ছনীয়। একটা পরিবারকে একত্র মিলিয়ে রাখতে গেলে কর্ত্তা ও কর্ত্রীস্থানীয় যারা, তাদের যেমন প্রত্যেকের প্রতি অনেকখানি বোধ, বিবেচনা, নজর ও সহানুভূতি নিয়ে চলতে হয়, সঙ্ঘ-পরিবারে কর্ত্তাস্থানীয় যারা তাদেরও তেমনি সবার প্রতি চারচোখো দৃষ্টি নিয়ে চলা লাগে। তোমরা কয়েকজন যদি ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে নিজেদের মধ্যে সংহত হ'য়ে ওঠ—সেবা, সহানুভূতি, নিরাময়ী ও সংগঠনী আবেগ নিয়ে—সংহতি-বিরোধী যেখানে যা'-কিছু আছে, নিরন্তর শ্যেনদৃষ্টিতে তাকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে—নিজেদের মিলন-বিধায়ক চরিত্র দিয়ে,—তাহ'লে দেখবে, সবাই ঠিক হ'য়ে গেছে। ফলকথা, তোমাদের মধ্যে অনেকখানি ঠিক আছে, তোমরা দুইজনে মারামারি ক'রে, পরক্ষণে গলাগলি ক'রে একসঙ্গে গিয়ে রসগোল্লা খেতে পার, এ দৃশ্য তোমাদের মধ্যে হামেশাই দেখা যায়, আবার যার সঙ্গে তুমি হয়তো রাগে বা অভিমানে কথা বল না, তাকে বাইরের একটা লোক যদি অপদস্থ করে, সেখানে কিন্তু তুমি স্থির থাকতে পার না, বুক দিয়ে গিয়ে পড়, এ তোমাদের মধ্যে আছে ঐ ইষ্টসূত্র থাকার দরুন, বাইরে এমনটি বড় বেশী পাবে না। তবে ইষ্টে interested (অন্তরাসী) না হ'য়ে যারা কেবল নিজেদের হীন স্বার্থ-চাহিদা-পূরণের জন্য ইষ্টকে ধরে, ইষ্ট ও সঙ্ঘকে ভাঙ্গিয়ে আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সিদ্ধ ক'রতে চায়,—তাদের নিয়েই মুশকিল হয়। কিন্তু একনিষ্ঠ যারা, তারা যদি হুঁশিয়ার থাকে, ঐ দল কিছু করতে পারে না। তাদের দুষ্ট বুদ্ধিই তাদের দুর্ব্বল ক'রে তোলে, তারা কোথাও

আমল পায় না, তাই তারা ভাঙ্গন ধরিয়ে নিজেদের প্রাধান্য-স্থাপন বা স্বার্থ-সাধন করতে চাইলেও তা' পারে না। মানুষ এমন বেকুব—ইষ্টের প্রতি normally activcly interested (সহজ সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী) হ'লে যে সহজেই সব পায়, এই কথাটাই বোঝে না, তাই যা'তে ব্যর্থ হবে, সেই পথই বেছে নেয়। মানুষ বাস্তব করণসহ মুখ্যতঃ ইষ্টপ্রেমী ও ইষ্টস্বার্থ হ'লে, তার ঐ চরিত্রই তাকে সব পাইয়ে দেয়। যেমন মনে কর, কেউ যদি শুধু অঙ্ক শেখার জন্য তোমার কাছে না এসে তোমাকেই ভালবেসে ফেলে, তার কিন্তু অঙ্ক শেখাটাও ঢের বেশী হয়। হনুমান মাথায় কত ফন্দী নিয়ে প্রথমে এসেছিল, কিন্তু পরে রামচন্দ্রে interested (অন্তরাসী) হ'য়ে উঠলো। ভাল instinct (সংস্কার) থাকলে ওমনি হয়।

কথাপ্রসঙ্গে ইন্দুদা বললেন—বিমলদা কাজে নামলে আহার-নিদ্রার দিকে খেয়াল থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তা'তে বললেন—শরীর ঠিক রাখার জন্য যতটুকু করণীয়, তা' না করা কিন্তু ভাল নয়। ওতে কাজই পণ্ড হয়।

প্রশ্ন করা হ'লো—আপনার কাছে থেকে যে এত impulse (প্রেরণা) পাচ্ছি—তার কি effect (ফল) হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! তা' 'অদ্য বর্ষে শতান্তে বা'। কাজে লাগলে এখনও টের পাও। তোমাদের অজ্ঞাতে ওরই ঝলক ঠিকরে বেরোয় তোমাদেরই ভেতর-দিয়ে—তোমাদের বৈশিষ্ট্যমাফিক। আমার চাউনি, চালচলন, হাবভাব, ক্রিয়াকরণ, আচরণ—যা' দেখেছ—সব in toto (সম্পূর্ণভাবে) মাথায় গোঁজা থাকছে। আমার কথাগুলি যতই responsibly (দায়িত্ব-সহকারে) work out (নিষ্পাদন) করতে থাকবে, ততই ঐ সংহত সম্পদ রাশ ঠেলে দেবে। তখন ঐগুলি আরো intelligently (বুদ্ধিমত্তার সহিত) বোধ ও উপভোগ করতে পারবে। ধ্যান, ধারণা, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ইষ্টানুপূরণী বাস্তব কর্ম্ম ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে সব-কিছুর গূঢ়ার্থ তোমার কাছে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে।

প্রশ্ন—এ জীবনে যদি কিছু না করি?

শ্রীশ্রীঠাকুর চকিতে অভয় ভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্তখানি উত্তোলন ক'রে দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—মৃত্যুর পর যদি জীবন থাকে, সেখানেও তা' সঙ্গে-সঙ্গেই থাকবে। কিছুই ব্যর্থ যাবে না।

তাঁর এই প্রেরণাঘন দিব্য অভয়বাণী শুনে কারও মুখে বাক্য-স্ফূর্তি হচ্ছিল না। তাঁর অপার করুণার কথা স্মরণ ক'রে সকলেরই চোখ তখন অশ্রু-সজল। পদ্মাচরের দিগন্তে পুব-আকাশে তখন সবেমাত্র সূর্য্য উঠেছে, তারই কনক-কিরণে তাসুর ভিতরটা

উদ্ভাসিত, সবিতৃদেব তাঁর বাঞ্ছিতের পুণ্য-অঙ্গ-স্পর্শে আজ প্রভাতে যেন পূর্ণকাম; —পূর্ণকাম, পূর্ণমনোরথ আজ সবাই—তাঁরই শ্রীচরণস্পর্শে।

প্যারীদা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনাভাবে তামাক খেতে লাগলেন। তাঁর মন যেন তখন অন্য রাজ্যে চ'লে গেছে। বাইরে আশ্রম-প্রাঙ্গণে তখন একটা কুকুর একটা পাখীর ছানা ধরতে ছুটে যাচ্ছিল, কারও সেদিকে লক্ষ্য পড়েনি। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্ত্তভাবে তাড়াতাড়ি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলেন। কয়েকজন ছুটে গিয়ে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে পাখীর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন! শ্রীশ্রীঠাকুর তখন শান্ত হ'লেন। তুরীয়ভাবে অবস্থিত যিনি,—সেই ভাবরূঢ় অবস্থায়ও একটা সামান্য জীবের কষ্টও যাঁর চোখ এড়ায় না,—দুনিয়ার সবার প্রতি এই এমনতর সক্রিয় সুকেন্দ্রিক মৈত্রীবন্ধন—একেই কি বলে মুক্তি?

এরপর সুশীলদা বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Real Christianity (প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম), Real Buddhism (প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম) চাপা প'ড়ে গেছে। Clan (বংশ), cult (কৃষ্টি) এবং বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীগণকে মানা যদি ঠিক থাকে, তাহ'লে সেখানে গলদ জমতে পারে না। বিকৃতি যা' জ'মে ওঠে, পরবর্ত্তীর পুণ্যস্পর্শে তা' দূরীভূত হ'য়ে যায় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন একটা গভীর সঙ্গতি বিরাজ করে। সে-অবস্থায় লাখ সম্প্রদায় থাকলেও আটকায় না, সেখানে সম্প্রদায় থেকেও সাম্প্রদায়িকতা থাকে না, তারা পরস্পর পরস্পরের স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে। কারণ, তারা জানে, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সকলেই একবার্ত্তাবাহী—শুধু একবার্ত্তাবাহী নয়, একসত্তাবাহীও। তাই তারা দ্বেষ-হিংসার কথা ভাবতে পারে না, তা'হ'লে যে প্রভুকেই অবমাননা করা হবে, তাঁর গায়েই আঘাত লাগবে। কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তীদের স্বীকার করার অভ্যাস না থাকলে এ ভাবটা সঞ্জীবিত থাকে না। তারপর ঐ কুল ও কৃষ্টি মানারও একটা গভীর প্রয়োজন আছে, নইলে আচারবিহীন হওয়ায় মানুষ বৈশিষ্ট্যভ্রষ্ট হ'য়ে ওঠে। তা'ছাড়া, কুল না মানার ফলে যদি কোনভাবে কোথাও প্রতিলোম ঢুকে যায়, তাহ'লে মূল-ধারাই তো বিপর্য্যস্ত হ'য়ে যায়। ঐ বিধ্বস্ত ও বিকৃত জৈবী-সংস্থিতি নিয়ে মানুষ কিছুই করতে পারে না। সে ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সমাজ ও নিজের শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮, মঙ্গলবার (ইং ৯। ১২। ১৯৪১)

ইষ্টের স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন, উপাসনা, পরিবেবন, অনুবর্ত্তন,—তৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠানমূলক পরিচিন্তন ও কর্ম্মঠ উপচয়ী প্রয়াস—এইতো মানুষের কর্ম্ম। তাঁকে বাদ দিয়ে যা' তাই তো অকর্ম্ম—অশেষ দুঃখ ও বন্ধনের কারণ—এই সত্যটি আশ্রমবাসিগণের

মধ্যে অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাই তাঁর প্রত্যক্ষ সঙ্গ ও সান্নিধ্যলাভের সুযোগ গ্রহণ করতে তারা সদাই উন্মুখ। তাঁর কাছে যাবার জন্য মন তাদের আঁকুপাকু করে, তাই ভোর হ'তে না-হতেই, রাত থাকতেই তাঁরা শীতের জড়তা কাটিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির হন। আকাশে তখনও নক্ষত্ররাজি বিরাজ করে, কুয়াসা ও অন্ধকার তখনও ঘনীভূত হ'য়ে থাকে, দিগন্তবিসারী পদ্মাচর স্তব্ধতায় থমথম করে, আশ্রম-প্রাঙ্গণের বকুল ও বাবলা গাছগুলি মৌন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, শিশির-সিক্ত আঁকাবাঁকা আশ্রম-পথ—সে-পথ গিয়ে শেষ হয়েছে তাঁর আঙ্গিনায়, নীরবে পথিককে তাঁরই দ্বারে আহ্বান করে, যাত্রী ছোটে পরম সঙ্গম-তীর্থে। তারা গিয়ে দেখে, তীর্থপতি স্বয়ং জেগে ব'সে আছেন তাদের প্রতীক্ষায়। এই যে ভক্ত ও বাঞ্ছিতের মিলন—এরই মধ্যে-দিয়ে যেন সৃষ্টির শাশ্বত লীলারসটি উথলে ওঠে; উভয়কে পেয়ে উভয়েই খুশি, উভয়েরই আনন্দ, এমনটি না হ'লে কি আর উপভোগ মধুর হ'য়ে ওঠে? এই আনন্দের আস্বাদন চলে প্রশ্ন, পরিপ্রশ্ন ও সংলাপের ভিতর-দিয়ে; ফাঁকে-ফাঁকে চলে দৃষ্টি-বিনিময়, ঠারে-ঠোরে, হাবে-ভাবে, আকারে-ইঙ্গিতে কত অকহ কথা কওয়া হ'য়ে যায়, মনের মণিকোঠায় ভ'রে ওঠে অমৃত-সঞ্চয়, ভাববিভোর প্রাণ আরো-আরো অবগাহন করতে চায় তাঁ'তে।

সুরু হয় মধুর আলাপন।

ধূর্জ্জটিদা—মানুষ convinced (সন্দেহ-ভঞ্জন) হবার পরেও অন্যরকম বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Convinced (সন্দেহ-ভঞ্জন) হওয়া আর conviction (দৃঢ় প্রত্যয়) আসা এক কথা নয়। সত্তায় গেঁথে না উঠলে conviction (দৃঢ় প্রত্যয়) হয় না। আর, conviction (দৃঢ় প্রত্যয়) না হ'লে বুঝ পাকা হয় না—এখন বুঝে গেল, পরে আবার অন্য consideration (বিবেচনা) আসতে পারে, বিরুদ্ধ environment-এ (পরিবেশে) stand করতে (অবিচলিত থাকতে) পারে না। তখন বিপরীত চিন্তা আসে। Conviction (দৃঢ় প্রত্যয়) হ'লে কিন্তু কিছুতেই সংশয় আসে না, সবাইকে face করতে (সম্মুখীন হ'তে) পারে। তখন যুক্তি-বুদ্ধি ঠেলে বেরোয়। আত্মসমর্থনের জন্য মানুষ যেমন মরিয়া হ'য়ে লাগে, ইষ্টের যা'-কিছুকে সমর্থনের জন্যও সে তেমনি পাগল হ'য়ে ওঠে। ইষ্টের কোন-কোন আচরণের তাৎপর্য্য সে হয়তো বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম না-ও করতে পারে, কিন্তু তার এই বিশ্বাস অটুট থাকে যে তিনি যা'-কিছু করছেন, তা' ব্যষ্টির ও সমষ্টির সর্ব্বোত্তম মঙ্গলের জন্য এবং এই বিশ্বাসই সেখানে তাকে যুক্তি-বুদ্ধির যোগান দেয়। আর, এমন কোন কথা, চিন্তা বা কার্য্যকে প্রশ্রয় দিতে নাই, যা' কিনা প্রত্যয়কে শিথিল ক'রে তোলে, এমন কি ঠাট্টাচ্ছলেও নয়। অসতর্ক মুহূর্ত্তের ঐ সব চিন্তা, চলন, বাক্য, কার্য্য ও সঙ্গ অজানিতে

মানুষের অনেকখানি ক্ষতি করে। কতখানি যে ক্ষতি করে, সেটা crisis-এর (সঙ্কটের) মুহূর্ত্তে ছাড়া বোঝা যায় না। এমনি হয়তো মানুষ আছে বেশ, কিন্তু ইষ্টানুসরণের ক্ষেত্রে যেখানে প্রবল বাধা, বিপত্তি, দুঃখ, কষ্ট, নির্য্যাতন, স্বার্থত্যাগ, প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা-দমনের সম্মুখীন হ'তে হয়, সেখানে সে কাবু হ'য়ে পড়ে, পিছিয়ে পড়ে। ভিতরে 'কিন্তু'-'কিন্তু' ভাব থাকলে ঐ অবস্থায় মাথা উঁচু ক'রে ইষ্টের জন্য রুখে দাঁড়াতে পারে না।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—মানুষকে ভাল ক'রে বোঝানর পর সে হয়তো সদ্‌গুরু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলো। কিন্তু তখন যদি বলে—আপনি যেমন বলেন, আরো অনেকেও তো বলে, আমি দশ জায়গায় দেখে-শুনে যা' হয় করবো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তার right chord-এ (ঠিক তারে) তুমি ঘা দিতে পারনি। তার sentiment (ভাবানুকম্পিতা)-কে excite (উদ্বোধিত) ক'রে, সত্তার ক্ষুধাকে জাগিয়ে দিয়ে যদি একটা দাউদহনী টানের সৃষ্টি ক'রে না দিতে পারলে,—উপবসা আলোচনায় কিছু হবে না। মানুষের চাহিদাকে আবিষ্কার ক'রে একটা রসাল ধারায় কথাবার্ত্তা কইতে হয়। তার সঙ্গে থাকবে অকাট্য যুক্তি ও তথ্য, সেগুলি আবার তার পরিচিত জীবনের এলাকাভুক্ত হওয়া চাই। সব কথাগুলির সুব হবে এমন—যা'তে তার ভিতর-দিয়ে তার জীবন-চাহিদার পরিপূরণী আভাস পায় সে। আর, তোমাকে নিজেকে এমন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে যা'তে তোমার কাছে এসে তোমার দেখে, তোমার কথাবার্ত্তা শুনে প্রত্যেকের চোখ, কান, প্রাণ, মন—তৃপ্ত ও মুগ্ধ হ'য়ে যায়, তোমার সান্নিধ্যে সে স্বর্গসুখ অনুভব করে। এমনটি হ'লে তখন নেশা জ'মে ওঠে। উভয়েরই উপভোগ হয়। সে আগ্রহ-বিধুর হ'য়ে পড়ে, তার যেন তখনই না হ'লে চলছে না—একটা কঠোর চাওয়া তাকে পাগলপারা ক'রে তোলে। নিজে যদি সেই -pitch-এ (উচ্চগ্রামে) থাক, মানুষকে তুমি মুহূর্ত্তে গলিয়ে দিতে পারবে।

কথা বলছেন তিনি, চোখে-মুখে তাঁর করুণা ঝ'রে পড়ছে। তন্ময় মশগুল হ'য়ে গেছেন তিনি—মন তাঁর উৎস-প্রেমে মাতোয়ারা। যাজনের যে সঙ্কেত তিনি দিলেন, তার পূর্ণতম, নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর মাঝে। সাধুজন বলেন—হরিকথায় রুচি মানুষের পরম কল্যাণ-নিদান। হরিকথা বলায় রুচি তো দূরের কথা, হরিকথা শ্রবণে যে মানুষের রুচি জন্মাবে, তেমন প্রাণবন্ত মনোলোভা রুচির ভঙ্গীতে হরিকথা বলতে পারেন ক'জন?—পারেন সেই হরি-অনুশায়ী মূর্ত্ত শ্রীহরি—যিনি সর্ব্ববন্ধন-বিমোচক, ভূভারহারী, ত্রিতাপহারী, আর পারেন তদ্‌গতচিত্ত যাঁরা।

প্রফুল্ল—কীর্ত্তনেই তো মানুষকে সহজে অনুপ্রাণিত ক'রে দেওয়া যায়—বেশ একটা atmosphere (আবহাওয়া) created (সৃষ্টি) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি একলাই একটা atmosphere (আবহাওয়া)—যার সঙ্গে মিশবে, সেই ভিজে যাবে, bedewed (নিষিক্ত) হ'য়ে যাবে। মানুষের আছে চাহিদা, আছে টান, সবগুলি সমবায়ী concentration-এ (একাগ্রতায়) এনে ইষ্টকে পরিবেষণ করবে। রান্নাঘরে খাবার প্রচুর থাকলেই কেবল হয় না, পরিবেষক চাই। পরিবেষণের দোষে কত লোকে পেট ভ'রে খেতে পায় না, কতজনের আবার পেট খাবাপ ক'রে যায়, কতজনে তাদের রুচিমাফিক জিনিস প্রয়োজনমতো না পাওয়ায় তাদের খেয়ে তৃপ্তি হয় না, আবার এদিকে খাবারও নষ্ট হয়। তোমাদের যেন তেমনতর না হয়। পরমপিতা তোমাদের মাল-মশলা প্রচুর দিয়েছেন। সব রকম প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানই তোমাদের কাছে আছে। এখন যদি জায়গামতো সেখানে যার কাছে যেমনভাবে যতটুকু যা' পরিবেষণ করা দরকার, তা' করতে পার তাহ'লেই হয়। তোমরাও মানুষকে পাও, মানুষও তোমাদের পায়। উভয়েরই সুখ হয়।

প্রশ্ন—মানুষের প্রধান চাহিদা কী কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, অহং—এই পাঁচটা জিনিস প্রধান। তাই এইগুলির আবার আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ইত্যাদি নানা রূপ আছে। সব ক'টা প্রত্যেকের মধ্যে থাকলেও এর এক-একদিক এক-একজনের মধ্যে prominent (প্রধান) থাকে। ধর, আহারের ইচ্ছা সকলেরই থাকে, কারো হয়তো spiritual food (আধ্যাত্মিক আহার)-এর ইচ্ছা প্রবল থাকে, সে স্বতঃই নাম, ধ্যান, ভজন ও ভগচ্চিন্তায় অনুরাগসম্পন্ন হয়। আবার সাত্ত্বিক আহারের প্রতি হয়তো তার স্বাভাবিক প্রীতি থাকে, কারও হয়তো মনের খাদ্যের প্রতি লোভ বেশী থাকে, তার হয়তো জ্ঞানাহরণের স্পৃহা প্রবল হয়, হয়তো সে সাত্ত্বিক বা রাজসিক আহার পছন্দ করে, আবার কারও হয়তো স্থূল আহার্য্যের প্রতি আগ্রহ বেশী থাকে—সে খাবার পেলেই মহাখুশি—জ্ঞানের বা আনন্দের রাজ্যের উন্নততর খোরাকের প্রয়োজন অতো তীব্রভাবে সে অনুভব করে না। আবার, রাজসিক বা তামসিক আহারই হয়তো তার খুব প্রিয় এবং সে হয়তো খাদ্য-সমস্যাকেই জীবনের সর্ব্বোচ্চ সমস্যা ব'লেই মনে করে—এই সমস্যা আবার কারও হয়তো নিজের পেটের জন্য, কারও হয়তো গুরুজন ও প্রিয়জনের জন্য, কারও হয়তো বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের জন্য। Spiritual (আধ্যাত্মিক) ও intellectual (মানসিক) hankering (আকাঙ্ক্ষা) -ও অমনি কারও-কারও শুধু নিজের জন্য, কারও-কারও নিজের সঙ্গে প্রিয়-পরিজনের জন্য, কারও-কারও বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর পরিবেশের জন্য। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, অস্মিতা—ইত্যাদির প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিভেদে এইরকম বিভিন্ন রূপ নেয় এবং তার মধ্যে একটা থাকে guiding বা goading complex (পরিচালক প্রবৃত্তি)। সেই অনুপাতে কথা বললেই হয়, তখন দেখবে সে আর তোমাকে

ছাড়ছে না। একবার রস লাগিয়ে দিতে পারলে, তুমি তাড়িয়ে দিতে চাইলেও সে যাবে না। ফলকথা, মানুষ ক'য়েই দেয়, তোমার কী বলতে হবে, একটু watch (লক্ষ্য) করলেই টের পাবে।

কালুদা (আইচ) কিছু তরকারী নিয়ে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লাসের সঙ্গে ব'লে উঠলেন—তোফা মাল এনেছিস তো! যা, বড়-বৌয়ের কাছে দিয়ে আয়।—এই ব'লে তামাকে টান দিলেন।

শরৎদা আলোচনা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষ নিজের মনের কথা না ব'লে যেখানে বুদ্ধি ক'রে নানা কথা বলে, তার মধ্য-দিয়ে কী ক'রে তার চাহিদা বোঝা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যেই বোঝা যায়। মানুষ যত কথাই কো'ক, তার inclination (আনতি) যে-দিকে, ঘুরে-ফিরে সেখানেই আসতে চায়। যুদ্ধের আলোচনা করতে গিয়ে হয়তো বলবে, রাশিয়ার মেয়েরা কেমন যুদ্ধে নেমে গেছে, পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছে, আমাদের দেশে কি তা' হবার জো আছে?—এমন সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের! এই চললো—। তাই একটু নজর রাখলেই বোঝা যায়। একজনের guiding complex (পরিচালক প্রবৃত্তি) তোমার মনোমতো না হ'লেও, তাকে নিরুৎসাহ করতে নেই—তারই সার্থক প্রয়োগে, সে কেমন ক'রে জীবনে ধন্য হ'য়ে উঠতে পারে, সেইটেই তার সামনে তুলে ধরতে হয়। ফলকথা, যার যে প্রবৃত্তিই থাক—সেইটে যদি ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়, তার ভিতর-দিয়েই সে অনেক বড় হ'য়ে উঠতে পারে, তার ঐ প্রবৃত্তিই লোককল্যাণকব হ'য়ে ওঠে। ধর, একজন হিংস্র ও হিংসুটে প্রকৃতির; অসৎ, অন্যায় ও পাপ যা', তার বিরুদ্ধে তার ঐ ভাব যদি প্রযুক্ত হয়, তা'তে তারও মঙ্গল, অন্যেরও মঙ্গল। সৎ কাউকে ভাল না বাস'লে এই মোড় ফেরানটুকু সম্ভব হয় না। তাই, মানুষকে ইষ্টে যুক্ত করার কথা বলি, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন ক'রে তোলার কথা বলি।

যেমন শুনি তা'তে মনে হয়, শিবাজীর ছিল দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি। এই প্রকৃতি যদি সে নিজের স্বার্থপ্রতিষ্ঠায় লাগাতো, তাহ'লে সে মানুষের স্বার্থ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে ব্যাহতই করতে পারতো, কিন্তু গ'ড়ে তুলতে পারতো না কিছু। কিন্তু রামদাসকে ভালবাসার দরুন অতো বিরুদ্ধতার মধ্যেও মারাঠা সাম্রাজ্যের মতো অমন একটা আদর্শ রাষ্ট্র গ'ড়ে তোলা তার পক্ষে সম্ভব হ'লো। তাই, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার সহায়ক ক'রে কাজে লাগাতে পারলে কিছুই ফেলান যায় না।

একটা কুকুরকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও কালিদাসী! ওর পেটটা পড়ে গেছে, ওকে কিছু খেতে দে।

কালিদাসীমা কুকুরটাকে এক-পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা মোয়া খেতে দিলেন।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে যারা থাকে, তারা যে অনেক সময় ইষ্টের প্রয়োজনই বোধ করে না। সেখানে কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুকের মধ্যে মানুষের একটা খালি-খালি, শূন্য-শূন্য বোধ থাকেই, সেখানটা ধ'রে নাড়া দিতে হয়। Will to live and grow (বাঁচা-বাড়াব ইচ্ছা) মানুষের আছেই। যার উৎসপ্রাণতা যত তরতরে, তার activity (কর্ম্ম) ও adjustment (নিয়ন্ত্রণ) তত গভীর ও ব্যাপক, সে হয় great man (মহান মানুষ)! এই আরোতরের ক্ষুধা মানুষের আছেই। এই ক্ষুধার পরিপূরণের জন্যই দরকার হয় বৈশিষ্ট্যপালী আপূরমাণ জীবন্ত ইষ্ট বা আদর্শের শরণাগতি। এই বোধটা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দিতে হয়। আর, যাদের সে-ক্ষুধা নেই, তাদের সে-ক্ষুধা সুকৌশলে জাগিয়ে তুলতে হয়। যে basis-এর (ভিত্তির) উপর দাঁড়িয়ে তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে, সেই basis (ভিত্তি)-টাকে পাকা-পোক্ত করতে গেলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন, আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন, তা' ধরিয়ে দিতে হয়। একটা বিশেষ বিপর্য্যয়ে মানুষের বিষয়-আশয় চ'লে যেতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে, এমনতর কত ব্যক্তি, পরিবার ও জাতির জীবনে ঘ'টে থাকে। কিন্তু সব বিপর্য্যয়ের মধ্যে কালের বক্ষে জয়ী হয় তারাই, যারা সুকেন্দ্রিক, সুনিয়ন্ত্রিত, সুযোগ্য ও সুসংহত। এই কথাটা বোধে এনে দিতে হয়। মানুষ একক যে ভাল থাকতে পারে না, ভাল থাকার জন্য পরিবেশকেও ভাল রাখতে হয় এবং এই পরিবেশের ভাল করতে গেলে, তাদের যোগ্যতা বাড়াতে গেলে যে তাদের মধ্যে ধর্ম্মদান প্রয়োজন, আর এই ধর্ম্মের মূলস্তম্ভ যে ইষ্টপ্রাণতা, আবার অন্যকে ইষ্টপ্রাণ ক'রে তুলতে গেলে যে আগে নিজে ইষ্টপ্রাণ হ'তে হয়,—এইদিক দিয়ে অগ্রসর হ'তে পার। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তিবশতা যে কতখানি অস্বস্তি, অশান্তি, জ্বালাযন্ত্রণা ও বিপাক সৃষ্টি করতে পারে, এগুলির জীবন্ত ও জ্বলন্ত চিত্রও তার সামনে এঁকে দেখাতে পার। এবং একমাত্র ইষ্টানুগত্যের ভিতর-দিয়ে এ হ'তে নিষ্কৃতি মিলতে পারে, তা' factfully (তথ্যপূর্ণভাবে) discuss (আলোচনা) করতে পার। যত কথাই যার সঙ্গে বল না কেন, তার অন্তরতম চাহিদা, যেটা তার পরিচালক-প্রবৃত্তি, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বলবে। আর উচ্চতর, সার্থকতর জীবনের প্রতি, বিবর্ত্তনের প্রতি একটা লোভ জন্মিয়ে দিতে হয়, যা'তে অনিবার্য্য আকর্ষণে সেই দিকে ছোটে। ইষ্টের প্রতি আকর্ষণ যত আমাদের সত্তাগত হয়, ঐ আকর্ষণ যত আমাদের চলন-চরিত্রের নিয়ামক হয়, তা'তে সক্রিয়ভাবে মুগ্ধ ও বুদ্ধ হ'য়ে নিরবচ্ছিন্ন চলনে যত চলি, ততই আমাদের স্পর্শে মানুষের অন্তর্নিহিত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল বুদ্ধি জেগে ওঠে এবং সেই মন নিয়ে তারা বুঝতেও পারে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি এবং সহজভাবে। তোমার চরিত্র ও

ব্যক্তিত্বের সেই radiation (বিকিরণ) যদি না থাকে, তবে লাখ-লাখ কথা ব'লেও তুমি মানুষের মন ছুঁতে পারবে না।

প্রশ্ন—শ্রেষ্ঠের প্রতি সক্রিয় টান যার নাই, তার যে অবনতি হ'চ্ছেই তা' যে সে হাতে-হাতে বুঝতে পারে না; জীবনের মূলে ঘা পড়ে যখন, তখন বললে হয়তো খেয়াল হয়, সে অবস্থা আসতেও তো দেরী লাগে। শ্রেষ্ঠের প্রতি টান ছাড়াও তো মানুষ বহুদিন বেঁচে থাকতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফল হাতে-হাতেই পায় কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ যেখানে ঝুলে থাকে, অর্থাৎ যাদের উপর টান পড়ে, তাদের হয়তো উন্নত টান কিছু থাকে, সেই তাদের টানের হিস্রেয় যুক্ত থাকে ব'লে টিকে থাকে। তুলসীদাস তো বৌ-পাগলা ছিল, বৌ-এর কথাতেই আবার রামভক্ত হ'য়ে উঠলো। এইরকম transference (পরিবর্ত্তন)-ও হয়। ফলকথা, মানুষ যদি প্রতিলোমদুষ্ট, কৃতঘ্ন ও distorted (বিকৃত) না হয়, তবে তার পথ সব সময়ই প্রশস্ত। যে-কোন obsession (অভিভূতি) মানুষের আসুক না কেন, সেটা থেকে কাটিয়ে উঠে শ্রেয়পন্থী হওয়া তার পক্ষে কঠিন কিছু নয়, বাঁচা-বাড়ার তাগিদেই সে তা' ক'রে থাকে। তাই নিজেদের ইষ্টানুগ ভাস্বর চরিত্রের প্রভাবে মানুষের obsession (অভিভূতি)-কে হাল্কা ক'রে দিয়ে, তার বাঁচা-বাড়ার will (ইচ্ছা)-কে keen (তীব্র) ক'রে তোলাই যাজনের প্রধান কাজ। উপযুক্ত যাজক পেলে দুনিয়ার পাপ-তাপ অনেক কমিয়ে দেওয়া যায়। যাজনের উপর রাখলে মানুষের অন্তরের দেবভাবকে অনেকখানি জাগিয়ে রাখা যায়। কিন্তু প্রতিলোম-জাতক যারা, কৃতঘ্ন যারা, distorted (বিকৃত) যারা, যাজন তাদের অন্তরে পৌঁছাতে পারে কমই, শরীর-মনের যে-পথ দিয়ে পৌঁছাবে, তার মাঝেই অনেক ছেদ, অনেক কাটাছেঁড়া, অনেক উল্টো সমাবেশ থাকে। তাদের কিছু করতে গেলে তাদের পেছনে অনেক খাটা লাগে, খেটেও স্থায়ী ফল কিছু হয় কিনা বলা শক্ত। Distorted (বিকৃত) যারা, তাদের শোধরান বরং সম্ভব, কিন্তু প্রতিলোমজ ও বিশ্বাসঘাতকদের সংশোধন প্রায় অসম্ভব। বিশ্বাসঘাতকতা আবার প্রতিলোম-সংস্রবের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং প্রতিলোমজাতক যারা আছে দুনিয়ায়, তাদের প্রতিলোম-দোষ সংশোধনের কোন উপায় যদি করা যায়, তবে বিশ্বাসঘাতকতাকেও দুনিয়া থেকে হয়তো তাড়ান যেতে পারে। এর সমাধান শাস্ত্রে কিছু লেখেনি, তবে আমার মনে হয়, প্রতিলোম-জাত কন্যাদের বংশপরম্পরায় উচ্চঘরে বিয়ে দিয়ে উন্নততর বীজ-প্রভাবে তাদের সন্তান-সন্ততিকে বহুপুরুষ ধ'রে ক্রমশঃ দোষমুক্ত ক'রে তোলা যেতে পারে।

ভূদেবদা (মুখোপাধ্যায়)—ভগবান মানুষকে তাঁর দিকে টেনে রাখেন না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তো বুকে ক'রেই রেখেছেন, তা' না হ'লে মানুষ বেঁচে আছে কী করে? তার প্রাণশক্তি সে পেল কোথায়? কিসের বলে সে চলে-ফেরে, হেকমতি

দেখায়? এমন কি, সে যে খোসখেয়ালে চলে, তাও সে পারতো না, যদি পরমপিতা তার মধ্যে জীবন-স্বরূপ হ'য়ে না থাকতেন। কিন্তু পরমপিতাই যে মানুষের অস্তিত্বের উপাদান, তিনিই যে তার সব-কিছু, তা' সে উপলব্ধি করতে পারে না—যতদিন না সে তার তরফ থেকে তাঁকে বরণ করে। এইজন্য রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না। বিদেহ পরমপিতাকে মানুষ ধরতে পারে না, তাই, নর-বিগ্রহে তিনি বার-বার আসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলছেন আর মাঝে-মাঝে তামাক চেয়ে খাচ্ছেন। হরিপদদা তামাক সেজে দিচ্ছেন। তামাক খেয়ে আবার গামছা দিয়ে মুখটা পুছে ফেলছেন। ধীরে-ধীরে সূর্য্য জেগে উঠলো, অন্ধকার ভেদ ক'রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠলো আলো, দূর বনানীর অস্পষ্ট কালোরেখা বর্ণাঢ্য আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। তাঁর প্রত্যেকটি জিনিস লক্ষ্য করার—খাওয়া, পরা, শোয়া, বসা, হাঁটা, চলা, কাজকর্ম্ম, আলাপ, ব্যবহার—যাবতীয় যা'-কিছু। মশারিটা কেমন নিখুঁতভাবে টাঙান, চারিদিকে টানটান, কোথাও একটু ঘোঁচঘাঁচ নেই, বিছানাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পাখীর পালকের মতো সাদা ধবধবে, কোথাও একটি দাগ পর্য্যন্ত নেই। চাদরটি চারিদিকে সমানভাবে গোঁজা, কাপড়খানিও শুভ্র, স্বচ্ছ, বসার ভঙ্গীটি কী অনবদ্য, অপূর্ব্ব; তাঁর সব-কিছুর মধ্যে একটি নিখুঁত সুষম সৌন্দর্য্য—প্রকৃতির মতোই তা' সহজ, অনাড়ম্বর, সুসমঞ্জস, সুঠাম ও মনোরম।

ক্রমে দাদাদের মধ্যে আরো অনেকে আসলেন। মানদা-মা, দুলালী-মা, কালিষষ্ঠী-মা এবং অন্যান্য মায়েরাও আসলেন।

বিশ্বরূপ ও বিষ্ণুরূপ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বরূপে আছে—বহু যে এক, এই বোধ, আর বিষ্ণুরূপে আছে—একই যে বহু, এই বোধ। বিশ্ব এসেছে বিশ্‌-ধাতু হ'তে। বিশ্‌ ধাতু মানে প্রবেশ। বিশ্বরূপ মানে সেই রূপ, যেখানে যাবতীয় রূপ অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে সংহত হ'য়ে আছে। আর বিষ্ণু মানে তিনি, যিনি সর্ব্ব ও প্রত্যেকের ভিতর বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য উঠে পড়লেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

ভ

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভাগ্য	...	৭৯
ভাববাণী ও অনুভূতির বর্ণনা (তুলনা)	...	৪৯
ভারত-মহিমা	...	১২৮
ভাল কথা শুনলেই করবে	...	১০১
ভালবাসার টানেই মানুষ কর্ম্মঠ হয়	...	৮৬, ১০০
ভিক্ষা	...	৩৬
ভিক্ষা করার নীতি	...	১০৩, ১০৪
ভৃগু	...	৪, ৫৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
সমাধি	...	৩৮, ১৬৮
সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা	...	১৭৫
সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ	...	৪৫, ৮০, ১৫১
সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য	...	৪৬
সাধনপথে ইষ্টের প্রয়োজনীয়তা	...	১৬৩, ১৬৮
সাধনপথে বাধার স্থান	...	৭০
সাধু	...	৭, ২৩, ১০৭
সাধুর বেশে অসাধু	...	৬৬
সাধুসঙ্গ	...	৯৮
সুপারির কৌটায় বিষ	...	৫৮
সুসন্তানলাভে পিতা-মাতার দায়িত্ব	...	১৩২, ১৩৮
সৃষ্টিরহস্য	...	১৫৬, ১৬১
সো'হং-ভাবনার ত্রুটি	...	২৫
স্বস্ত্যয়নী	...	৩, ১৪, ৩৩, ৩৯, ৪২, ৬৮, ৮৭, ৯২, ১১৮
স্বস্ত্যয়নী স্টেট	...	১১৮
স্বাধীনতা	...	১২৬
স্বামিভক্তির স্বরূপ	...	১০
স্বার্থবুদ্ধি থাকার পরিণাম	...	১৩০
স্মৃতিবাহী চেতনা	...	৩৯, ৭৮, ১৫২

হ

হজরত মহম্মদ	...	৮
হনুমান	...	৬৭, ১৭৪
হিটলার	...	১, ২১

C

Cementing factor of society	...	২২
Complex	...	১৪৬, ১৪৭